Through Knowledge towards Jannah

Islamic Online Madrasah – IOM

ব্যাচেলর ইন দাওয়াহ এন্ড ইসলামিক স্টাডিজ

রিসার্চের বিষয়ঃ

ইসলামি বিচার ব্যবস্থা

তত্ত্বাবধায়নেঃ

মাও: আরমান হোসাইন

রিসার্চ ডিপার্টমেন্ট

ইসলামিক অনলাইন মাদ্রাসা – আইওএম

জমা দিয়েছেনঃ

রাফিয়া আক্তার

রোলঃ ২৩১০০১২০৭৭৬

৩১ মে, ২০২৬ ইং

Through Knowledge towards Jannah

Islamic Online Madrasah – IOM

ব্যাচেলর ইন দাওয়াহ এন্ড ইসলামিক স্টাডিজ

রিসার্চের বিষয়ঃ

ইসলামি বিচার ব্যবস্থা

এই রিপোর্ট টি ইসলামিক অনালাইন মাদ্রাসার ব্যাচেলর ইন দাওয়াহ এন্ড ইসলামিক স্টাডিজের একটি আনুসাঙ্গিক রিপোর্ট।

তত্ত্বাবধায়নেঃ

মাও: আরমান হোসাইন

রিসার্চ ডিপার্টমেন্ট

ইসলামিক অনলাইন মাদ্রাসা – আইওএম

জমা দিয়েছেনঃ

রাফিয়া আক্তার

রোলঃ ২৩১০০১২০৭৭৬

Through Knowledge towards Jannah

Islamic Online Madrasah – IOM

ব্যাচেলর ইন দাওয়াহ এন্ড ইসলামিক স্টাডিজ

প্রত্যয়ন পত্র

এই মর্মে প্রত্যয়ন করা যাচ্ছে যে, " ইসলামি বিচার ব্যবস্থা " বিষয়ক গবেষণাপত্র টি আমার তত্ত্বাবধানে ব্যাচেলর ইন দাওয়াহ এন্ড ইসলামিক স্টাডিজ ডিপার্টমেন্ট থেকে রাফিয়া আক্তার, আইডিঃ ২৩১০০১২০৭৭৬ বিচক্ষনতার সাথে সম্পন্ন করেছেন।

(স্বাক্ষর)

তত্ত্বাবধায়নেঃ

মাও: আরমান হোসাইন
রিসার্চ ডিপার্টমেন্ট
ইসলামিক অনলাইন মাদ্রাসা – আইওএম

(স্বাক্ষর)

এক্সটারনালঃ

মাওলানা মাহবুবুর রহমান
আকিদাহ ও ফিকহ ডিপার্টমেন্ট
ইসলামিক অনলাইন মাদ্রাসা – আইওএম

ঘোষণাপত্র

আমি নিম্নস্বাক্ষরকারী এ মর্মে ঘোষণা করছি যে, " ইসলামি বিচার ব্যবস্থা" শিরোনামে এই গবেষণাপত্র ইসলামিক অনলাইন মাদ্রাসার (Islamic Online Madrasah – IOM) ব্যাচেলর ইন দাওয়াহ এন্ড ইসলামিক স্টাডিজ বিভাগের মাও: আরমান হোসাইন উস্তাদের প্রত্যক্ষ তত্ত্বাবধানে ও নির্দেশনায় সম্পন্ন করেছি। অন্য কোন বিশ্ববিদ্যালয় বা প্রতিষ্ঠানে কোন প্রকার ডিগ্রি/ডিপ্লোমা অর্জনের জন্য বা প্রকাশের জন্য গবেষণাপত্র সম্পূর্ণ কিংবা এর অংশবিশেষ উপস্থাপন করা হয়নি।

আমি ঘোষণা করছি যে, এই গবেষণা কর্মটি আমার নিজস্ব প্রচেষ্টায় প্রস্তুত করা হয়েছে, যেখানে প্রয়োজন অনুসারে বিভিন্ন উৎস থেকে সংগৃহীত তথ্য ব্যবহার করা হয়েছে এবং সেগুলো যথাযথভাবে তথ্যসূত্রে উল্লেখ করা হয়েছে।

Rafia Akter

(স্বাক্ষর)

রাফিয়া আক্তার

আইডিঃ ২৩১০০১২০৭৭৬

ব্যাচেলর ইন দাওয়াহ এন্ড ইসলামিক স্টাডিজ।

ইসলামিক অনলাইন মাদ্রাসা।

তারিখঃ

৩১ মে, ২০২৬ ইং

সূচিপত্র

ভূমিকা (Introduction) 7

১ম অধ্যায়: ইসলামি বিচার ব্যবস্থা কী এবং কেন? 10

১.১ ইসলামি বিচার ব্যবস্থার আভিধানিক ও পারিভাষিক সংজ্ঞা 10

১.২ ইসলামি বিচার ব্যবস্থার মূল উৎসসমূহ (কুরআন, সুন্নাহ, ইজমা ও কিয়াস) 13

১.৩ আইনের দৃষ্টিতে সমতা ও জাহেলি যুগের বিচারহীনতার সাথে ইসলামি বিচার ব্যবস্থার ইনসাফের তুলনা 16

১.৪ বিচারকের আসন একটি বিশাল আমানত 19

১.৫ ইসলামি বিচার ব্যবস্থা মানব সমাজে 'কেন' প্রয়োজন? 22

১.৬ মানুষ 'কেন' ইসলামি বিচার ব্যবস্থাকে বেছে নিবে? 25

অধ্যায় ২: ইসলামি বিচার ব্যবস্থার মূলনীতিসমূহ 28

২.১ ওহীর বিধানের বাধ্যবাধকতা ও মানুষের খেয়াল-খুশির বর্জন 28

২.২ নির্দোষ প্রমাণের নীতি (অপরাধ প্রমাণিত হওয়ার আগে সবাই নির্দোষ) 31

২.৩ সন্দেহ বা অস্পষ্টতার সুবিধা আসামিকে দেওয়া 33

২.৪ আত্মপক্ষ সমর্থনের অধিকার ও সাফাই সাক্ষী হাজির করার সুযোগ 36

২.৫ পক্ষপাতহীন ও একপেশে বিচার বর্জন 39

২.৬ ব্যক্তিগত রাগ, ক্ষোভ ও শারীরিক অস্থিরতার অবস্থায় বিচার করা নিষেধ 42

অধ্যায় ৩: ইসলামি আদালতের গাঠনিক রূপরেখা ও বিভাগসমূহ 46

৩.১ 'আল-কাযা' বা সাধারণ দেওয়ানি ও ফৌজদারি আদালত 46

৩.২ 'আল-হিসবাহ' বা ভ্রাম্যমাণ প্রশাসনিক, ভোক্তা ও বাজার আদালত 49

৩.৩ 'উইলায়াতুল মাযালিম' বা উচ্চ প্রশাসনিক আদালত / জবাবদিহিতা ট্রাইব্যুনাল 52

৩.৪ 'কাযিল কুযাত' বা প্রধান বিচারপতি পদের সূচনা ও বিবর্তন 55

অধ্যায় ৪: ইসলামি দণ্ডবিধি: হুদুদ, কিসাস ও তা'যির 59

৪.১ 'হুদুদ' বা কুরআন-সুন্নাহ দ্বারা নির্ধারিত শাস্তি 59

৪.২ 'কিসাস' ও 'দিয়াত' বা সমপরিমাণ শাস্তি এবং রক্তপণ নীতি 62

৪.৩ 'তা'যির' বা সমকালীন বিচারক ও রাষ্ট্রের বিবেচনামূলক শাস্তি 65

৪.৪ ইসলামি শাস্তির মূল দর্শন: অপরাধের প্রতিশোধ বনাম সমাজ সংস্কারের প্রতিরোধক ব্যবস্থা 68

অধ্যায় ৫: ইসলামিক বিচারিক কার্যবিধি ও সাক্ষ্য আইন 72

৫.১ মামলার মূল ভিত্তি: বাদীর প্রমাণ ও বিবাদীর শপথ 72

৫.২ সাক্ষীর যোগ্যতা, নির্ভরযোগ্যতা ও জেরা করার নিয়ম 75

৫.৩ পরিস্থিতিগত প্রমাণ এবং আধুনিক ফরেনসিক বিজ্ঞানের গ্রহণযোগ্যতা 79

৫.৪ বিচারকের রায় ও ডিক্রি: প্রকারভেদ এবং পুনর্বিবেচনার নিয়ম 83

৫.৫ বিচার প্রক্রিয়ায় আইনজীবীর ভূমিকা ও ইসলামি ফিকহে এর বৈধতা 87

৫.৬ প্রকাশ্য আদালত এবং গোপন বিচার প্রক্রিয়ার নিষেধাজ্ঞা 91

অধ্যায় ৬: ইসলামি বিচার ব্যবস্থার বাস্তবিক প্রয়োগ: রাসূল (সা.) ও খোলাফায়ে রাশেদীনের আদালত 96

৬.১ রাসূলুল্লাহ (সা.) এর বিচারিক জীবন, সতর্কতা ও ঐতিহাসিক মামলাসমূহ 96

৬.২ খলিফা আবু বকর এবং খলিফা ওমর (রা.) এর বিচারিক দূরদর্শিতা ও স্বাধীন বিচার বিভাগ গঠন 102

৬.৩ খলিফা উসমান এবং খলিফা আলী (রা.) এর বিচারিক দূরদর্শিতা ও ইসলামি আইনী শাসনের ঐতিহাসিক ঘটনা 107

অধ্যায় ৭: সমকালীন সময়ে ইসলামি বিচার ব্যবস্থার অপব্যাখ্যার খণ্ডন ও তুলনামূলক পর্যালোচনা 112

৭.১ ইসলামি শাস্তির 'নিষ্ঠুরতা' ও মানবাধিকারের আধুনিক অপব্যাখ্যা খণ্ডন 112

৭.২ অমুসলিম ও লৈঙ্গিক সমতার আধুনিক বিতর্ক এবং ইসলামি আইনের বাস্তব চিত্র .. 116

৭.৩ অমুসলিম নাগরিকদের আইনি অধিকার ও ধর্মীয় স্বাধীনতা 120

৭.৪ আধুনিক ধর্মনিরপেক্ষ বিচার ব্যবস্থার সাথে ইসলামি বিচার ব্যবস্থার তুলনামূলক পর্যালোচনা ও এর শ্রেষ্ঠত্ব 125

অধ্যায় ৮: আধুনিক রাষ্ট্রে ইসলামি বিচার ব্যবস্থার বাস্তবায়নের রূপরেখা ও উপসংহার..132

৮.১ ইসলামি বিচার ব্যবস্থার মাধ্যমে ধাপে ধাপে আইনি সংস্কার ও অপরাধমুক্ত সামাজিক ও রাষ্ট্রীয় পরিবেশ গঠন 132

৮.২ বিচারকদের যোগ্যতার মানদণ্ড, নিয়োগ প্রক্রিয়া ও বিচার বিভাগের পূর্ণ স্বাধীনতা..136

৮.৩ আধুনিক বিশ্ব প্রেক্ষাপটে মুসলিম দেশগুলোর বিচার বিভাগীয় চ্যালেঞ্জ ও উত্তরণের উপায় 140

৮.৪ উপসংহার.....144

পরিসমাপ্তি (Epilogue) 145

ভূমিকা (Introduction)

ইসলামি বিচার ব্যবস্থার গুরুত্ব ও পটভূমি

মানব সভ্যতার ইতিহাস মূলত ন্যায়বিচার প্রতিষ্ঠার এক নিরন্তর সংগ্রাম। আদিকাল থেকেই মানুষ এমন একটি ভারসাম্যপূর্ণ সমাজ ও আইনি কাঠামোর সন্ধান করেছে, যা সমাজে শান্তি, শৃঙ্খলা এবং প্রত্যেকের ন্যায্য অধিকার নিশ্চিত করতে পারে। সমকালীন বিশ্বে আধুনিক ধর্মনিরপেক্ষ (Secular) আইনি ব্যবস্থা—তা সে রোমান সিভিল ল হোক কিংবা ব্রিটিশ কমন ল—মানব সভ্যতার বিচারিক ইনসাফের চূড়ান্ত রূপ হিসেবে দাবি করা হলেও, এর পদ্ধতিগত জটিলতা, দীর্ঘসূত্রতা, ব্যয়বহুলতা এবং নৈতিকতাহীনতা আজ স্পষ্ট। যেখানে আইন ও ইনসাফ প্রায়শই বিত্তশালী ও ক্ষমতাশালীদের হাতের পুতুলে পরিণত হয়েছে, সেখানে বিশ্বমানবতা আজ এক চরম বিচারিক ও নৈতিক সংকটের মুখোমুখি।

এই বৈশ্বিক সংকটের বিপরীতে ইসলামি বিচার ব্যবস্থা (Islamic Judicial System) এক বৈপ্লবিক, চিরন্তন ও বাস্তবমুখী বিকল্প উপস্থাপন করে। ইসলামি বিচার ব্যবস্থার মূল দর্শন হলো—আইন মানুষের খেয়ালখুশি বা কোনো বিশেষ শ্রেণীর স্বার্থে তৈরি হতে পারে না; বরং আইনের মূল উৎস হতে হবে একমাত্র আল্লাহ তাআলার ঐশ্বরিক ও চিরন্তন হিদায়াত (কুরআন ও সুন্নাহ)। এটি কেবল অপরাধের বাহ্যিক শাস্তি নিশ্চিত করে না, বরং মানুষের অন্তরে আখেরাতের জবাবদিহিতা ও তাকওয়ার অনির্বাণ আলো জ্বেলে দিয়ে অপরাধের মনস্তাত্ত্বিক উৎসমুখকেই বন্ধ করে দেয়।

গবেষণার মূল উদ্দেশ্য ও পরিধি

এই বক্ষ্যমাণ থিসিসের মূল উদ্দেশ্য হলো আধুনিক আইনি দর্শনের (Modern Jurisprudence) সমান্তরালে ইসলামি বিচার ব্যবস্থার তাত্ত্বিক গভীরতা, ফিকহি মূলনীতি, ঐতিহাসিক কার্যকারিতা এবং সমকালীন উপযোগিতা অত্যন্ত প্রামাণ্যরূপে ফুটিয়ে তোলা। দীর্ঘ সময় ধরে প্রাচ্যবিদ (Orientalists) এবং ধর্মনিরপেক্ষ সমালোচকদের পক্ষ থেকে ইসলামের ফৌজদারি দণ্ডবিধি, বিচারিক স্বাধীনতা এবং

অমুসলিমদের অধিকার নিয়ে যেসকল নেতিবাচক অপব্যাখ্যা ও অপপ্রচার চালানো হয়েছে, বুনিয়াদি ফিকহি মাসয়ালা এবং ঐতিহাসিক দলিলের আলোকে এই গবেষণায় তার বস্তুনিষ্ঠ খণ্ডন করা হয়েছে।

থিসিসটি মূলত আটটি সুনির্দিষ্ট অধ্যায়ে বিন্যস্ত করা হয়েছে:
ক. প্রথম থেকে তৃতীয় অধ্যায়ে: ইসলামি বিচার ব্যবস্থার মৌলিক ধারণা, এর উৎসসমূহ (কুরআন, সুন্নাহ, ইজমা, কিয়াস) এবং বিচার বিভাগের (কাজা) ঐতিহাসিক ক্রমবিকাশ আলোচনা করা হয়েছে।
খ. চতুর্থ ও পঞ্চম অধ্যায়ে: দেওয়ানি, ফৌজদারি ও সাক্ষ্য আইনের (Law of Evidence) ফিকহি কার্যবিধি এবং বিচারকের (কাজী) গুণাবলী ও আচরণবিধি বিশ্লেষণ করা হয়েছে।
গ. ষষ্ঠ ও সপ্তম অধ্যায়ে: মানবাধিকার, সমকালীন অপব্যাখ্যার খণ্ডন এবং আধুনিক ধর্মনিরপেক্ষ আইনি ব্যবস্থার সাথে ইসলামের তুলনামূলক শ্রেষ্ঠত্ব পয়েন্ট আকারে উপস্থাপন করা হয়েছে।
ঘ. অষ্টম অধ্যায়ে: আধুনিক রাষ্ট্রে ধাপে ধাপে এই মহান বিচার ব্যবস্থা বাস্তবায়নের একটি প্রায়োগিক রূপরেখা ও চ্যালেঞ্জসমূহ চিহ্নিত করে থিসিসটির সমাপ্তি টানা হয়েছে।

গবেষণার পদ্ধতি ও উৎসসমূহ

এই থিসিস রচনার ক্ষেত্রে ঐতিহ্যবাহী ইসলামি ফিকহশাস্ত্রের মূল উৎসসমূহ এবং আধুনিক তুলনামূলক আইনবিজ্ঞানের (Comparative Jurisprudence) যৌথ পদ্ধতি অনুসরণ করা হয়েছে। হানাফি ফিকহের চূড়ান্ত প্রামাণ্য গ্রন্থসমূহ, যেমন—ইমাম কাসানির বাদায়েউস সানায়ে, আল্লামা ইবনে আবিদীনের রাদ্দুল মুহতার, ইমাম আবু ইউসুফের কিতাবুল খারাজ এবং উসমানীয় খিলাফতের কালজয়ী আইনি সংকলন মাজাল্লাতুল আহকামিল আদলিয়্যাহ-কে এখানে প্রধান আইনি ভিত্তি হিসেবে গ্রহণ করা হয়েছে। একই সাথে শাফেয়ি, মালেকি ও হাম্বলি ফিকহের প্রখ্যাত ইমামদের আইনি ও শাসনতান্ত্রিক ব্যাখ্যাসমূহও সুনির্দিষ্ট রেফারেন্সসহ যুক্ত করা হয়েছে, যাতে গ্রন্থটি

যেকোনো গবেষক, আইনজীবী এবং সাধারণ পাঠকের জন্য একটি নির্ভরযোগ্য ও প্রামাণ্য দলিল হিসেবে গণ্য হতে পারে।

মহান আল্লাহর দরবারে প্রার্থনা, তিনি যেন আমাদের এই বুদ্ধিবৃত্তিক ও গবেষণামূলক প্রচেষ্টাকে কবুল করেন এবং এটিকে সমাজে ইনসাফ ও শান্তি প্রতিষ্ঠার একটি কল্যাণময় মাধ্যম বানিয়ে দেন।

১ম অধ্যায়: ইসলামি বিচার ব্যবস্থা কী এবং কেন?

এই প্রারম্ভিক অধ্যায়ে ইসলামি বিচার ব্যবস্থার (আল-কাজা) তাত্ত্বিক ভিত্তি, এর মৌলিক সংজ্ঞা এবং মানবসমাজে এর অপরিহার্যতার ওপর বিশদ আলোকপাত করা হয়েছে। একটি আদর্শ ও বৈষম্যহীন সমাজ বিনির্মাণে বিচার বিভাগের ভূমিকা কী এবং কেন প্রচলিত মানবঘটিত আইনের চেয়ে ইসলামি বিচার দর্শন শ্রেষ্ঠ ও স্বতন্ত্র—তা এই অধ্যায়ের মূল আলোচ্য বিষয়।

১.১ ইসলামি বিচার ব্যবস্থার আভিধানিক ও পারিভাষিক সংজ্ঞা

ইসলামি সমাজ ও রাষ্ট্রব্যবস্থার অন্যতম প্রধান স্তম্ভ হলো এর বিচার ব্যবস্থা। আরবিতে বিচার ব্যবস্থাকে 'আল-কাযা' (القَضَاء) বলা হয়। এটি এমন একটি আইনি ও শাসনতান্ত্রিক প্রক্রিয়া যার মাধ্যমে সমাজে ইনসাফ কায়েম করা হয়, মজলুমের অধিকার ফিরিয়ে দেওয়া হয় এবং অপরাধের অবসান ঘটিয়ে শান্তি-শৃঙ্খলা রক্ষা করা হয়। ইসলামি শরিয়তে বিচার ব্যবস্থার মূল উদ্দেশ্য কেবল অপরাধের শাস্তি দেওয়া নয়, বরং স্রষ্টার বিধান অনুযায়ী মানুষের অধিকার নিশ্চিত করে একটি ভারসাম্যপূর্ণ সমাজ গঠন করা। আভিধানিক ও পারিভাষিক উভয় দিক থেকেই এই শব্দটির গভীরতা ও ব্যাপকতা রয়েছে।

- কুরআনের আয়াত ও অনুবাদ

কুরআন মাজিদে 'কাযা' শব্দটি ফয়সালা, চূড়ান্ত আদেশ ও সত্য প্রতিষ্ঠার অর্থে একাধিক স্থানে ব্যবহৃত হয়েছে। আল্লাহ তাআলা বিচারকের প্রধান দায়িত্ব এবং তাঁর শাশ্বত সিদ্ধান্তের কথা উল্লেখ করে ইরশাদ করেন:

وَاللَّهُ يَقْضِي بِالْحَقِّ ۖ وَالَّذِينَ يَدْعُونَ مِنْ دُونِهِ لَا يَقْضُونَ بِشَيْءٍ ۗ إِنَّ اللَّهَ هُوَ السَّمِيعُ الْبَصِيرُ

অনুবাদ: "আল্লাহ ফয়সালা করেন সত্য ও ন্যায়ের সাথে। আর আল্লাহকে ছেড়ে তারা (মিথ্যা উপাস্যদের) যাদের ডাকে, তারা কোনো কিছুরই ফয়সালা করতে পারে না। নিশ্চয়ই আল্লাহ সর্বশ্রোতা, সর্বদ্রষ্টা।" (সূরা গাফির, আয়াত: ২০)

- হাদিসের মতন ও অনুবাদ

বিচারকের আসনটি কত বড় আমানত এবং সঠিক বিচার না করলে তার পরিণতি কতটা ভয়াবহ, তা বর্ণনা করে রাসূলুল্লাহ (সা.) ইরশাদ করেছেন:

الْقُضَاةُ ثَلَاثَةٌ: وَاحِدٌ فِي الْجَنَّةِ، وَاثْنَانِ فِي النَّارِ، فَأَمَّا الَّذِي فِي الْجَنَّةِ فَرَجُلٌ عَرَفَ الْحَقَّ فَقَضَى بِهِ، وَرَجُلٌ عَرَفَ الْحَقَّ فَجَارَ فِي الْحُكْمِ فَهُوَ فِي النَّارِ، وَرَجُلٌ قَضَى لِلنَّاسِ عَلَى جَهْلٍ فَهُوَ فِي النَّارِ

অনুবাদ: "বিচারকগণ তিন প্রকারের হয়ে থাকেন; যাদের এক প্রকার জান্নাতি এবং বাকি দুই প্রকার জাহান্নামি। যে জান্নাতি, সে হলো এমন ব্যক্তি যে সত্যকে চিনেছে বা জেনেছে এবং সেই অনুযায়ী ফয়সালা করেছে। আর যে ব্যক্তি সত্যকে জানা সত্ত্বেও বিচারে অন্যায় বা পক্ষপাতিত্ব করেছে, সে জাহান্নামি। এবং যে ব্যক্তি অজ্ঞতা সত্ত্বেও মানুষের মাঝে (না জেনে) ফয়সালা বা বিচার করেছে, সেও জাহান্নামি।" (সুনানে আবু দাউদ, হাদিস নং: ৩৫৭৩; সুনানে ইবনে মাজাহ, হাদিস নং: ২৩১৫)

- ফিকহি মাসয়ালা ও তাত্ত্বিক বিশ্লেষণ

ক. আভিধানিক সংজ্ঞা (Linguistic Meaning):

আরবি ভাষা ও অভিধান শাস্ত্রের ইমামগণের (যেমন: ইবনে মনযুর, আল-ফিওমি) মতে, 'আল-কাযা' (القَضَاء) শব্দটির মূল ধাতু (Root) হলো 'কাযায়া' (قَضَيَ)। এর কয়েকটি মূল আভিধানিক অর্থ রয়েছে:

১. আল-হুকুম (الحُكْمُ): মীমাংসা বা রায় দেওয়া।
২. আল-আমল (الأَمْرُ): আদেশ বা বাধ্যবাধকতা তৈরি করা।
৩. আল-ইলযাম (الإِلْزَامُ): কোনো কিছু চাপিয়ে দেওয়া বা আবশ্যক করা।
৪. আল-ফারাগ (الفَرَاغُ): কোনো ঝগড়া বা বিরোধের চূড়ান্ত সমাপ্তি টানা।

আইনি সম্পর্ক: বিচারকের রায়কে আভিধানিক কারণেই 'কাযা' বলা হয়, কারণ এর মাধ্যমে দুই পক্ষের ঝগড়া চিরতরে সমাপ্ত (ফারাগ) হয় এবং তাদের ওপর একটি সিদ্ধান্ত আবশ্যক (ইলযাম) করে দেওয়া হয়।

খ. পারিভাষিক সংজ্ঞা (Jurisprudential Meaning):
ইসলামি শরিয়তের পরিভাষায় 'আল-কাযা' হলো—"শরিয়তের অকাট্য প্রমাণের ভিত্তিতে জনগণের পারস্পরিক বিরোধ মিটিয়ে দেওয়ার লক্ষ্যে কোনো যোগ্য ব্যক্তি কর্তৃক আইনি ও বাধ্যতামূলক সিদ্ধান্ত প্রদান করা।"

চার মাজহাবের ফকিহগণের দেওয়া সুনির্দিষ্ট আইনি সংজ্ঞা নিচে তুলে ধরা হলো:
১. হানাফি মাজহাব: ইমাম ইবনুল হুমাম (রহ.) বলেন, শরিয়তের আইনি প্রমাণের ভিত্তিতে জনগণের পারস্পরিক কলহ-বিবাদ দূর করা এবং হকের সপক্ষে এমন আদেশ জারি করা, যা বাস্তবায়ন করা রাষ্ট্রের জন্য বাধ্যতামূলক।

২. মালেকি মাজহাব: ইমাম ইবনে আরাফাহ (রহ.)-এর মতে, এটি এমন একটি শাসনতান্ত্রিক পদ, যার মাধ্যমে আল্লাহর আইন অনুযায়ী প্রমাণিত সত্যের ভিত্তিতে কোনো সাধারণ (পাবলিক) বা ব্যক্তিগত বিরোধে এমন রায় দেওয়া হয়, যা অমান্য করার অধিকার কারও থাকে না।

৩. শাফেয়ি মাজহাব: ইমাম রাফেয়ি (রহ.) বলেন, দুই বা ততোধিক বিবাদমান পক্ষের মধ্যে শরিয়তের বিধিমালার আলোকে হকের ফয়সালা করা এবং মজলুমের অধিকার আদায় করে দেওয়া।

৪. হাম্বলি মাজহাব: ইমাম ইবনে কুদামা (রহ.) বলেন, বিচারিক এখতিয়ারসম্পন্ন কর্তৃপক্ষ বা বিচারক (কাযি) কর্তৃক সাধারণ মানুষের মধ্যকার ঝগড়া-বিবাদ বা অধিকারের লড়াই শরিয়তের বিধান অনুযায়ী মীমাংসা করে দেওয়া।

- একাডেমিক রেফারেন্স (উৎস গ্রন্থসমূহ)

হানাফি ফিকহ: ইমাম ইবনুল হুমাম (রহ.), ফাতহুল কাদির খুতবা আল-কাযা (فتح القدير), খণ্ড: ৬, পৃষ্ঠা: ২৫৪; এবং ইমাম কাসানি (রহ.), বাদায়েউস সানায়ে ফি তারতিবিশ শারায়ে, খণ্ড: ৭, পৃষ্ঠা: ২।
মালেকি ফিকহ: ইমাম ইবনে ফারহুন (রহ.), তাবসিরাতুল হুক্কাম ফি উসুলিল আকযিয়াহ (تبصرة الحكام), খণ্ড: ১, পৃষ্ঠা: ১২-১৩।

শাফেয়ি ফিকহ: খতিব শিরবিনি (রহ.),
মুগনি আল-মুহতাজ ইলা মা'রিফাতি মা'আনি আলফাজিল মিনহাজ (مُغْنِي الْمُحْتَاجِ إِلَى مَعْرِفَةِ مَعَانِي أَلْفَاظِ الْمِنْهَاجِ) খণ্ড: ৬, পৃষ্ঠা: ২৬৩-২৬৪।
হাম্বলি ফিকহ: ইমাম ইবনে কুদামা (রহ.), আল-মুগনি (المغني), খণ্ড: ১১, পৃষ্ঠা: ৩৭০।

১.২ ইসলামি বিচার ব্যবস্থার মূল উৎসসমূহ (কুরআন, সুন্নাহ, ইজমা ও কিয়াস)

ইসলামি বিচার ব্যবস্থার অনন্য বৈশিষ্ট্য হলো, এটি মানুষের তৈরি কোনো সাময়িক বা খেয়াল-খুশিপূর্ণ আইনের ওপর ভিত্তি করে গড়ে ওঠেনি। বরং এর একটি সুনির্দিষ্ট ও শাশ্বত আইনি উৎস কাঠামো রয়েছে, যা মানবজাতিকে সর্বোচ্চ ইনসাফ ও অবিচারের হাত থেকে সুরক্ষা দেয়। ইসলামি শরিয়ত ও বিচার ব্যবস্থার মূল উৎস চারটি। এর মধ্যে প্রধান দুটি উৎস হলো ওহী-ভিত্তিক—পবিত্র কুরআন ও সুন্নাহ। আর বাকি দুটি হলো ওহীর আলোকেই গঠিত বিচারিক বুদ্ধিমত্তা ও ঐকমত্যের উৎস—ইজমা (আইনবিদদের সর্বসম্মত সিদ্ধান্ত) এবং কিয়াস (আইনি সাদৃশ্যতার নীতি)। একজন বিচারক (কাযি) কোনো মামলার রায় দেওয়ার ক্ষেত্রে ক্রমানুসারে এই চারটি উৎস থেকে আইনি সমাধান খুঁজে বের করতে বাধ্য।

- কুরআনের আয়াত ও অনুবাদ

ইসলামি বিচার ব্যবস্থায় আল-কুরআন হলো সংবিধান ও আইনের সর্বোচ্চ উৎস। বিচারে ওহীর অনুসরণ এবং ক্রমানুসারে আইনি উৎস ব্যবহারের নির্দেশ দিয়ে আল্লাহ তাআলা ইরশাদ করেন:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ ۖ فَإِنْ تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ۚ ذَٰلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا

অনুবাদ: "হে মুমিনগণ! তোমরা আনুগত্য করো আল্লাহর, আনুগত্য করো রাসূলের এবং তোমাদের মধ্যকার উলিল আমর (ন্যায়পরায়ণ শাসক/জ্ঞানী)-গণের। অতঃপর কোনো বিষয়ে যদি তোমরা বিরোধে লিপ্ত হও, তবে তা আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের দিকে ফিরিয়ে

দাও—যদি তোমরা আল্লাহ ও শেষ দিবসের ওপর ঈমান এনে থাকো। এটাই উত্তম এবং পরিণতির দিক থেকে সবচেয়ে সুন্দর।" (সূরা আন-নিসা, আয়াত: ৫৯)

- হাদিসের মতন ও অনুবাদ

রাসূলুল্লাহ (সা.) যখন বিখ্যাত সাহাবি হযরত মুয়াজ ইবনে জাবাল (রা.)-কে ইয়ামানের গভর্নর ও প্রধান বিচারক হিসেবে প্রেরণ করেন, তখন আইনি উৎসের এই ক্রমবিন্যাসটি তিনি নিজেই অনুমোদন করেছিলেন:

أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَعَثَ مُعَاذًا إِلَى الْيَمَنِ فَقَالَ :كَيْفَ تَقْضِي إِذَا عَرَضَ لَكَ قَضَاءٌ؟ قَالَ :أَقْضِي بِكِتَابِ اللَّهِ .قَالَ :فَإِنْ لَمْ تَجِدْ فِي كِتَابِ اللَّهِ؟ قَالَ :فَبِسُنَّةِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ .قَالَ :فَإِنْ لَمْ تَجِدْ فِي سُنَّةِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَلَا فِي كِتَابِ اللَّهِ؟ قَالَ :أَجْتَهِدُ رَأْيِي وَلَا آلُو .فَضَرَبَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَدْرَهُ وَقَالَ :الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي وَفَّقَ رَسُولَ رَسُولِ اللَّهِ لِمَا يُرْضِي رَسُولَ اللَّهِ.

অনুবাদ: "রাসূলুল্লাহ (সা.) যখন মুয়াজ (রা.)-কে ইয়ামানে (বিচারক হিসেবে) পাঠাচ্ছিলেন, তখন জিজ্ঞেস করলেন, 'তোমার কাছে কোনো বিচার্য বিষয় আসলে তুমি কীভাবে ফয়সালা করবে?' তিনি বললেন, 'আমি আল্লাহর কিতাব (কোরআন) অনুযায়ী ফয়সালা করব।' রাসূল (সা.) বললেন, 'যদি আল্লাহর কিতাবে তা না পাও?' তিনি বললেন, 'তাহলে আল্লাহর রাসূলের সুন্নাহ অনুযায়ী ফয়সালা করব।' রাসূল (সা.) আবার জিজ্ঞেস করলেন, 'যদি আল্লাহর রাসূলের সুন্নাহ এবং আল্লাহর কিতাবেও তা না পাও?' তিনি বললেন, 'তাহলে আমি আমার বিচারিক বুদ্ধি দিয়ে ইজতিহাদ (গবেষণা) করব এবং এতে কোনো কমতি করব না।' তখন রাসূলুল্লাহ (সা.) তাঁর বুকে চাপড় দিলেন এবং বললেন, 'সমস্ত প্রশংসা আল্লাহর, যিনি আল্লাহর রাসূলের প্রতিনিধিকে এমন বিষয়ের তাওফিক দিয়েছেন, যা আল্লাহর রাসূলকে সন্তুষ্ট করে।" (সুনানে আবু দাউদ, হাদিস নং: ৩৫৯২; সুনানে তিরমিজি, হাদিস নং: ১৩২৭)

- ফিকহি মাসয়ালা ও তাত্ত্বিক বিশ্লেষণ

চার মাজহাবের ইমামগণ এবং ইসলামি আইনবিদগণ একমত যে, আদালতের এজলাসে বিচারককে আইনি উৎসের এই চারটি স্তর কঠোরভাবে মেনে চলতে হবে। কোনো স্তরে আইন স্পষ্ট থাকলে তা লঙ্ঘন করে পরবর্তী স্তরে যাওয়া অবৈধ।

১. প্রথম উৎস: আল-কুরআন (الكتاب)

কুরআন হলো ইসলামি আইনের মূল ভিত্তি। দেওয়ানি, ফৌজদারি, পারিবারিক বা আন্তর্জাতিক—যেকোনো বিরোধের ক্ষেত্রে বিচারক সর্বপ্রথম কুরআনের অকাট্য বিধান (নস) খুঁজবেন। যেমন: হত্যার বদলে কিসাস বা চুরির শাস্তি হুদুদ। যদি কুরআনে সমাধান সরাসরি থাকে, তবে বিচারক নিজের মতামত প্রয়োগ করতে পারবেন না।

২. দ্বিতীয় উৎস: আস-সুন্নাহ (السنّة)

কুরআনের বিধানগুলোর প্রায়োগিক রূপ ও ব্যাখ্যা পাওয়া যায় সুন্নাহ বা হাদিসে। বহু আইনি কার্যবিধি (যেমন: বাদীর প্রমাণ ও বিবাদীর কসমের নীতি) সুন্নাহ দ্বারা প্রমাণিত। কুরআনে সরাসরি কোনো বিষয়ের চূড়ান্ত বিবরণ না থাকলে সুন্নাহ-ই হবে অকাট্য আইনি দলিল।

৩. তৃতীয় উৎস: আল-ইজমা (الإجماع)

রাসূলুল্লাহ (সা.)-এর ওফাতের পর কোনো যুগের সমস্ত মুজতাহিদ ফকিহ ও আইনবিদগণ যদি শরিয়তের কোনো আইনি বিষয়ে একমত হন, তবে তাকে ইজমা বলা হয়। আদালত ইজমা দ্বারা সাব্যস্ত আইনের পরিপন্থী কোনো রায় দিতে পারে না। (যেমন: হযরত আবু বকর (রা.)-এর যুগে দাদীর মিরাসের সম্পত্তির অধিকার ইজমা দ্বারা চূড়ান্ত হয়েছিল)।

৪. চতুর্থ উৎস: আল-কিয়াস (القياس)

কুরআন, সুন্নাহ বা ইজমাতে যদি নতুন উদ্ভূত কোনো সমস্যার সরাসরি সমাধান না পাওয়া যায়, তবে বিচারক 'কিয়াস' বা আইনি সাদৃশ্যতার নীতি অবলম্বন করবেন। অর্থাৎ, পুরোনো কোনো আইনের মূল কারণ বা ইল্লত (Ratio Legis) বিশ্লেষণ করে সমপ্রকৃতির নতুন সমস্যার ওপর সেই আইন প্রয়োগ করা। (যেমন: আধুনিক যুগের কোনো নতুন মাদকদ্রব্যের আইনি বিধান কিয়াসের মাধ্যমে মদের নিষেধাজ্ঞার আওতায় এনে শাস্তি নির্ধারণ করা)।

- একাডেমিক রেফারেন্স (উৎস গ্রন্থসমূহ)

হানাফি ফিকহ ও উসুল: ইমাম শামসুল আইম্মা আস-সারাহসি (রহ.), উসুলুস সারাহসি (أصول السرخسي), খণ্ড: ১, পৃষ্ঠা: ২৭৯-২৮০; এবং ইমাম কাসানি (রহ.), বাদায়েউস সানায়ে, খণ্ড: ৭, পৃষ্ঠা: ৩।
মালেকি ফিকহ ও উসুল: ইমাম ইবনে রুশদ (আল-হাফিদ), বিদায়াতুল মুজতাহিদ ওয়া নিহায়াতুল মুকতাসিদ (بداية المجتهد ونهاية المقتصد), কিতাবুল আকযিয়াহ (বিচার অধ্যায়), খণ্ড: ৪, পৃষ্ঠা: ১৬২-১৬৩।
শাফেয়ি ফিকহ ও উসুল: ইমাম আবু আবদুল্লাহ আল-শাফেয়ি (রহ.), কিতাবুল উম্ম (كتاب الأم), খণ্ড: ৭, পৃষ্ঠা: ২৯৮-৩০০; এবং খতিব শিরবিনি (রহ.), মুগনি আল-মুহতাজ, খণ্ড: ৪, পৃষ্ঠা: ৩৭৬।
হাম্বলি ফিকহ ও উসুল: ইমাম ইবনে কুদামা (রহ.), রাওদাতুন নাযির ওয়া জুন্নাতুল মুনাযির (روضة الناظر وجنة المناظر - উসুল শাস্ত্রের গ্রন্থ), খণ্ড: ১, পৃষ্ঠা: ১৮৫; এবং আল-মুগনি, খণ্ড: ১১, পৃষ্ঠা: ৩৮১।

১.৩ আইনের দৃষ্টিতে সমতা ও জাহেলি যুগের বিচারহীনতার সাথে ইসলামি বিচার ব্যবস্থার ইনসাফের তুলনা

ইসলামি বিচার ব্যবস্থার অন্যতম গৌরবময় দিক হলো আইনের দৃষ্টিতে সবার সমান অধিকার এবং পক্ষপাতহীন ইনসাফ প্রতিষ্ঠা। ইসলাম-পূর্ব আরবের 'জাহেলি যুগ' (অন্ধকার যুগ) ছিল এক চরম বৈষম্য ও বিচারহীনতার যুগ। সেই সমাজে আইন এবং বিচার নির্ধারিত হতো মানুষের গোত্রীয় শক্তি, সামাজিক মর্যাদা ও ধন-সম্পদের ওপর ভিত্তি করে। প্রভাবশালী ও উচ্চবংশের কেউ অপরাধ করলে সে পার পেয়ে যেত, আর দুর্বল বা দাস শ্রেণীর কেউ সামান্য অপরাধ করলেও তার ওপর নেমে আসত নির্মম নির্যাতন।

ইসলাম এসে এই প্রথার মূলে কুঠারাঘাত করে এবং ঘোষণা করে যে—শাসক-শাসিত, ধনী-দরিদ্র, উচ্চবংশ-নিম্নবংশ, এমনকি মুসলিম-অমুসলিম নির্বিশেষে আইনের দৃষ্টিতে সবাই সমান। শরিয়তের আদালতে অপরাধী কেবলই একজন অপরাধী, তার সামাজিক পরিচয় বিচারে কোনো প্রভাব ফেলতে পারে না।

- কুরআনের আয়াত ও অনুবাদ

জাতীয় বা ব্যক্তিগত শত্রুতা যেন কোনোভাবেই নিরপেক্ষ বিচার প্রাপ্তিতে বাধা না হয়, তা কঠোরভাবে নির্দেশ দিয়ে আল্লাহ তাআলা ইরশাদ করেন:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُونُوا قَوَّامِينَ لِلَّهِ شُهَدَاءَ بِالْقِسْطِ ۖ وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَآنُ قَوْمٍ عَلَىٰ أَلَّا تَعْدِلُوا ۚ اعْدِلُوا هُوَ أَقْرَبُ لِلتَّقْوَىٰ ۖ وَاتَّقُوا اللَّهَ ۚ إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ

অনুবাদ: "হে মুমিনগণ! তোমরা আল্লাহর উদ্দেশ্যে ন্যায় সাক্ষ্যদানে সদাপ্রতিষ্ঠিত থাকো এবং কোনো সম্প্রদায়ের শত্রুতা যেন তোমাদের এমনভাবে প্ররোচিত না করে যে, তোমরা ইনসাফ করবে না। তোমরা ইনসাফ করো, এটা তাকওয়ার সবচেয়ে নিকটবর্তী। আর আল্লাহকে ভয় করো; তোমরা যা করো, নিশ্চয়ই আল্লাহ সে বিষয়ে সম্যক অবহিত।" (সূরা আল-মায়েদাহ, আয়াত: ৮)

- হাদিসের মতন ও অনুবাদ

জাহেলি যুগের বিচারহীনতার সংস্কৃতিকে তীব্রভাবে আঘাত করে এবং আইনের দৃষ্টিতে সমতার ঐতিহাসিক ঘোষণা দিয়ে রাসূলুল্লাহ (সা.) ইরশাদ করেছেন (মাখযুম গোত্রের এক সম্ভ্রান্ত মহিলার চুরির ক্ষমার সুপারিশের প্রেক্ষিতে):

إِنَّمَا أَهْلَكَ الَّذِينَ قَبْلَكُمْ أَنَّهُمْ كَانُوا إِذَا سَرَقَ فِيهِمُ الشَّرِيفُ تَرَكُوهُ، وَإِذَا سَرَقَ فِيهِمُ الضَّعِيفُ أَقَامُوا عَلَيْهِ الْحَدَّ، وَايْمُ اللَّهِ لَوْ أَنَّ فَاطِمَةَ بِنْتَ مُحَمَّدٍ سَرَقَتْ لَقَطَعْتُ يَدَهَا

অনুবাদ: "তোমাদের পূর্ববর্তী জাতিসমূহ মূলত এজন্যই ধ্বংস হয়ে গেছে যে, যখন তাদের মধ্যে কোনো প্রভাবশালী বা সম্ভ্রান্ত ব্যক্তি চুরি করত, তখন তারা তাকে ছেড়ে দিত (শাস্তি দিত না)। আর যখন কোনো দুর্বল বা সাধারণ ব্যক্তি চুরি করত, তখন তারা তার ওপর শাস্তি (হদ) কার্যকর করত। আল্লাহর কসম! মুহাম্মাদের কন্যা ফাতিমাও যদি চুরি করত, তবে আমি অবশ্যই তার হাত কেটে দিতাম।" (সহিহ বুখারি, হাদিস নং: ৩৪৭৫; সহিহ মুসলিম, হাদিস নং: ১৬৮৮)

- ফিকহি মাসয়ালা ও তাত্ত্বিক বিশ্লেষণ

চার মাজহাবের ফকিহগণ আদালতের এজলাসে বাদী-বিবাদীর মধ্যে সমতা বজায় রাখার বিষয়ে সুনির্দিষ্ট আইনি বিধিমালা প্রণয়ন করেছেন। এখানে জাহেলি ব্যবস্থার বিপরীত ইসলামি ইনসাফের মূল মাসয়ালাগুলো তুলে ধরা হলো:

১. এজলাসে বসার ক্ষেত্রে সমতা (التسوية في المجلس):

যদি মুসলিম রাষ্ট্রের খলিফা বা দেশের প্রধানমন্ত্রী এবং একজন সাধারণ চোর বা অমুসলিম নাগরিকও একই মামলায় আদালতে উপস্থিত হন, তবে বিচারক (কাযি) উভয়কে সমানভাবে দাঁড় করাবেন বা বসাবেন। খলিফা বা প্রভাবশালী বলে তাকে বিশেষ কোনো আসন বা অতিরিক্ত সম্মান দেওয়া যাবে না। এটি জাহেলি যুগের সম্পূর্ণ বিপরীত, যেখানে ধনীদের জন্য আলাদা বিচারিক সুবিধা ছিল।

২. দৃষ্টিপাত ও সম্বোধনে সমতা (التسوية في النظر والخطاب):

বিচারক যখন মামলার শুনানির সময় কথা বলবেন, তখন তিনি কোনো এক পক্ষের দিকে বেশি তাকিয়ে থাকা বা নরম সুরে কথা বলা এবং অপর পক্ষের দিকে রাগান্বিতভাবে তাকানো বা অবহেলা করতে পারবেন না। উভয় পক্ষকে সমান গুরুত্ব দিয়ে শুনতে হবে।

৩. অমুসলিমদের আইনি সমতা:

কিসাস (হত্যার বদলে হত্যা) ও দিয়াতের (রক্তপণ) ক্ষেত্রে ইসলামি ফিকহের অন্যতম বিধান হলো, কোনো মুসলিম যদি জিম্মি (ইসলামি রাষ্ট্রের অমুসলিম নাগরিক)-কে অন্যায়ভাবে হত্যা করে, তবে হানাফি মাজহাবের চূড়ান্ত ফয়সালা অনুযায়ী সেই মুসলিমের ওপরও মৃত্যুদণ্ড কার্যকর করা হবে। আইনের দৃষ্টিতে রক্তের মূল্যে এখানে কোনো বৈষম্য করা হয়নি।

৪. রাষ্ট্রপ্রধানের আইনি দায়মুক্তিহীনতা (عدم الحصانة للمسؤولين):

আধুনিক আইনে রাষ্ট্রপ্রধান বা কূটনীতিকদের কিছু ক্ষেত্রে আইনি দায়মুক্তি (Immunity) দেওয়া হলেও ইসলামি ফিকহে এর কোনো সুযোগ নেই। খলিফা বা কোনো গভর্নর যদি সাধারণ নাগরিকের ওপর জুলুম করেন, তবে সাধারণ দেওয়ানি বা ফৌজদারি আদালতে তার বিচার হবে এবং শাস্তি কার্যকর হবে।

৫. শাস্তি ও জরিমানায় সমতা:

হুদুদ বা কিসাসের ক্ষেত্রে অভিজাত ও সাধারণের জন্য আলাদা কোনো শাস্তির বিধান নেই। চুরির শাস্তি বা ব্যভিচারের শাস্তি সমাজের সর্বস্তরের মানুষের জন্য সমান।

- একাডেমিক রেফারেন্স (উৎস গ্রন্থসমূহ)

হানাফি ফিকহ: ইমাম আলাউদ্দীন আল-কাসানি (রহ.), বাদায়েউস সানায়ে ফি তারতিবিশ শারায়ে, কিতাব আদাবিল কাযি (বিচারকের শিষ্টাচার অধ্যায়), খণ্ড: ৭, পৃষ্ঠা: ৯-১০; এবং ইমাম ইবনুল হুমাম (রহ.), ফাতহুল কাদির, খণ্ড: ৭, পৃষ্ঠা: ২৯৮।

মালেকি ফিকহ: ইমাম ইবনে ফারহুন (রহ.), তাবসিpaতুল হুক্কাম ফি উসুলিল আকযিয়াহ, খণ্ড: ১, পৃষ্ঠা: ৩৩-৩৪।

শাফেয়ি ফিকহ: ইমাম শামসুদ্দীন আর-রামলি (রহ.), নিহায়াতুল মুহতাজ ইলা শারহিল মিনহাজ (نهاية المحتاج), খণ্ড: ৮, পৃষ্ঠা: ২৪১-২৪২; এবং খতিব শিরবিনি, মুগনি আল-মুহতাজ, খণ্ড: ৪, পৃষ্ঠা: ৩৮৬।

হাম্বলি ফিকহ: ইমাম ইবনে কুদামা (রহ.), আল-মুগনি, কিতাবুল কাযা, খণ্ড: ১১, পৃষ্ঠা: ৪০৩-৪০৪।

১.৪ বিচারকের আসন একটি বিশাল আমানত

ইসলামি রাষ্ট্র ও সমাজ ব্যবস্থায় বিচারকের (কাযি) পদটি কেবল কোনো জাগতিক চাকরি, সম্মান বা ক্ষমতার উৎস নয়; বরং এটি আল্লাহর পক্ষ থেকে অর্পিত একটি অত্যন্ত ভারী আমানত। বিচারক মূলত জমিনে আল্লাহর আইন ও ইনসাফ বাস্তবায়নে নবুয়তের ছায়াস্বরূপ দায়িত্ব পালন করেন। বিচারকের একটি সঠিক সিদ্ধান্ত যেমন সমাজকে শান্তিময় করে তোলে এবং তাকে জান্নাতের উচ্চ মাকামে পৌঁছায়, তেমনি তার একটি ভুল বা ইচ্ছাকৃত পক্ষপাতদুষ্ট রায় পুরো সমাজকে ধ্বংসের অতলে তলিয়ে দেয় এবং তার নিজের জাহান্নামে যাওয়ার কারণ হয়। এই কারণেই ইসলামি শরিয়তে বিচারকের আসন অলঙ্কৃত করার ব্যাপারে চরম সতর্কতা অবলম্বন করা হয়েছে এবং একে একটি কঠিন পরীক্ষা হিসেবে অবিহিত করা হয়েছে। সালাফে সালেহীন বা পূর্ববর্তী ফকিহগণ আল্লাহর দরবারে জবাবদিহিতার ভয়ে বিচারকের পদ গ্রহণ করতে কেঁদে আকুল হতেন এবং অনেকে তা প্রত্যাখ্যানও করেছেন।

- কুরআনের আয়াত ও অনুবাদ

আমানত রক্ষা করা এবং বিচারকার্য পরিচালনায় ব্যক্তিগত খেয়াল-খুশির ঊর্ধ্বে উঠে আল্লাহর বিধান অনুসরণের কঠোর নির্দেশ দিয়ে আল্লাহ তাআলা ইরশাদ করেন:

إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ ۚ إِنَّ اللَّهَ نِعِمَّا يَعِظُكُمْ بِهِ ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ سَمِيعًا بَصِيرًا

অনুবাদ: "নিশ্চয়ই আল্লাহ তোমাদের নির্দেশ দিচ্ছেন যে, তোমরা যেন আমানতসমূহ তার যোগ্য মালিকদের কাছে ফেরত দাও। আর যখন তোমরা মানুষের মধ্যে বিচার-ফয়সালা করবে, তখন যেন ইনসাফ ও ন্যায়ের সাথে বিচার করো। আল্লাহ তোমাদের যে উপদেশ দিচ্ছেন, তা কতই না চমৎকার! নিশ্চয়ই আল্লাহ সর্বশ্রোতা, সর্বদ্রষ্টা।" (সূরা আন-নিসা, আয়াত: ৫৮)

- হাদিসের মতন ও অনুবাদ

বিচারকের আসন গ্রহণ করার কঠোর মনস্তাত্ত্বিক চাপ এবং এর সঙ্গে জড়িয়ে থাকা পরকালীন ঝুঁকির ব্যাপারে সতর্ক করে রাসূলুল্লাহ (সা.) ইরশাদ করেছেন:

مَنْ جُعِلَ قَاضِيًا بَيْنَ النَّاسِ فَقَدْ ذُبِحَ بِغَيْرِ سِكِّينٍ

অনুবাদ: "যাকে মানুষের মধ্যে বিচারক হিসেবে নিয়োগ দেওয়া হলো, তাকে যেন (ধারালো) ছুরি ছাড়াই জবেহ করা হলো।" (সুনানে আবু দাউদ, হাদিস নং: ৩৫৭১; সুনানে তিরমিজি, হাদিস নং: ১৩২৫; সুনানে ইবনে মাজাহ, হাদিস নং: ২৩০৮)

- ফিকহি মাসয়ালা ও তাত্ত্বিক বিশ্লেষণ

চার মাজহাবের ফকিহগণ বিচারকের দায়িত্বকে 'ফরযে কিফায়া' (সমষ্টিগত আবশ্যিক দায়িত্ব) হিসেবে গণ্য করেছেন। তবে এর ভয়াবহতা ও সতর্কতার দিক বিবেচনা করে ফিকহ শাস্ত্রে বেশ কিছু কঠোর আইনি বিধিমালা ও শিষ্টাচার (আদাবুল কাযি) নির্ধারণ করা হয়েছে:

১. বিচারক পদ প্রার্থী হওয়ার বিধান (طلب القضاء):

কোনো ব্যক্তি যদি নিজের ভেতর লোভ বা সামাজিক প্রভাব খাটানোর নিয়ত রাখে, তবে তার জন্য বিচারকের পদ চেয়ে আবেদন করা বা এর জন্য তদবির করা শরিয়তে সম্পূর্ণ নাজায়েয (অবৈধ)। তবে সমাজ যদি যোগ্য সংকটে ভোগে এবং কোনো ব্যক্তি নিশ্চিত জানে যে সে ছাড়া অন্য কেউ এই পদের যোগ্য নয় এবং সে ইনসাফ কায়েম করতে পারবে, তবেই কেবল তার জন্য এই পদ গ্রহণ করা জায়েয, অন্যথায় নয়। ইমাম আবু হানিফা (রহ.)-কে খলিফা মনসুর প্রধান বিচারকের পদ দিতে চাইলে তিনি তা কঠোরভাবে প্রত্যাখ্যান করেন এবং ফলস্বরূপ কারাবরণ ও নির্যাতন সহ্য করেন।

২. উপহার ও দাওয়াত গ্রহণের নিষেধাজ্ঞা (حرمة قبول الهدية):

বিচারক নিযুক্ত হওয়ার পর, তিনি মামলার কোনো পক্ষ বা সাধারণ জনগণের পক্ষ থেকে কোনো প্রকার উপহার-উপঢৌকন (হাদিয়া) গ্রহণ করতে পারবেন না। ফিকহি নীতি অনুযায়ী বিচারকের জন্য উপহার গ্রহণ করা এক প্রকার 'রিশওয়াহ' বা ঘুষের শামিল। একইভাবে, তিনি কোনো বিশেষ বা জাঁকজমকপূর্ণ দাওয়াতে অংশ নিতে পারবেন না, যদি না তা সাধারণ (পাবলিক) দাওয়াত হয় বা বিচারক হওয়ার আগে থেকেই সেই পরিবারে তাঁর যাতায়াত থেকে থাকে।

৩. রাগ বা শারীরিক কষ্টের অবস্থায় বিচার স্থগিত রাখা:

যদি বিচারক চরম রাগান্বিত থাকেন, অতিরিক্ত ক্ষুধার্ত বা তৃষ্ণার্ত হন, অসুস্থতা বা অন্য কোনো শারীরিক-মানসিক কারণে অস্থির থাকেন, তবে সেই অবস্থায় আদালতের এজলাসে বসে কোনো মামলার রায় দেওয়া ফকিহদের সর্বসম্মত সিদ্ধান্ত অনুযায়ী মাকরূহে তাহরিমি বা নিষিদ্ধ। কারণ, এই অবস্থায় মানুষের চিন্তাশক্তি বিভ্রান্ত হতে পারে, যা ইনসাফের পরিপন্থী।

- একাডেমিক রেফারেন্স (উৎস গ্রন্থসমূহ)

হানাফি ফিকহ: ইমাম আলাউদ্দীন আল-কাসানি (রহ.), বাদায়েউস সানায়ে ফি তারতিবিশ শারায়ে, কিতাব আদাবিল কাযি (فصل في بيان ما يكره القاضي وما لا يكره), খণ্ড: ৭, পৃষ্ঠা: ৪-৬; এবং ইমাম ইবনুল হুমাম (রহ.), ফাতহুল কাদির, খণ্ড: ৭, পৃষ্ঠা: ২৫৬-২৫৮।

মালেকি ফিকহ: ইমাম ইবনে ফারহুন (রহ.), তাবসিরাতুল হুক্কাম ফি উসুলিল আকযিয়াহ, খণ্ড: ১, পৃষ্ঠা: ১৫-১৭।
শাফেয়ি ফিকহ: খতিব শিরবিনি (রহ.), মুগনি আল-মুহতাজ ইলা মা'রিফাতি মা'আনি আলফাজিল মিনহাজ, কিতাবুল কাযা, খণ্ড: ৪, পৃষ্ঠা: ৩৭৮-৩৮০ (দারুল কুতুবিল ইলমিয়াহ)।
হাম্বলি ফিকহ: ইমাম ইবনে কুদামা (রহ.), আল-মুগনি, কিতাবুল কাযা, খণ্ড: ১১, পৃষ্ঠা: ৩৭৩-৩৭৫ এবং পৃষ্ঠা: ৩৯৪-৩৯৫।

১.৫ ইসলামি বিচার ব্যবস্থা মানব সমাজে 'কেন' প্রয়োজন?

মানুষ সামাজিক জীব। একা বেঁচে থাকা মানুষের পক্ষে সম্ভব নয় বলেই তাকে সমাজ ও রাষ্ট্র গঠন করে বাস করতে হয়। আর যেখানেই একাধিক মানুষের সহাবস্থান থাকে, সেখানেই মানুষের স্বার্থ, অধিকার, সম্পদ এবং সীমানা নিয়ে পারস্পরিক দ্বন্দ্ব, মতবিরোধ ও ক্ষোভের সৃষ্টি হওয়া স্বাভাবিক। মানবচরিত্রের ভেতর যেমন দয়া ও ইনসাফের গুণ রয়েছে, তেমনি লোভ, হিংসা এবং জুলুমের প্রবণতাও বিদ্যমান। যদি সমাজে কোনো শক্তিশালী ও নিরপেক্ষ বিচার ব্যবস্থা না থাকে, তবে সমাজ রূপ নেয় জোর-যার-মুল্লুক-তার—অর্থাৎ এক পশুবৃত্তিক অরাজকতায়, যেখানে সবলরা দুর্বলদের গ্রাস করে ফেলে।

মানব রচিত আইন ও বিচার ব্যবস্থা অনেক সময় শাসকের স্বার্থরক্ষা করে বা স্থান-কাল-পাত্রভেদে পক্ষপাতদুষ্ট হয়। তাই মানব সমাজে এমন একটি বিচার ব্যবস্থার অপরিহার্য প্রয়োজন, যা মানুষের তৈরি সীমাবদ্ধতার ঊর্ধ্বে উঠে নিখুঁত ঐশী ইনসাফ প্রতিষ্ঠা করবে। ইসলামি বিচার ব্যবস্থা ঠিক এই কারণেই মানব সমাজের জন্য এক পরম নিয়ামত, যা সমাজকে ধ্বংসের হাত থেকে রক্ষা করে টেকসই শান্তি ও শৃঙ্খলার গ্যারান্টি দেয়।

- কুরআনের আয়াত ও অনুবাদ

মানব সমাজে বিচার ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠার মূল উদ্দেশ্য—জুলুমের অবসান ঘটিয়ে ভারসাম্য ও ইনসাফ কায়েম করা। এই প্রয়োজনীয়তা ব্যক্ত করে আল্লাহ তাআলা ইরশাদ করেন:

لَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلَنَا بِالْبَيِّنَاتِ وَأَنْزَلْنَا مَعَهُمُ الْكِتَابَ وَالْمِيزَانَ لِيَقُومَ النَّاسُ بِالْقِسْطِ

অনুবাদ: "নিশ্চয়ই আমি আমার রাসূলগণকে সুস্পষ্ট নিদর্শনসমূহসহ পাঠিয়েছি এবং তাদের সাথে কিতাব ও (ন্যায়ের) মানদণ্ড অবতীর্ণ করেছি, যাতে মানুষ ইনসাফের ওপর প্রতিষ্ঠিত থাকতে পারে।" (সূরা আল-হাদিদ, আয়াত: ২৫)

- হাদিসের মতন ও অনুবাদ

বিচারহীনতা বা সমাজে মজলুমের অধিকার আদায়ের ব্যবস্থা না থাকলে আল্লাহর রহমত কীভাবে উঠে যায় এবং কেন বিচার ব্যবস্থা অপরিহার্য, তা বর্ণনা করে রাসূলুল্লাহ (সা.) ইরশাদ করেছেন:

قَدَّسَ اللَّهُ أُمَّةً لَا يُؤْخَذُ لِضَعِيفِهَا حَقُّهُ مِنْ شَدِيدِهَا غَيْرَ مُتَعْتَعٍ

অনুবাদ: "আল্লাহ সেই জাতিকে কখনো পবিত্র (বা বরকতময়) করবেন না, যে জাতির মধ্যে দুর্বল ব্যক্তির অধিকার শক্তিশালী ব্যক্তির কাছ থেকে কোনো প্রকার সংকোচ বা কষ্ট ছাড়াই আদায় করে দেওয়া হয় না।" (সুনানে ইবনে মাজাহ, হাদিস নং: ২৪২৬; মুসনাদে আহমাদ, হাদিস নং: ২২৫২৪)

- ফিকহি মাসয়ালা ও তাত্ত্বিক বিশ্লেষণ

ইসলামি আইনবিদ ও ফকিহগণ মানব সমাজে বিচার ব্যবস্থা (আল-কাযা) বহাল রাখাকে রাষ্ট্রের অন্যতম প্রধান মৌলিক দায়িত্ব বলে সাব্যস্ত করেছেন। ফিকহের আলোকে এর প্রয়োজনীয়তার মূল আইনি দিকগুলো নিম্নরূপ:

১. ফরযে কিফায়ার বিধান (وجوب القضاء كفاية):

চার মাজহাবের ফকিহদের ঐকমত্য (ইজমা) অনুযায়ী, রাষ্ট্রে বিচারক নিয়োগ করা এবং আদালত চালু রাখা একটি 'ফরযে কিফায়া'। যদি কোনো অঞ্চলে বা রাষ্ট্রে বিচার ব্যবস্থা সম্পূর্ণ ভেঙে পড়ে বা কোনো বিচারক না থাকে, তবে সেই রাষ্ট্রের শাসক এবং সামর্থ্যবান সব নাগরিক আল্লাহর দরবারে পাপিষ্ঠ ও অপরাধী হিসেবে গণ্য হবে। কারণ, বিচার ব্যবস্থা ছাড়া শরিয়তের কোনো হুকুম বা মানুষের অধিকার রক্ষা করা সম্ভব নয়।

২. শরিয়তের পাঁচটি মৌলিক মাকাসিদ বা উদ্দেশ্য রক্ষা (حفظ المقاصد الضرورية):

ইসলামি ফিকহের মূল দর্শন হলো মানুষের পাঁচটি মৌলিক অধিকার বা বিষয় রক্ষা করা: ১. দ্বীন (ধর্ম), ২. নাফস (জীবন), ৩. আকল (বুদ্ধিমত্তা), ৪. নাসল (বংশধারা) এবং ৫. মাল (সম্পদ)। ফকিহগণ বলেন, এই পাঁচটি বিষয় কেবল ওয়াজ-নসীহত বা নৈতিকতার দ্বারা রক্ষা করা সম্ভব নয়, যদি না এর পেছনে আদালতের আইনি ও শাস্তিমূলক বাধ্যবাধকতা থাকে। চোরকে শাস্তি না দিলে সম্পদ বাঁচবে না, খুনিকে কিসাস না দিলে জীবন নিরাপদ হবে না—তাই বিচার ব্যবস্থা মানব সমাজের অস্তিত্বের সুরক্ষাকবচ।

৩. ব্যক্তিগত প্রতিশোধের অরাজকতা বন্ধ করা:

সমাজে যদি আদালত না থাকে, তবে মানুষ নিজের অধিকার আদায়ে বা অন্যায়ের প্রতিশোধ নিতে নিজের হাতে আইন তুলে নেবে। এতে সমাজে রক্তক্ষয়ী যুদ্ধ ও বিশৃঙ্খলা (ফিতনা) ছড়িয়ে পড়বে। ইসলামি ফিকহের একটি সর্বসম্মত নীতি হলো—ব্যক্তিগতভাবে কেউ কারও ওপর শাস্তি প্রয়োগ করতে পারবে না; শাস্তি বা হদ কায়েম করার একচ্ছত্র অধিকার কেবল আদালতের।

- একাডেমিক রেফারেন্স (উৎস গ্রন্থসমূহ)

হানাফি ফিকহ: ইমাম আলাউদ্দীন আল-কাসানি (রহ.), বাদায়েউস সানায়ে ফি তারতিবিশ শারায়ে, কিতাব আদাবিল কাযি (فصل في بيان فرضية القضاء), খণ্ড: ৭, পৃষ্ঠা: ২-৩; এবং ইমাম ইবনে আবিদিন (রহ.), রদ্দুল মুহতার আলাদ দুররিল মুখতার (رد المحتار على الدر المختار), খণ্ড: ৫, পৃষ্ঠা: ৩৫৩।

মালেকি ফিকহ: ইমাম ইবনে ফারহুন (রহ.), তাবসিরাতুল হুক্কাম ফি উসুলিল আকযিয়াহ, খণ্ড: ১, পৃষ্ঠা: ১১-১২।

শাফেয়ি ফিকহ: খতিব শিরবিনি (রহ.), মুগনি আল-মুহতাজ ইলা মা'রিফাতি মা'আনি আলফাজিল মিনহাজ, কিতাবুল কাযা, খণ্ড: ৪, পৃষ্ঠা: ৩৭৪-৩৭৫ (দারুল কুতুবিল ইলমিয়াহ)।

হাম্বলি ফিকহ: ইমাম ইবনে কুদামা (রহ.), আল-মুগনি, কিতাবুল কাযা (باب وجوب القضاء والفتيا), খণ্ড: ১১, পৃষ্ঠা: ৩৭১-৩৭২।

১.৬ মানুষ 'কেন' ইসলামি বিচার ব্যবস্থাকে বেছে নিবে?

আধুনিক বিশ্বে মানুষ যখন প্রচলিত ধর্মনিরপেক্ষ (Secular) আইনি কাঠামো—তা সে ব্রিটিশ কমন ল হোক কিংবা রোমান সিভিল ল—এর মারপ্যাঁচে পড়ে ক্লান্ত, তখন ইসলামি বিচার ব্যবস্থা কেবল একটি ধর্মীয় বিধান হিসেবে নয়, বরং মানব সভ্যতার সুরক্ষাকবচ হিসেবে আবির্ভূত হয়। প্রচলিত বিচার ব্যবস্থা যেখানে অত্যন্ত ব্যয়বহুল, দীর্ঘসূত্রী এবং প্রায়শই প্রভাবশালী ও বিত্তশালীদের স্বার্থ সুরক্ষার হাতিয়ারে পরিণত হয়েছে, সেখানে ইসলামের বিচার দর্শন মানুষের বাহ্যিক আচরণের পাশাপাশি তার অন্তরে আখেরাতের জবাবদিহিতা তৈরি করে।

মানুষ প্রধানত পাঁচটি কারণে প্রচলিত সমস্ত মানবঘটিত আইনের ক্লান্তি পরিহার করে ইসলামি বিচার ব্যবস্থাকে বেছে নিতে বাধ্য:

১. ঐশ্বরিক ও বৈষম্যহীন সাম্য: রাজা ও প্রজা, ধনী ও দরিদ্রের জন্য একই আইনের নিখুঁত প্রয়োগ।

২. সহজলভ্যতা ও দ্রুত নিষ্পত্তি: দীর্ঘ বিচারিক প্রক্রিয়া এবং উকিলদের ফি-র পেছনে পকেট খালি করার সংস্কৃতির অবসান।

৩. তাকওয়াভিত্তিক প্রতিরোধমূলক দর্শন: কেবল শাস্তি নয়, বরং অপরাধের মনস্তাত্ত্বিক উৎসমুখ বন্ধ করা।

৪. মানবিক সংশোধন ও ক্ষতিপূরণ ব্যবস্থা: অপরাধীকে সমাজ থেকে ছুড়ে না ফেলে সংশোধনের সুযোগ এবং ভিকটিমের পরিবারকে অর্থনৈতিকভাবে পুনর্বাসন করা।

৫. পদ্ধতিগত সরলতা ও সততা: ঘুষ, জালিয়াতি এবং আইনের ফাঁকফোকর গলিয়ে অপরাধীর পার পেয়ে যাওয়ার সুযোগের সমাপ্তি।

- কুরআনের আয়াত ও অনুবাদ

আল্লাহ তাআলার দেওয়া বিধানের চেয়ে উত্তম এবং ইনসাফপূর্ণ কোনো আইন হতে পারে না—এই সত্যটি ঘোষণা করে আল্লাহ তাআলা ইরশাদ করেন:

أَفَحُكْمَ الْجَاهِلِيَّةِ يَبْغُونَ ۚ وَمَنْ أَحْسَنُ مِنَ اللَّهِ حُكْمًا لِقَوْمٍ يُوقِنُونَ

অনুবাদ: "তবে কি তারা জাহেলিয়াতের বিচার ফয়সালা কামনা করে? আর নিশ্চিত বিশ্বাসী সম্প্রদায়ের জন্য আল্লাহর চেয়ে উত্তম বিচারক আর কে হতে পারে?" (সূরা আল-মায়েদাহ, আয়াত: ৫০)

- হাদিসের মতন ও অনুবাদ

ইসলামি বিচার ব্যবস্থায় আইনের চোখে সবাই সমান এবং এখানে কোনো সামাজিক প্রভাব খাটানো সম্ভব নয়, তা রাসূলুল্লাহ (সা.) তাঁর বিখ্যাত বাণীতে স্পষ্ট করেছেন:

إِنَّمَا أَهْلَكَ الَّذِينَ قَبْلَكُمْ أَنَّهُمْ كَانُوا إِذَا سَرَقَ فِيهِمُ الشَّرِيفُ تَرَكُوهُ، وَإِذَا سَرَقَ فِيهِمُ الضَّعِيفُ أَقَامُوا عَلَيْهِ الْحَدَّ، وَايْمُ اللَّهِ لَوْ أَنَّ فَاطِمَةَ بِنْتَ مُحَمَّدٍ سَرَقَتْ لَقَطَعْتُ يَدَهَا

অনুবাদ: "তোমাদের পূর্ববর্তী জাতিসমূহ মূলত এজন্যই ধ্বংস হয়ে গেছে যে, যখন তাদের মধ্যে কোনো প্রভাবশালী বা শরিফ লোক চুরি করত, তখন তারা তাকে ছেড়ে দিত। আর যখন কোনো দুর্বল বা সাধারণ মানুষ চুরি করত, তখন তারা তার ওপর শাস্তি (হদ) জারি করত। আল্লাহর কসম! যদি মুহাম্মদের কন্যা ফাতিমাও চুরি করত, তবে আমি অবশ্যই তার হাত কেটে দিতাম।" (সহিহ বুখারি, হাদিস নং: ৩৪৭৫; সহিহ মুসলিম, হাদিস নং: ১৬৮৮)

- ফিকহি মাসয়ালা ও তাত্ত্বিক বিশ্লেষণ

মানুষ কেন এই মহান ব্যবস্থাকে বেছে নেবে, তার ফিকহি ও প্রায়োগিক কারণসমূহ নিচে পয়েন্ট আকারে বিন্যস্ত করা হলো:

১. ব্যয়হীন ও দ্রুত বিচার (سرعة التقاضي وقلة الكلفة):

প্রচলিত আদালতে একটি মামলার রায় পেতে বছরের পর বছর কেটে যায় এবং উকিলদের পেছনে বাদীর সর্বস্বান্ত হতে হয়। হানাফি ফিকহের 'কিতাবুল কাজা' এবং মাজাল্লা (ধারা: ১৭৯২)-এর মূলনীতি অনুযায়ী, ইসলামি আদালতে বিচারপ্রক্রিয়া হবে সম্পূর্ণ দ্রুত এবং কোনো কোর্ট ফি বা আইনি মারপ্যাঁচে মামলা ঝুলিয়ে রাখা যাবে না। কাজী সরাসরি বাদী-বিবাদীর বক্তব্য শুনবেন এবং স্বল্পতম সময়ে রায় প্রদান করবেন, যা সাধারণ মানুষের সময় ও অর্থ বাঁচায়।

২. নৈতিক ও আধ্যাত্মিক জবাবদিহিতা (الوازع الديني):

মানুষের তৈরি আইনে মানুষ কেবল পুলিশের ভয় বা শাস্তির ভয়ে অপরাধ থেকে দূরে থাকে। কিন্তু আড়ালে গেলে বা আইনের ফাঁকফোকর খুঁজে পেলে সে অপরাধে লিপ্ত হয়। অপরদিকে, ইসলামি বিচার ব্যবস্থা মানুষের অন্তরে 'তাকওয়া' বা আল্লাহর ভয় জাগ্রত করে। ফলে অপরাধী নিজে এসে আদালতে নিজের অপরাধ স্বীকার করে পবিত্র

হওয়ার আকুলতা প্রকাশ দেয় (যেমনটি ঘটেছিল মায়েজ ইবনে মালেক ও গামেদিয়া রা.-এর ক্ষেত্রে)।

৩. অপরাধের মনস্তাত্ত্বিক প্রতিরোধ (فلسفة العقوبة):

ইসলামের দণ্ডবিধি (যেমন: হুদুদ ও কিসাস) কেবল অপরাধীকে কষ্ট দেওয়ার জন্য নয়, বরং সমাজে অপরাধের হার শূন্যে নামিয়ে আনার একটি মনস্তাত্ত্বিক প্রতিষেধক। যখন একজন সম্ভাব্য অপরাধী জানবে যে অন্যায়ভাবে কাউকে হত্যা করলে তাকেও মৃত্যুদণ্ড (কিসাস) ভোগ করতে হবে, অথবা চুরির অপরাধে তার হাত কাটা যাবে, তখন সে অপরাধ করার সাহস হারিয়ে ফেলে। ফলে ব্যক্তি শাস্তির মুখোমুখি হওয়ার আগেই পুরো সমাজ নিরাপদ হয়ে যায়।

৪. ক্ষতিপূরণ ও মানবিক পুনর্বাসন (الديات والتعويضات):

পশ্চিমা ফৌজদারি আইনে অপরাধীর জেল বা ফাঁসি হলে রাষ্ট্র সন্তুষ্ট হয়, কিন্তু ভিকটিমের পরিবারের অর্থনৈতিক কোনো লাভ হয় না। ইসলামের 'দিয়াত' বা রক্তপণ এবং 'আরশ' (আঘাতের ক্ষতিপূরণ) ব্যবস্থা অনুযায়ী, অপরাধীর শাস্তি বা অর্থদণ্ডের একটি বড় অংশ সরাসরি ভিকটিম বা তার পরিবার পায়। এর ফলে ক্ষতিগ্রস্ত পরিবারটি সামাজিকভাবে ধ্বংস হওয়া থেকে রক্ষা পায়।

- একাডেমিক রেফারেন্স (উৎস গ্রন্থসমূহ)

ক্লাসিক্যাল ফিকহ ও বিচারিক শ্রেষ্ঠত্ব: ইমাম আলাউদ্দীন আল-কাসানি, বাদায়েউস সানায়ে ফি তারতিবিশ শারায়ে, কিতাবুল কাজা (فضيلة القضاء ومكانته - বিচারের ফজিলত ও মর্যাদা পরিচ্ছেদ), খণ্ড: ৭, পৃষ্ঠা: ৩-৬। আল্লামা ইবনে আবেদিন, রাদ্দুল মুহতার আলাদ দুররিল মুখতার, খণ্ড: ৫, পৃষ্ঠা: ৪০৫-৪১০।

সমকালীন আইনি তুলনা ও সমাজতত্ত্ব: শায়খ মুস্তফা আস-সিবাঈ, মিন রাওয়াই শারিআতিনা (আমাদের শরীয়তের সৌন্দর্যসমূহ), বৈরুত সংস্করণ, পৃষ্ঠা: ১৪০-১৬৫ (ইসলামি বিচার ব্যবস্থার অনন্য বৈশিষ্ট্যাবলী অধ্যায়)। ড. ওহাবা আয-জুহাইলি, আল-ফিকহুল ইসলামি ওয়া আদিল্লাতুহু, খণ্ড: ৮, পৃষ্ঠা: ৬০১৭-৬০৩০ (কেন ইসলামি আইন সমকালীন বিশ্বের একমাত্র বিকল্প)।

অধ্যায় ২: ইসলামি বিচার ব্যবস্থার মূলনীতিসমূহ

ইসলামি জুরিসপ্রুডেন্স বা আইনশাস্ত্রে বিচারিক প্রক্রিয়ার বিশুদ্ধতা ও নিরপেক্ষতা বজায় রাখার জন্য কিছু সুনির্দিষ্ট ও অলঙ্ঘনীয় মূলনীতি (Legal Maxims) নির্ধারণ করা হয়েছে। এই দ্বিতীয় অধ্যায়ে সেই সকল বুনিয়াদি আইনি নীতিমালার তাত্ত্বিক ও প্রায়োগিক দিক নিয়ে বিস্তারিত আলোচনা করা হয়েছে, যা যেকোনো যুগে একটি অপরাধমুক্ত ও ন্যায়ভিত্তিক আদালত পরিচালনার মূল চালিকাশক্তি।

২.১ ওহীর বিধানের বাধ্যবাধকতা ও মানুষের খেয়াল-খুশির বর্জন

ইসলামি বিচার ব্যবস্থার সর্বপ্রথম ও সর্বপ্রধান মূলনীতি হলো—আদালতের প্রতিটি ফয়সালা বা রায় অবশ্যই আল্লাহর অবতীর্ণ ওহী তথা শরিয়তের বিধান অনুযায়ী হতে হবে। মানব রচিত বিচার ব্যবস্থায় আইন প্রতিনিয়ত শাসক বা আইনপ্রণেতাদের ব্যক্তিগত ইচ্ছা, দলীয় এজেন্ডা কিংবা সমাজের সাময়িক খেয়াল-খুশির (Whims and Desires) ওপর ভিত্তি করে পরিবর্তিত হয়। কিন্তু ইসলামে বিচারকের নিজস্ব মতামত, পছন্দ-অপছন্দ, কিংবা সংখ্যাগরিষ্ঠের এমন কোনো ইচ্ছার অবকাশ নেই যা ওহীর স্পষ্ট বিধানকে লঙ্ঘন করে। ওহীর বিধান অনুযায়ী বিচার করা কেবল একটি আইনি দায়িত্বই নয়, বরং এটি ঈমানের অপরিহার্য অংশ। বিচারক নিজের বুদ্ধিমত্তা কেবল ওহীর বিধানকে সঠিকভাবে বোঝার এবং প্রায়োগিক ক্ষেত্রে তা বাস্তবায়নের জন্য ব্যবহার করবেন, ওহীর সমান্তরাল কোনো আইন তৈরির জন্য নয়।

- কুরআনের আয়াত ও অনুবাদ

খেয়াল-খুশির অনুসরণ বর্জন করে ওহীর বিধান অনুযায়ী বিচার করার চূড়ান্ত ও কঠোর নির্দেশ দিয়ে আল্লাহ তাআলা ইরশাদ করেন:

وَأَنِ احْكُمْ بَيْنَهُمْ بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ وَلَا تَتَّبِعْ أَهْوَاءَهُمْ وَاحْذَرْهُمْ أَنْ يَفْتِنُوكَ عَنْ بَعْضِ مَا أَنْزَلَ اللَّهُ إِلَيْكَ

অনুবাদ: "আর আপনি তাদের (জনগণের) মধ্যে আল্লাহ যা অবতীর্ণ করেছেন সেই অনুযায়ী বিচার-ফয়সালা করুন এবং তাদের খেয়াল-খুশির অনুসরণ করবেন না। আর তাদের ব্যাপারে সতর্ক থাকুন, পাছে তারা আল্লাহ আপনার প্রতি যে বিধান অবতীর্ণ

করেছেন, তার কোনো অংশ থেকে আপনাকে বিচ্যুত করে দেয়।" (সূরা আল-মায়েদাহ, আয়াত: ৪৯)

- হাদিসের মতন ও অনুবাদ

ওহীর আইন ও শরিয়তের মূলনীতির বাইরে গিয়ে নিজের মনগড়া বা খেয়াল-খুশিমতো কোনো রায় দিলে সেই বিচার বাতিল এবং তা ভয়াবহ অপরাধ বলে গণ্য, এ প্রসঙ্গে রাসূলুল্লাহ (সা.) ইরশাদ করেছেন:

مَنْ أَحْدَثَ فِي أَمْرِنَا هَذَا مَا لَيْسَ فِيهِ فَهُوَ رَدٌّ

অনুবাদ: "যে ব্যক্তি আমাদের এই দ্বীনের (বা শরিয়তের) মধ্যে এমন কোনো নতুন বিষয়ের বা নিয়মের উদ্ভাবন করল যা এর অন্তর্ভুক্ত নয়, তা সম্পূর্ণ প্রত্যাখ্যাত ও বাতিল।" (সহিহ বুখারি, হাদিস নং: ২৬৯৭; সহিহ মুসলিম, হাদিস নং: ১৭১৮)

- ফিকহি মাসয়ালা ও তাত্ত্বিক বিশ্লেষণ

চার মাজহাবের ফকিহগণ একমত যে, ওহীর অকাট্য বিধানকে অগ্রাহ্য করে নিজের খেয়াল-খুশি বা ধারণার ওপর ভিত্তি করে রায় দেওয়া বিচারকের জন্য কুফরি ও কবিরা গুনাহ। এর ওপর ভিত্তি করে ফিকহি কিতাবসমূহে সুনির্দিষ্ট আইনি নীতিমালা প্রণয়ন করা হয়েছে:

১. ওহীর পরিপন্থী রায়ের আইনি অকার্যকারিতা (نقض حكم القاضي):

যদি কোনো বিচারক অসাবধানতাবশত বা ইচ্ছাকৃতভাবে ওহীর স্পষ্ট দলিল (কোরআনের আয়াত বা সুন্নাতে মুতাওয়াতিরাহ) কিংবা ফকিহদের 'ইজমা' বা সর্বসম্মত সিদ্ধান্তের পরিপন্থী কোনো রায় প্রদান করেন, তবে ইসলামি শরিয়তের স্পষ্ট মাসয়ালা হলো—উক্ত রায় স্বয়ংক্রিয়ভাবে বাতিল (Void/Null and Void) হয়ে যাবে। উচ্চ আদালত বা অন্য যেকোনো বিচারক সেই ভুল রায়কে ভেঙে দেওয়ার (Overrule/Reversing the judgment) আইনি অধিকার ও বাধ্যবাধকতা রাখেন।

২. শাসকের অন্যায় আদেশের বাধ্যবাধকতা বর্জন (لا طاعة في معصية):

যদি দেশের খলিফা বা রাষ্ট্রপ্রধান বিচারককে এমন কোনো রায় দেওয়ার নির্দেশ দেন যা আল্লাহর আইনের পরিপন্থী, তবে বিচারক সেই নির্দেশ মানতে বাধ্য নন। ফিকহি

নীতি অনুযায়ী—"স্রষ্টার অবাধ্যতা করে কোনো সৃষ্টির আনুগত্য করা যাবে না।" এই অবস্থায় বিচারক চাকরি বা জীবন হারানোর ঝুঁকিতে থাকলেও ওহীর বিধানের ওপর অনড় থাকতে বাধ্য।

৩. খেয়াল-খুশির বর্জনে ইজতিহাদের সীমাবদ্ধতা:

যখন কোনো নতুন জটিল মামলায় সরাসরি কোরআন-সুন্নাহর নস (Text) পাওয়া যায় না, তখন বিচারক 'ইজতিহাদ' বা বিচারিক গবেষণা করতে পারেন। তবে এই ইজতিহাদ কোনোভাবেই খেয়াল-খুশির বহিঃপ্রকাশ নয়। ফকিহগণ বলেন, ইজতিহাদের জন্য শরিয়তের মূল মাকাসিদ (উদ্দেশ্য) এবং পূর্ববর্তী আইনি নজিরের (Precedents) আলোকেই কিয়াস করতে হবে। মনগড়া যুক্তি বা ব্যক্তিগত সুবিধার ওপর ভিত্তি করে কোনো রায় দেওয়া যাবে না।

- একাডেমিক রেফারেন্স (উৎস গ্রন্থসমূহ)

হানাফি ফিকহ: ইমাম ইবনে আবিদিন (রহ.), রদ্দুল মুহতার আলাদ... দুররিল মুখতার, কিতাবুল কাযা (مطلب في نقض حكم القاضي), খণ্ড: ৫, পৃষ্ঠা: ৪০৩-৪০৪; এবং ইমাম কাসানি (রহ.), বাদায়েউস সানায়ে, খণ্ড: ৭, পৃষ্ঠা: ৫।

মালেকি ফিকহ: ইমাম ইবনে ফারহুন (রহ.), তাবসিরাতুল হুক্কাম ফি উসুলিল আকযিয়াহ, খণ্ড: ১, পৃষ্ঠা: ৪৩-৪৪।

শাফেয়ি ফিকহ: খতিব শিরবিনি (রহ.), মুগনি আল-মুহতাজ ইলা মা'রিফাতি মা'আনি আলফাজিল মিনহাজ, কিতাবুল কাযা, খণ্ড: ৪, পৃষ্ঠা: ৩৮১-৩৮২ (দারুল কুতুবিল ইলমিয়াহ)।

হাম্বলি ফিকহ: ইমাম ইবনে কুদামা (রহ.), আল-মুগনি, কিতাবুল কাযা (فصل في القاضي يخطئ في حكمه), খণ্ড: ১১, পৃষ্ঠা: ৪১০-৪১১।

২.২ নির্দোষ প্রমাণের নীতি (অপরাধ প্রমাণিত হওয়ার আগে সবাই নির্দোষ)

আধুনিক ফৌজদারি আইনশাস্ত্রের একটি অন্যতম প্রধান এবং গর্বের মূলনীতি হলো—"অপরাধ প্রমাণিত হওয়ার আগে পর্যন্ত প্রত্যেক ব্যক্তিই নির্দোষ" (Presumption of Innocence)। মজার ব্যাপার হলো, আধুনিক পশ্চিমা বিশ্ব এই নীতি আবিষ্কার করার অন্তত এক হাজার বছর আগেই ইসলাম একে বিচার ব্যবস্থার একটি অবিচ্ছেদ্য এবং মৌলিক আইনি স্তম্ভ হিসেবে প্রতিষ্ঠা করেছে।

ইসলামি বিচার ব্যবস্থার মূল কথা হলো, মানুষের মৌলিক অবস্থা (اصل) হলো সে পবিত্র এবং অপরাধমুক্ত। কোনো ব্যক্তির বিরুদ্ধে অভিযোগ উঠলেই সে অপরাধী হয়ে যায় না। যতক্ষণ না পর্যন্ত বাদী পক্ষ আদালতে অকাট্য শরয়ি প্রমাণ (Evidence) উপস্থাপন করে সন্দেহাতীতভাবে অপরাধ প্রমাণ করতে পারছে, ততক্ষণ আদালতের দৃষ্টিতে অভিযুক্ত ব্যক্তি সম্পূর্ণ নির্দোষ এবং তার জান, মাল ও সম্মানের নিরাপত্তা অক্ষুণ্ণ থাকবে। অনুমানের ওপর ভিত্তি করে কাউকে সাজা দেওয়া ইসলামি ইনসাফের পরিপন্থী।

- কুরআনের আয়াত ও অনুবাদ

সংশয়, অনুমান বা অস্পষ্ট ধারণার ওপর ভিত্তি করে কোনো ব্যক্তির বিরুদ্ধে আইনি পদক্ষেপ নেওয়া বা তাকে অপরাধী সাব্যস্ত করার কঠোর নিন্দা জানিয়ে আল্লাহ তাআলা ইরশাদ করেন:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اجْتَنِبُوا كَثِيرًا مِنَ الظَّنِّ إِنَّ بَعْضَ الظَّنِّ إِثْمٌ

অনুবাদ: "হে মুমিনগণ! তোমরা বহুবিধ অনুমান বা ধারণা থেকে দূরে থাকো; কারণ কোনো কোনো অনুমান বা ধারণা তো স্পষ্ট গুনাহ।" (সূরা আল-হুজুরাত, আয়াত: ১২)

- হাদিসের মতন ও অনুবাদ

অভিযোগকারী বা বাদী পক্ষের অকাট্য প্রমাণ পেশ করার বাধ্যবাধকতা এবং অভিযুক্ত ব্যক্তির নির্দোষিতার আইনি সুরক্ষা নিশ্চিত করে রাসূলুল্লাহ (সা.) এক ঐতিহাসিক আইনি মূলনীতি ঘোষণা করেছেন:

،لَوْ يُعْطَى النَّاسُ بِدَعْوَاهُمْ لَادَّعَى رِجَالٌ دِمَاءَ رِجَالٍ وَأَمْوَالَهُمْ، وَلَكِنِ الْبَيِّنَةُ عَلَى الْمُدَّعِي وَالْيَمِينُ عَلَى مَنْ أَنْكَرَ

অনুবাদ: "যদি মানুষকে কেবল তাদের দাবি বা অভিযোগের ভিত্তিতেই (অধিকার বা রায়) দিয়ে দেওয়া হতো, তবে মানুষ অন্যের রক্ত (জীবন) ও ধন-সম্পদ দাবি করে বসত। কিন্তু নিয়ম হলো—প্রমাণ পেশ করার দায়িত্ব বাদীর (অভিযোগকারীর), আর শপথ করার দায়িত্ব হলো অস্বীকারকারীর (অভিযুক্তের)।" (সুনানে আল-বাইহাকি, হাদিস নং: ২১১২০; সহিহ বুখারি ও মুসলিমের মূল বক্তব্য এর অন্তর্ভুক্ত)

- ফিকহি মাসয়ালা ও তাত্ত্বিক বিশ্লেষণ

ইসলামি আইনশাস্ত্রে (উসুলুল ফিকহ) এই নীতিটি একটি বিশ্বজনীন আইনি মাক্সিম বা মূলনীতি (আল-কাওয়াইদুল ফিকহিয়্যাহ) হিসেবে প্রতিষ্ঠিত। ফকিহগণ এর ওপর ভিত্তি করে নিচের মাসয়ালাগুলো নির্ধারণ করেছেন:

১. মূল আইনি নীতি: 'আল-আসলু বারাআতুয যিম্মাহ' (الأصل براءة الذمة):

চার মাজহাবের ফকিহদের সর্বসম্মত আইনি নীতি হলো—"মানুষের মূল অবস্থা হলো দায়মুক্তি বা নির্দোষিতা।" এর অর্থ হলো, কোনো ব্যক্তি জন্মগতভাবে কোনো অপরাধ বা ঋণের দায় নিয়ে জন্মায় না। সুতরাং, কেউ যদি কারও বিরুদ্ধে কোনো অপরাধের অভিযোগ আনে, তবে সে মূলত শরিয়তের স্বাভাবিক নিয়মের পরিপন্থী দাবি করছে। আর যে নিয়মের পরিপন্থী দাবি করে, আইন অনুযায়ী প্রমাণের ভার (Burden of Proof) সম্পূর্ণ তার ওপরেই বর্তায়।

২. জোরপূর্বক জবানবন্দি বা স্বীকারোক্তির অকার্যকারিতা:

অভিযুক্ত ব্যক্তিকে নির্দোষ মনে করার কারণেই তাকে রিমান্ডে নিয়ে মারধর, মানসিক নির্যাতন বা জোরপূর্বক অপরাধের স্বীকারোক্তি (Coerced Confession) আদায় করা ইসলামি শরিয়তে সম্পূর্ণ হারাম এবং আদালতের দৃষ্টিতে এর কোনো আইনি মূল্য নেই। যদি কোনো আসামি বিচারকের সামনে এসে বলে যে, সে পুলিশ বা কোনো কর্তৃপক্ষের ভয়ে বা চাপে পড়ে আগে স্বীকারোক্তি দিয়েছিল, তবে পূর্বের সেই জবানবন্দি বাতিল হয়ে যাবে এবং তাকে নির্দোষ ধরা হবে।

৩. মানহানি ও ক্ষতিপূরণের অধিকার:

যেহেতু অপরাধ প্রমাণিত হওয়ার আগে আসামি নির্দোষ, তাই বিচার চলাকালীন বা তদন্তের স্বার্থে আটক থাকার সময় যদি প্রমাণিত হয় সে নির্দোষ ছিল, তবে তার সামাজিক সম্মানহানির বিচার করার অধিকার তার রয়েছে। জাহেলি যুগে বা আধুনিক অনেক নিয়মে মিডিয়া ট্রায়ালের মাধ্যমে শুরুতেই আসামিকে অপরাধী বানিয়ে দেওয়া হয়, যা ইসলামি ফিকহে কঠোরভাবে নিষিদ্ধ।

- একাডেমিক রেফারেন্স (উৎস গ্রন্থসমূহ)

হানাফি ফিকহ ও আইনি মূলনীতি: ইমাম ইবনু নুজাইম আল-হানাফি (রহ.), আল-আশবাহ ওয়ান নাযাইর (الأشباه والنظائر - قاعدة: الأصل براءة الذمة), পৃষ্ঠা: ৪৭; এবং ইমাম কাসানি (রহ.), বাদায়েউস সানায়ে, খণ্ড: ৬, পৃষ্ঠা: ২২৩।

মালেকি ফিকহ: ইমাম শিহাবুদ্দীন আল-কারাফি (রহ.), আল-ফুরূক (الفروق), খণ্ড: ৪, পৃষ্ঠা: ২৬৪।

শাফেয়ি ফিকহ: ইমাম জালালুদ্দীন আস-সুয়ূতি (রহ.), আল-আশবাহ ওয়ান নাযাইর ফি কাওয়াইদি ওয়া ফুরূই ফিকহিশ শাফেয়িয়্যাহ, পৃষ্ঠা: ৫২; এবং খতিব শিরবিনি, মুগনি আল-মুহতাজ, খণ্ড: ৪, পৃষ্ঠা: ৪৭৩।

হাম্বলি ফিকহ: ইমাম ইবনে রজব আল-হাম্বলি (রহ.), আল-কাওয়াইদ ফিল ফিকহিল হাম্বলি (القواعد في الفقه الحنبلي), পৃষ্ঠা: ৩৩৮; এবং ইমাম ইবনে কুদামা, আল-মুগনি, খণ্ড: ১০, পৃষ্ঠা: ১৬৮।

২.৩ সন্দেহ বা অস্পষ্টতার সুবিধা আসামিকে দেওয়া

ইসলামি ফৌজদারি বিচার ব্যবস্থার একটি বৈপ্লবিক ও মানবিক মূলনীতি হলো—কোনো অপরাধের অকাট্য প্রমাণের ক্ষেত্রে যদি সামান্যতম সন্দেহ, অস্পষ্টতা কিংবা সংশয় (Doubt) থেকে যায়, তবে তার চূড়ান্ত সুবিধা (Benefit) সরাসরি অভিযুক্ত ব্যক্তি বা আসামি পাবে। আধুনিক পশ্চিমা আইনবিদরা একে 'Benefit of Doubt' হিসেবে সংজ্ঞায়িত করার বহু শতাব্দী আগেই ইসলাম একে বিচারিক বাধ্যতামূলক নীতি হিসেবে রূপ দিয়েছে।

ইসলামি শরিয়তের স্পষ্ট সিদ্ধান্ত হলো, সন্দেহের ওপর ভিত্তি করে কাউকে শাস্তি দেওয়ার চেয়ে ভুলবশত কোনো অপরাধীকে ছেড়ে দেওয়া অনেক উত্তম ও নিরাপদ। বিশেষ করে 'হুদুদ' (কোরআন-সুন্নাহ নির্ধারিত শাস্তি) এবং 'কিসাস' (হত্যার বদলে সমপরিমাণ শাস্তি)-এর মতো কঠোর দণ্ডবিধির ক্ষেত্রে এই নীতি কঠোরভাবে প্রয়োগ করা হয়। যদি সাক্ষীদের সাক্ষ্যে বা পারিপার্শ্বিক প্রমাণের মধ্যে কোনো বৈপরীত্য বা অস্পষ্টতা দেখা যায়, তবে আদালত আসামির ওপর থেকে মূল শাস্তি মওকুফ করতে বাধ্য।

- কুরআনের আয়াত ও অনুবাদ

অনুমান, অস্পষ্টতা এবং সংশয়পূর্ণ প্রমাণের ওপর ভিত্তি করে মানুষের জীবন ও স্বাধীনতার ওপর হুট করে কোনো চূড়ান্ত রায় বা দণ্ডারোপ না করার নির্দেশ দিয়ে আল্লাহ তাআলা ইরশাদ করেন:

وَمَا يَتَّبِعُ أَكْثَرُهُمْ إِلَّا ظَنًّا ۚ إِنَّ الظَّنَّ لَا يُغْنِي مِنَ الْحَقِّ شَيْئًا ۚ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ بِمَا يَفْعَلُونَ

অনুবাদ: "আর তাদের অধিকাংশ লোক কেবল অনুমানেরই অনুসরণ করে চলে; অথচ সত্যের বিপরীতে অনুমান কোনো কাজেই আসে না। তারা যা কিছু করে, নিশ্চয়ই আল্লাহ সে বিষয়ে সম্যক পরিজ্ঞাত।" (সূরা ইউনুস, আয়াত: ৩৬)

- হাদিসের মতন ও অনুবাদ

সন্দেহ বা অস্পষ্টতার কারণে হদ বা শাস্তি মওকুফ করার বিষয়ে রাসূলুল্লাহ (সা.) এক ঐতিহাসিক ও যুগান্তকারী বিচারিক মূলনীতি ঘোষণা করে ইরশাদ করেছেন:

ادْرَءُوا الْحُدُودَ عَنِ الْمُسْلِمِينَ مَا اسْتَطَعْتُمْ، فَإِنْ كَانَ لَهُ مَخْرَجٌ فَخَلُّوا سَبِيلَهُ، فَإِنَّ الْإِمَامَ أَنْ يُخْطِئَ فِي الْعَفْوِ خَيْرٌ مِنْ أَنْ يُخْطِئَ فِي الْعُقُوبَةِ

অনুবাদ: "তোমরা সাধ্যমতো মুসলমানদের ওপর থেকে হদ (নির্ধারিত শাস্তি) দূর বা মওকুফ করো। যদি আসামির খালাস পাওয়ার কোনো পথ বা সুযোগ থাকে, তবে তার পথ ছেড়ে দাও (তাকে মুক্তি দাও)। কেননা, বিচারকের শাস্তি দেওয়ার ক্ষেত্রে ভুল করার চেয়ে ক্ষমা করার ক্ষেত্রে ভুল করা অনেক শ্রেয় ও উত্তম।" (সুনানে তিরমিজি, হাদিস নং: ১৪২৪; মুস্তাদরাকে আল-হাকিম, হাদিস নং: ৮১৬৩)

- ফিকহি মাসয়ালা ও তাত্ত্বিক বিশ্লেষণ

ইসলামি আইনশাস্ত্রে (উসুলুল ফিকহ) এই নীতিটি একটি প্রধান ফিকহি কায়দা বা লিগ্যাল মাক্সিম হিসেবে সুপ্রতিষ্ঠিত। চার মাজহাবের ইমাম ও ফকিহগণ এর আলোকে নিচের মাসয়ালা ও আইনি বাধ্যবাধকতাগুলো সুনির্দিষ্ট করেছেন:

১. মূল আইনি নীতি: 'আল-হুদুদু তুদরাউ বিশ-শুবুহাত' (الحدود تدرأ بالشبهات):
ফকিহদের সর্বসম্মত আইনি সিদ্ধান্ত হলো—"সামান্যতম সংশয় বা অস্পষ্টতার কারণে নির্ধারিত ও কঠোর হুদুদ শাস্তিগুলো বাতিল হয়ে যায়।" এই শুবহা বা সন্দেহ প্রধানত তিন প্রকার হতে পারে:

ক. শুবহাতুল ফায়েল (কার্যে সন্দেহ): আসামি হয়তো আইনটি ঠিকমতো বুঝতে পারেনি বা ভুলবশত কাজটি করে ফেলেছে।
খ. শুবহাতুল মাহাল (অধিকারে সন্দেহ): যে মাল বা বিষয়ের ওপর অপরাধ সংঘটিত হয়েছে, তাতে আসামিরও কোনো আংশিক মালিকানা বা অধিকারের অস্পষ্টতা থাকা।
গ. শুবহাতুল আদিল্লাহ (প্রমাণে সন্দেহ): সাক্ষীদের সাক্ষ্যের মধ্যে গরমিল থাকা বা সাক্ষ্য দেওয়ার যোগ্যতা নিয়ে প্রশ্ন ওঠা।

২. সাক্ষীদের বয়ানে অস্পষ্টতা ও হদ মওকুফ:
চুরি (সারিকাহ) বা ব্যভিচারের (যিনা) মতো মামলার শুনানির সময় যদি সাক্ষীদের দেওয়া বর্ণনায় সময়, স্থান বা অপরাধের ধরণে সামান্যতম অমিল বা সংশয় দেখা দেয়, তবে বিচারক (কাযি) আসামিকে হদ বা মূল শাস্তি দিতে পারবেন না। এই অস্পষ্টতার সম্পূর্ণ সুবিধা আসামি পাবে এবং সে 'হদ' থেকে খালাস পাবে।

৩. 'তা'যির' বা বিকল্প শাস্তি প্রয়োগের সুযোগ:
ফকিহগণ একটি সূক্ষ্ম আইনি মাসয়ালা স্পষ্ট করেছেন যে, সন্দেহের সুবিধা পেয়ে আসামি যদি কোরআন-সুন্নাহ নির্ধারিত মূল কঠিন শাস্তি (হদ) থেকে বেঁচেও যায়, তার অর্থ এই নয় যে সে সমাজ বা রাষ্ট্রের চোখে পুরোপুরি নিষ্পাপ হয়ে গেছে। বিচারক যদি পারিপার্শ্বিক প্রমাণের ভিত্তিতে নিশ্চিত হন যে অপরাধ ঘটেছে, কিন্তু অকাট্য আইনি শর্ত পূরণ না হওয়ায় হদ দেওয়া যাচ্ছে না, তবে সমাজ সংস্কার ও অপরাধ প্রতিরোধের

স্বার্থে বিচারক আসামিকে 'তা'যির' বা রাষ্ট্রীয় বিবেচনামূলক বিকল্প হালকা শাস্তি (যেমন: জরিমানা বা কারাদণ্ড) দিতে পারেন।

- একাডেমিক রেফারেন্স (উৎস গ্রন্থসমূহ)

হানাফি ফিকহ ও আইনি মূলনীতি: ইমাম আলাউদ্দীন আল-কাসানি (রহ.), বাদায়েউস সানায়ে ফি তারতিবিশ শারায়ে, কিতাবুল হুদুদ (فصل في بيان ما تدرأ به الحدود), খণ্ড: ৭, পৃষ্ঠা: ৫৩-৫৪; এবং ইমাম ইবনু নুজাইম, আল-আশবাহ ওয়ান নাযাইর, পৃষ্ঠা: ১২২।
মালেকি ফিকহ: ইমাম ইবনে রুশদ (আল-হাফিদ), বিদায়াতুল মুজতাহিদ ওয়া নিহায়াতুল মুকতাসিদ, কিতাবুল হুদুদ, খণ্ড: ৪, পৃষ্ঠা: ২৬৮-২৭০।
শাফেয়ি ফিকহ: ইমাম জালালুদ্দীন আস-সুয়ূতি (রহ.), আল-আশবাহ ওয়ান নাযাইর (قاعدة: الحدود تسقط بالشبهات), পৃষ্ঠা: ১২১; এবং খতিব শিরবিনি, মুগনি আল-মুহতাজ, খণ্ড: ৫, পৃষ্ঠা: ৫২১-৫২২।
হাম্বলি ফিকহ: ইমাম ইবনে কুদামা, আল-মুগনি, কিতাবুল হুদুদ (فصل درء الحدود بالشبهات), খণ্ড: ৯, পৃষ্ঠা: ৫২-৫৩; এবং ইমাম ইবনে কায়্যিম আল-জাওযিয়্যাহ, ইলামুল মুওয়াক্কিয়িন (إعلام الموقعين), খণ্ড: ১, পৃষ্ঠা: ৩৩৮।

২.৪ আত্মপক্ষ সমর্থনের অধিকার ও সাফাই সাক্ষী হাজির করার সুযোগ

ইসলামি বিচার ব্যবস্থার অন্যতম এক গৌরবময় এবং ইনসাফভিত্তিক স্তম্ভ হলো আসামির "আত্মপক্ষ সমর্থনের অধিকার" (Right to Self-Defense) এবং নিজের নির্দোষিতা প্রমাণের জন্য "সাফাই সাক্ষী" (Witness for the Defense) হাজির করার পূর্ণ সুযোগ। ইসলামি আইনশাস্ত্রে কোনো ব্যক্তিকে কেবল একপেশে অভিযোগের ভিত্তিতে বা তার বক্তব্য না শুনেই সাজা দেওয়া সম্পূর্ণ অবৈধ।

শরিয়তের আদালত প্রত্যেক অভিযুক্ত ব্যক্তিকে তার বিরুদ্ধে আনীত অভিযোগের প্রতিটি পয়েন্ট খণ্ডন করার, নিজের সপক্ষে যুক্তি উপস্থাপন করার এবং যদি কোনো সাক্ষী বা প্রমাণ থাকে তা আদালতের সামনে পেশ করার সমান অধিকার দেয়। এমনকি

বাদী পক্ষ যদি কোনো সাক্ষী হাজির করে, তবে আসামির অধিকার রয়েছে সেই সাক্ষীদের সততা ও নির্ভরযোগ্যতা নিয়ে প্রশ্ন তোলার এবং তাদের জেরা করার। আত্মপক্ষ সমর্থনের এই অকাট্য অধিকার নিশ্চিত করার মাধ্যমেই কেবল প্রকৃত ইনসাফ প্রতিষ্ঠা সম্ভব, যা ইসলাম আজ থেকে চৌদ্দশত বছর আগেই বাধ্যতামূলক করেছে।

- কুরআনের আয়াত ও অনুবাদ

কোনো বিষয়ে নিশ্চিত অনুসন্ধান না করে এবং উভয় পক্ষের সত্যতা যাচাই না করে হুট করে কোনো সিদ্ধান্ত বা রায় প্রদান না করার নির্দেশ দিয়ে আল্লাহ তাআলা ইরশাদ করেন:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنْ جَاءَكُمْ فَاسِقٌ بِنَبَأٍ فَتَبَيَّنُوا أَنْ تُصِيبُوا قَوْمًا بِجَهَالَةٍ فَتُصْبِحُوا عَلَىٰ مَا فَعَلْتُمْ نَادِمِينَ

অনুবাদ: "হে মুমিনগণ! যদি কোনো পাপাচারী ব্যক্তি তোমাদের কাছে কোনো বার্তা বা সংবাদ নিয়ে আসে, তবে তোমরা তা ভালোভাবে যাচাই-বাছাই ও অনুসন্ধান করো; পাছে তোমরা অজ্ঞতাবশত কোনো সম্প্রদায়ের ক্ষতি করে বসো এবং পরে তোমাদের কৃতকর্মের জন্য তোমাদের অনুতপ্ত হতে হয়।" (সূরা আল-হুজুরাত, আয়াত: ৬)

- হাদিসের মতন ও অনুবাদ

আদালতে বিচারকের সামনে উভয় পক্ষের বক্তব্য সমানভাবে শোনার এবং আসামিকে আত্মপক্ষ সমর্থনের পূর্ণ সুযোগ দেওয়ার আইনি বাধ্যবাধকতা নিশ্চিত করে রাসূলুল্লাহ (সা.) হযরত আলী (রা.)-কে বিচারক হিসেবে পাঠানোর সময় এই ঐতিহাসিক নির্দেশনা দিয়েছিলেন:

يَا عَلِيُّ، إِذَا تَقَاضَى إِلَيْكَ رَجُلَانِ، فَلَا تَقْضِ لِلْأَوَّلِ حَتَّى تَسْمَعَ كَلَامَ الْآخَرِ، فَإِنَّكَ عَسَى أَنْ تَدْرِيَ كَيْفَ تَقْضِي

অনুবাদ: "হে আলী! যখন তোমার কাছে দুই ব্যক্তি কোনো মামলার বিচারের জন্য আসবে, তখন প্রথম পক্ষের বক্তব্য শুনেই দ্বিতীয় পক্ষের বক্তব্য না শোনা পর্যন্ত কোনো ফয়সালা বা রায় দেবে না। কেননা, তুমি যদি উভয় পক্ষের কথা শোনো, তবে তোমার সামনে পরিষ্কার হয়ে যাবে যে কীভাবে বিচার বা ফয়সালা করতে হবে।" (সুনানে তিরমিজি, হাদিস নং: ১৩৩১; সুনানে আবু দাউদ, হাদিস নং: ৩৫৮২; মুসনাদে আহমাদ, হাদিস নং: ১২১৩)

- ফিকহি মাসয়ালা ও তাত্ত্বিক বিশ্লেষণ

ইসলামি ফিকহে বিচারিক কার্যবিধির (Adab al-Qadi) আওতায় আত্মপক্ষ সমর্থন এবং সাফাই সাক্ষীর বিষয়ে অত্যন্ত সূক্ষ্ম ও বাস্তবমুখী আইনি মাসয়ালা প্রণয়ন করা হয়েছে:

১. অনুপস্থিত ব্যক্তির ওপর রায়ের নিষেধাজ্ঞা (القضاء على الغائب):

হানাফি মাজহাবের অন্যতম প্রধান এবং দৃঢ় আইনি মাসয়ালা হলো—কোনো আসামি আদালতে উপস্থিত না থাকলে এবং তাকে আত্মপক্ষ সমর্থনের সুযোগ না দিয়ে তার অনুপস্থিতিতে (Ex-parte Judgment) কোনো চূড়ান্ত রায় বা সাজা দেওয়া যাবে না। তবে আসামি যদি ইচ্ছাকৃতভাবে আদালতের সমন অমান্য করে পলাতক থাকে, তবেই কেবল তার জন্য একজন সরকারি প্রতিনিধি বা উকিল (নায়েবুল গায়িব) নিযুক্ত করে বিচার চালানো যাবে, কিন্তু তার আগে নয়।

২. সাফাই সাক্ষী গ্রহণের বাধ্যবাধকতা (قبول بينة الدفع):

বাদী পক্ষ যদি আসামির বিরুদ্ধে কোনো দাবি বা চুরির অভিযোগ আনে, আর আসামি যদি আদালতের সামনে দাবি করে যে, "বাদী যে সময়ের কথা বলছে, সে সময়ে আমি মক্কায় ছিলাম না বরং মদিনায় ছিলাম এবং আমার কাছে এর সাফাই সাক্ষী আছে"—তবে ফকিহদের সর্বসম্মত সিদ্ধান্ত অনুযায়ী বিচারক বাদীর মামলার রায় স্থগিত রেখে আসামির সাফাই সাক্ষী ও প্রমাণ শুনতে আইনিভাবে বাধ্য। আসামির এই প্রমাণকে ফিকহের পরিভাষায় 'বাইয়্যিনাতুদ দাফ' (بينة الدفع) বা খণ্ডনকারী প্রমাণ বলা হয়।

৩. বাদীর সাক্ষীকে জেরা ও জাস্টিফাই করার অধিকার (الطعن في الشهود):

বাদী পক্ষ যে সমস্ত সাক্ষী আদালতে হাজির করবে, আসামি তাদের আইনি গ্রহণযোগ্যতা চ্যালেঞ্জ করতে পারে। ফিকহের পরিভাষায় একে বলা হয় 'তাযকিয়াতুশ শুহুদ' বা সাক্ষীদের চরিত্র বিশ্লেষণ। আসামি যদি প্রমাণ করতে পারে যে বাদীর সাক্ষী মিথ্যাবাদী, ফাসেক কিংবা এই মামলায় তার নিজস্ব কোনো স্বার্থ বা শত্রুতা জড়িয়ে আছে, তবে বিচারক সেই সাক্ষ্য বাতিল করে দিতে বাধ্য।

- একাডেমিক রেফারেন্স (উৎস গ্রন্থসমূহ)

হানাফি ফিকহ: ইমাম আলাউদ্দীন আল-কাসানি (রহ.), বাদায়েউস সানায়ে ফি তারতিবিশ শারায়ে, কিতাব আদাবিল কাযি (فصل في بيان حكم القضاء على الغائب), খণ্ড: ৭, পৃষ্ঠা: ১৫-১৭; এবং ইমাম ইবনে আবিদিন (রহ.), রদ্দুল মুহতার আলাদ দুররিল মুখতার, কিতাবুল কাযা, খণ্ড: ৫, পৃষ্ঠা: ৪১২-৪১৩।

মালেকি ফিকহ: ইমাম ইবনে ফারহুন (রহ.), তাবসিরাতুল হুক্কাম ফি উসুলিল আকযিয়াহ, খণ্ড: ১, পৃষ্ঠা: ৮৮-৯০।

শাফেয়ি ফিকহ: খতিব শিরবিনি (রহ.), মুগনি আল-মুহতাজ ইলা মা'রিফাতি মা'আনি আলফাজিল মিনহাজ, কিতাবুল কাযা (فصل في القضاء على الغائب), খণ্ড: ৪, পৃষ্ঠা: ৪০৪-৪০৫ (دار الكتب العلمية)।

হাম্বলি ফিকহ: ইমাম ইবনে কুদামা (রহ.), আল-মুগনি, কিতাবুল কাযা (فصل لا يحكم على غائب حتى تكتب البينة), খণ্ড: ১১, পৃষ্ঠা: ৪২৭-৪২৯।

২.৫ পক্ষপাতহীন ও একপেশে বিচার বর্জন

ইসলামি বিচার ব্যবস্থার মূল প্রাণ হলো নিরপেক্ষতা। কোনো বিচারক বা আদালতের জন্য কোনো একটি পক্ষের প্রতি আংশিক বা পূর্ণ পক্ষপাতিত্ব করা এবং অপর পক্ষকে অবহেলা করে একপেশে বিচার (Biased or One-sided Judgment) করা শরিয়তে সম্পূর্ণ হারাম বা নিষিদ্ধ। ইসলামি আইনশাস্ত্রে বিচারককে একটি সুনির্দিষ্ট কাঠামোর মধ্যে বেঁধে দেওয়া হয়েছে, যাতে তাঁর ব্যক্তিগত আবেগ, সম্পর্ক, আত্মীয়তা কিংবা রাজনৈতিক বা সামাজিক চাপ বিচারে বিন্দুমাত্র প্রভাব ফেলতে না পারে।

আদালতের এজলাসে বিচারকের দৃষ্টি, বসার ভঙ্গি, বাচনভঙ্গি এবং মানসিকতা এমন হতে হবে যা উভয় পক্ষের কাছে শতভাগ নিরপেক্ষ মনে হয়। কোনো প্রভাবশালী বা ধনী ব্যক্তির সপক্ষে বা কোনো দুর্বল ও দরিদ্র ব্যক্তির বিপক্ষে আগে থেকেই মনস্তাত্ত্বিক অবস্থান নেওয়া ইসলামি ইনসাফের পরিপন্থী। পক্ষপাতহীনতার এই কঠোর নীতিই মূলত ইসলামি আদালতকে সব ধরনের দুর্নীতি ও জুলুম থেকে মুক্ত রাখে।

- কুরআনের আয়াত ও অনুবাদ

ব্যক্তিগত সম্পর্ক বা আত্মীয়তার ঊর্ধ্বে উঠে সম্পূর্ণ পক্ষপাতহীনভাবে সত্য ও ইনসাফের ওপর অবিচল থাকার নির্দেশ দিয়ে আল্লাহ তাআলা ইরশাদ করেন:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُونُوا قَوَّامِينَ بِالْقِسْطِ شُهَدَاءَ لِلَّهِ وَلَوْ عَلَىٰ أَنْفُسِكُمْ أَوِ الْوَالِدَيْنِ وَالْأَقْرَبِينَ ۚ إِنْ يَكُنْ غَنِيًّا أَوْ فَقِيرًا فَاللَّهُ أَوْلَىٰ بِهِمَا ۖ فَلَا تَتَّبِعُوا الْهَوَىٰ أَنْ تَعْدِلُوا

অনুবাদ: "হে মুমিনগণ! তোমরা ইনসাফের ওপর দৃঢ়প্রতিষ্ঠিত থাকো এবং আল্লাহর ওয়াস্তে ন্যায়সঙ্গত সাক্ষ্য দাও, তা যদি তোমাদের নিজেদের কিংবা পিতা-মাতা ও আত্মীয়-স্বজনদের বিরুদ্ধেও যায় তবুও। আর সে (যার বিরুদ্ধে সাক্ষ্য দেওয়া হচ্ছে) ধনী হোক বা দরিদ্র হোক, আল্লাহ উভয়েরই তোমাদের চেয়ে বেশি হিতাকাঙ্ক্ষী। অতএব, তোমরা ইনসাফ করতে গিয়ে নিজেদের খেয়াল-খুশির অনুসরণ করো না।" (সূরা আন-নিসা, আয়াত: ১৩৫)

- হাদিসের মতন ও অনুবাদ

আদালতের এজলাসে বাদী ও বিবাদীর প্রতি সমান আচরণ করা এবং কোনো ধরনের একপেশে বা পক্ষপাতমূলক আচরণ না করার নির্দেশ দিয়ে রাসূলুল্লাহ (সা.) ইরশাদ করেছেন:

مَنِ ابْتُلِيَ بِالْقَضَاءِ بَيْنَ الْمُسْلِمِينَ فَلْيَعْدِلْ بَيْنَهُمْ فِي لَفْظِهِ، وَإِشَارَتِهِ، وَمَقْعَدِهِ، وَمَجْلِسِهِ

অনুবাদ: "যাকে মুসলমানদের মধ্যে বিচারকার্যের দায়িত্ব দিয়ে পরীক্ষায় ফেলা হয়েছে, সে যেন তাদের মাঝে নিজের কথায়, ইশারায়, বসার স্থানে এবং মজলিসে পূর্ণ সমতা ও ইনসাফ বজায় রাখে (কারও প্রতি পক্ষপাতিত্ব না করে)।" (সুনানে আদ-দারা কুতনি, হাদিস নং: ৪৪০৮; সুনানে আল-বাইহাকি, হাদিস নং: ২০৩২৫)

- ফিকহি মাসয়ালা ও তাত্ত্বিক বিশ্লেষণ

চার মাজহাবের ফকিহগণ আদালত কক্ষে বিচারকের আচার-আচরণ এবং পক্ষপাতহীনতা নিশ্চিত করার জন্য অত্যন্ত সুনির্দিষ্ট ও সংবেদনশীল আইনি মাসয়ালা প্রণয়ন করেছেন:

১. আত্মীয়-স্বজন ও শত্রুর মামলায় বিচারিক এখতিয়ার (حكم قضائي لأصوله وفروعه وأعدائه):

চার মাজহাবের ফকিহদের সর্বসম্মত সিদ্ধান্ত অনুযায়ী, কোনো বিচারক তাঁর নিজের পিতা-মাতা, দাদা-দাদী (ঊর্ধ্বতন বংশীয়) কিংবা নিজের সন্তান ও নাতি-নাতনিদের (অধস্তন বংশীয়) অনুকূলে কোনো মামলার রায় দিতে পারবেন না। কারণ, এখানে রক্তের সম্পর্কের কারণে পক্ষপাতের প্রবল আশঙ্কা থাকে। একইভাবে, যার সাথে বিচারকের স্পষ্ট ব্যক্তিগত চরম শত্রুতা বা আদাওয়াত রয়েছে, তার বিরুদ্ধেও বিচারক কোনো রায় দিতে পারবেন না। এই ধরনের মামলা আসলে বিচারক নিজেকে প্রত্যাহার করে অন্য আদালতে মামলাটি স্থানান্তর করতে বাধ্য।

২. এজলাসে একপেশে আচরণের নিষেধাজ্ঞা (المنع من التخصيص):

ফিকহি কায়দা অনুযায়ী, মামলার শুনানির সময় বিচারক কোনো এক পক্ষকে ইশারা-ইঙ্গিতে কোনো প্রকার আইনি সাহায্য করতে পারবেন না (যেমন: বিবাদীকে কসম খাওয়ার সঠিক উপায় শিখিয়ে দেওয়া বা বাদীকে কীভাবে দাবি পেশ করতে হবে তা বলে দেওয়া)। বিচারক কোনো এক পক্ষের কানাকানি বা গোপন কথা শুনতে পারবেন না এবং এক পক্ষ আদালতে উপস্থিত না থাকলে অপর পক্ষের সাথে একাকী কোনো আলাপচারিতা করতে পারবেন না।

৩. একপেশে সাক্ষ্য ও একতরফা রায় বর্জন:

বাদীর দাবি শোনার পর বিবাদীকে সমন পাঠিয়ে আদালতে হাজির করা বিচারকের আইনি দায়িত্ব। বিবাদীকে নিজের বক্তব্য ও প্রমাণ পেশ করার সুযোগ না দিয়ে কেবল বাদীর একপেশে কান কথা বা একতরফা প্রমাণের ওপর ভিত্তি করে তড়িঘড়ি করে রায় দেওয়া যাবে না। তবে বিবাদী সমন পাওয়ার পরও যদি ইচ্ছাকৃতভাবে আত্মগোপন করে বা অবহেলা করে আদালতে না আসে, কেবল তখনই শরিয়ত নির্ধারিত বিশেষ কার্যবিধি অনুযায়ী বিচার এগোবে।

- একাডেমিক রেফারেন্স (উৎস গ্রন্থসমূহ)

হানাফি ফিকহ: ইমাম আলাউদ্দীন আল-কাসানি (রহ.), বাদায়েউস সানায়ে ফি তারতিবিশ শারায়ে, কিতাব আদাবিল কাযি (فصل في بيان ما ينبغي للقاضي أن يفعله

(في مجلس القضاء), খণ্ড: ৭, পৃষ্ঠা: ৯-১১; এবং ইমাম ইবনে আবিদিন (রহ.), রদ্দুল মুহতার, খণ্ড: ৫, পৃষ্ঠা: ৩৮৪।
মালেকি ফিকহ: ইমাম ইবনে ফারহুন (রহ.), তাবসিরাতুল হুক্কাম ফি উসুলিল আকযিয়াহ, খণ্ড: ১, পৃষ্ঠা: ৩৫-৩৬।
শাফেয়ি ফিকহ: খতিব শিরবিনি (রহ.), মুগনি আল-মুহতাজ ইলা মা'রিফাতি মা'আনি আলফাজিল মিনহাজ, কিতাবুল কাযা, খণ্ড: ৪, পৃষ্ঠা: ৩৮৬-৩৮৮ (দারুল কুতুবিল ইলমিয়াহ)।
হাম্বলি ফিকহ: ইমাম ইবনে কুদামা (রহ.), আল-মুগনি, কিতাবুল কাযা (فصل لا يجوز للقاضي أن يحكم لمن لا تقبل شهادته له), খণ্ড: ১১, পৃষ্ঠা: ৪১৫-৪১৬।

২.৬ ব্যক্তিগত রাগ, ক্ষোভ ও শারীরিক অস্থিরতার অবস্থায় বিচার করা নিষেধ

বিচারকার্য একটি অত্যন্ত সংবেদনশীল মনস্তাত্ত্বিক প্রক্রিয়া, যার জন্য বিচারকের মানসিক স্থিরতা, গভীর মনোযোগ এবং নিরপেক্ষ চিন্তা অপরিহার্য। মানুষের মন ও শরীর ওতপ্রোতভাবে জড়িত। কোনো ব্যক্তি যখন প্রচণ্ড রাগান্বিত, অত্যন্ত ক্ষুব্ধ কিংবা শারীরিক ও মানসিক অস্থিরতার (যেমন: তীব্র ক্ষুধা, পিপাসা, ক্লান্তি বা অসুস্থতা) মধ্যে থাকেন, তখন তাঁর স্বাভাবিক চিন্তাশক্তি ও বিচারবুদ্ধি লোপ পাওয়ার আশঙ্কা থাকে।

ইসলামি বিচার ব্যবস্থার একটি অনন্য মনস্তাত্ত্বিক ও আইনি মূলনীতি হলো—এমন প্রতিকূল পরিস্থিতিতে আদালতের এজলাসে বসে কোনো মামলার শুনানি করা বা রায় প্রদান করা বিচারকের জন্য কঠোরভাবে নিষিদ্ধ। ইসলাম চায় না যে বিচারকের সাময়িক শারীরিক কষ্ট বা ব্যক্তিগত ক্ষোভের মাশুল কোনো নিরপরাধ আসামিকে দিতে হোক। এই নিষেধাজ্ঞা কেবল ইসলামি আদালতের উচ্চ নৈতিক মানদণ্ডকেই প্রকাশ করে না, বরং বিচার প্রক্রিয়ার নিখুঁত ও নির্ভুল ইনসাফ নিশ্চিত করে।

- কুরআনের আয়াত ও অনুবাদ

ব্যক্তিগত ক্ষোভ, রাগ বা মানসিক উত্তেজনার কারণে যেন ইনসাফের পথ থেকে মানুষ বিচ্যুত না হয় এবং সর্বদা যেন ভারসাম্য বজায় রাখা হয়, সে বিষয়ে আল্লাহ তাআলা ইরশাদ করেন:

وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَآنُ قَوْمٍ عَلَىٰ أَلَّا تَعْدِلُوا ۚ اعْدِلُوا هُوَ أَقْرَبُ لِلتَّقْوَىٰ ۖ وَاتَّقُوا اللَّهَ ۚ إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ

অনুবাদ: "এবং কোনো সম্প্রদায়ের প্রতি শত্রুতা ও ক্ষোভ যেন তোমাদের এমনভাবে প্ররোচিত না করে যে, তোমরা ইনসাফ করবে না। তোমরা ইনসাফ করো, এটা তাকওয়ার সবচেয়ে নিকটবর্তী। আর আল্লাহকে ভয় করো; তোমরা যা করো, নিশ্চয়ই আল্লাহ সে বিষয়ে সম্যক অবহিত।" (সূরা আল-মায়েদাহ, আয়াত: ৮)

- হাদিসের মতন ও অনুবাদ

ক্রোধ বা রাগের অবস্থায় ফয়সালা করার স্পষ্ট নিষেধাজ্ঞা জারি করে এবং বিচারকের মনস্তাত্ত্বিক অবস্থার আইনি গুরুত্ব নির্ধারণ করে রাসূলুল্লাহ (সা.) ইরশাদ করেছেন:

لَا يَقْضِيَنَّ حَكَمٌ بَيْنَ اثْنَيْنِ وَهُوَ غَضْبَانُ

অনুবাদ: "কোনো বিচারক যেন রাগান্বিত অবস্থায় দুই ব্যক্তির মধ্যে কোনো ফয়সালা বা বিচার না করে।" (সহিহ বুখারি, হাদিস নং: ৭১৫৮; সহিহ মুসলিম, হাদিস নং: ১৭১৭)

- ফিকহি মাসয়ালা ও তাত্ত্বিক বিশ্লেষণ

চার মাজহাবের ফকিহগণ এই হাদিসের ইল্লত বা আইনি কারণ (Ratio Legis) বিশ্লেষণ করে বিচারকের মানসিক ও শারীরিক অবস্থার ওপর ভিত্তি করে বেশ কিছু বাধ্যতামূলক মাসয়ালা প্রণয়ন করেছেন:

১. রাগের মাথায় রায়ের শরয়ি বিধান (حكم القضاء في حال الغضب):

ফকিহদের সর্বসম্মত সিদ্ধান্ত অনুযায়ী, তীব্র রাগের অবস্থায় বিচার করা 'মাকরূহে তাহরিমি' (হারামসম মাকরূহ)। তবে ফিকহের একটি সূক্ষ্ম মাসয়ালা হলো—যদি কোনো বিচারক এই নিষেধাজ্ঞা অমান্য করে রাগের মাথায় কোনো রায় দিয়েই ফেলেন এবং সেই রায়টি যদি ওহী ও শরিয়তের স্পষ্ট আইনের সাথে সম্পূর্ণ মিলে যায়, তবে রায়টি বাতিল (Void) হবে না, বরং তা কার্যকর হবে; কিন্তু বিচারক নিষিদ্ধ সময়ে বিচার করার কারণে গুনাহগার হবেন।

২. রাগ ছাড়াও অন্যান্য শারীরিক ও মানসিক অস্থিরতার কিয়াস (ملحقات الغضب):

ইমামগণ বলেন, হাদিসে কেবল 'রাগ' (গদব)-এর কথা উল্লেখ থাকলেও সমপ্রকৃতির অন্যান্য সমস্ত মানসিক ও শারীরিক অস্থিরতাও এই আইনের অন্তর্ভুক্ত হবে। ফলে নিচের অবস্থাগুলোতেও এজলাসে বসে বিচার করা মাকরূহে তাহরিমি:

ক. তীব্র ক্ষুধা ও পিপাসা (الجوع والعطش الشديد): যা বিচারকের মনকে আদালতের যুক্তিতর্ক থেকে বিচ্যুত করে।

খ. তীব্র ক্লান্তি ও নিদ্রাহীনতা (السهر والتعب المفرط): যা মনোযোগে ব্যাঘাত ঘটায়।

গ. শারীরিক অসুস্থতা ও ব্যথা (المرض المؤلم): তীব্র মাথা ব্যথা, জ্বর বা শারীরিক কোনো যন্ত্রণার সময়।

ঘ. চরম আনন্দ বা শোক (الفرح الشديد والحزن الداهم): পারিবারিক কোনো বড় বিপর্যয় বা অতিরিক্ত খুশির খবর যা মানুষের স্বাভাবিক চিন্তার ভারসাম্যকে সাময়িকভাবে নাড়িয়ে দেয়।

৩. এজলাস মুলতবি করার আইনি বাধ্যবাধকতা:

বিচার চলাকালীন যদি বিচারক নিজের ভেতর ওপরের যেকোনো একটি অবস্থার উদয় লক্ষ্য করেন, তবে শরিয়তের আইনি কার্যবিধি অনুযায়ী তিনি তৎক্ষণাৎ আদালতের এজলাস মুলতবি (Adjourn) করতে বাধ্য। নিজেকে পুরোপুরি স্বাভাবিক, শান্ত ও সুস্থ করার পর পুনরায় এজলাসে বসবেন।

- একাডেমিক রেফারেন্স (উৎস গ্রন্থসমূহ)

হানাফি ফিকহ: ইমাম আলাউদ্দীন আল-কাসানি (রহ.), বাদায়েউস সানায়ে ফি তারতিবিশ শারায়ে, কিতাব আদাবিল কাযি (فصل في بيان ما يكره للقاضي), খণ্ড: ৭, পৃষ্ঠা: ৭-৮; এবং ইমাম ইবনে আবিদিন (রহ.), রদ্দুল মুহতার, খণ্ড: ৫, পৃষ্ঠা: ৩৭৯।

মালেকি ফিকহ: ইমাম ইবনে ফারহুন (রহ.), তাবসিরাতুল হুক্কাম ফি উসুলিল আকযিয়াহ, খণ্ড: ১, পৃষ্ঠা: ২৫-২৬।

শাফেয়ি ফিকহ: খতিব শিরবিনি (রহ.), মুগনি আল-মুহতাজ ইলা মা'রিফাতি মা'আনি আলফাজিল মিনহাজ, কিতাবুল কাযা, খণ্ড: ৪, পৃষ্ঠা: ৩৮৪-৩৮৫ (দারুল কুতুবিল ইলমিয়াহ)।

হাম্বলি ফিকহ: ইমাম ইবনে কুদামা (রহ.), আল-মুগনি, কিতাবুল কাযা (فصل ولا يقضي وهو غضبان), খণ্ড: ১১, পৃষ্ঠা: ৩৯৪-৩৯৫; এবং ইমাম ইবনে কায়্যিম আল-জাওযিয়্যাহ, ইলামুল মুওয়াক্কিয়িন, খণ্ড: ২, পৃষ্ঠা: ১২০।

অধ্যায় ৩: ইসলামি আদালতের গাঠনিক রূপরেখা ও বিভাগসমূহ

একটি শক্তিশালী ও কার্যকর বিচার ব্যবস্থা পরিচালনার জন্য আদালতের প্রাতিষ্ঠানিক কাঠামো এবং এর সুনির্দিষ্ট প্রশাসনিক বিন্যাস অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। এই তৃতীয় অধ্যায়ে ইসলামি বিচার ব্যবস্থার প্রাতিষ্ঠানিক রূপরেখা, আদালতের প্রশাসনিক কাঠামো এবং এর বিভিন্ন বিশেষায়িত বিভাগসমূহ নিয়ে আলোচনা করা হয়েছে। ইতিহাস এবং আধুনিক আইনি বাস্তবতার আলোকে ইসলামি আদালত কীভাবে বিন্যস্ত থাকে, তা এখানে ফুটিয়ে তোলা হয়েছে।

৩.১ 'আল-কাযা' বা সাধারণ দেওয়ানি ও ফৌজদারি আদালত

ইসলামি বিচার ব্যবস্থার মূল এবং সর্ববৃহৎ কাঠামো হলো 'মাহকামাতুল কাযা' (محكمة القضاء) বা সাধারণ আদালত। সমকালীন আইনি পরিভাষায় যাকে আমরা দেওয়ানি (Civil) ও ফৌজদারি (Criminal) আদালত হিসেবে চিনি, ইসলামি আইনশাস্ত্রে তার সামগ্রিক রূপরেখাই হলো এই সাধারণ কাযা ব্যবস্থা। এই আদালতের মূল দায়িত্ব হলো জনগণের প্রাত্যহিক জীবনের পারস্পরিক অধিকার রক্ষা করা এবং সাধারণ অপরাধের বিচার নিশ্চিত করা।

সাধারণ কাযা ব্যবস্থাকে প্রধানত দুটি মৌলিক ভাগে বিন্যস্ত করা হয়:

১. দেওয়ানি ক্ষেত্র: মানুষের জান-মাল, ব্যবসা-বাণিজ্য, চুক্তি, বিবাহ, তালাক, উত্তরাধিকার (মিরাস), এবং স্থাবর-অস্থাবর সম্পত্তির অধিকার সংক্রান্ত বিরোধ নিষ্পত্তি।

২. ফৌজিদারি ক্ষেত্র: চুরি, ডাকাতি, হত্যা, আঘাত, ব্যভিচার ও মানহানির মতো সাধারণ ফৌজদারি অপরাধের বিচার।

এই সাধারণ আদালতের প্রধান বিচারপতি বা বিচারককে 'কাযি' (قاضي) বলা হয়, যিনি শরিয়তের স্পষ্ট বিধান ও ফিকহি মূলনীতির আলোকে উভয় পক্ষের সাক্ষ্য-প্রমাণ যাচাই করে চূড়ান্ত ফয়সালা দেন।

- কুরআনের আয়াত ও অনুবাদ

মানবসমাজে পারস্পরিক হকের সুরক্ষা এবং সাধারণ দেওয়ানি ও ফৌজদারি বিরোধগুলো আল্লাহর দেওয়া বিধান অনুযায়ী পক্ষপাতহীনভাবে নিষ্পত্তির নির্দেশ দিয়ে আল্লাহ তাআলা ইরশাদ করেন:

إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ ۚ إِنَّ اللَّهَ نِعِمَّا يَعِظُكُمْ بِهِ

অনুবাদ: "নিশ্চয়ই আল্লাহ তোমাদের নির্দেশ দিচ্ছেন যে, তোমরা যেন আমানতসমূহ তার হকদারদের কাছে ফিরিয়ে দাও। আর যখন তোমরা মানুষের মধ্যে বিচার ফয়সালা করবে, তখন যেন ন্যায়পরায়ণতা ও ইনসাফের সাথে বিচার করো। আল্লাহ তোমাদের যে উপদেশ দিচ্ছেন, তা কতই না উৎকৃষ্ট!" (সূরা আন-নিসা, আয়াত: ৫৮)

- হাদিসের মতন ও অনুবাদ

সাধারণ আদালতের কাযি বা বিচারকদের গুরুদায়িত্ব, জবাবদিহিতা এবং সঠিক আইন প্রয়োগের গুরুত্ব বর্ণনা করে রাসূলুল্লাহ (সা.) ইরশাদ করেছেন:

الْقُضَاةُ ثَلَاثَةٌ :وَاحِدٌ فِي الْجَنَّةِ، وَاثْنَانِ فِي النَّارِ، فَأَمَّا الَّذِي فِي الْجَنَّةِ فَرَجُلٌ عَرَفَ الْحَقَّ فَقَضَى بِهِ، وَرَجُلٌ عَرَفَ الْحَقَّ فَجَارَ فِي الْحُكْمِ فَهُوَ فِي النَّارِ، وَرَجُلٌ قَضَى لِلنَّاسِ عَلَى جَهْلٍ فَهُوَ فِي النَّارِ

অনুবাদ: "বিচারকগণ তিন প্রকার; এক প্রকার জান্নাতি এবং অপর দুই প্রকার জাহান্নামী। যে বিচারক সত্যকে চিনেছে বা জেনেছে এবং সেই অনুযায়ী ফয়সালা করেছে, সে জান্নাতি। আর যে ব্যক্তি সত্য জানার পরও বিচারে অন্যায় ও পক্ষপাতিত্ব করেছে, সে জাহান্নামী। এবং যে ব্যক্তি অজ্ঞতা সত্ত্বেও মানুষের মধ্যে বিচার-ফয়সালা করে দিয়েছে, সেও জাহান্নামী।" (সুনানে আবু দাউদ, হাদিস নং: ৩৫৭৩; সুনানে ইবনে মাজাহ, হাদিস নং: ২৩১৫)

- ফিকহি মাসয়ালা ও তাত্ত্বিক বিশ্লেষণ

ইসলামি আইনশাস্ত্রে সাধারণ দেওয়ানি ও ফৌজদারি আদালতের এক্তিয়ার (Jurisdiction) এবং বিচারিক কার্যপদ্ধতি সুনির্দিষ্ট করতে ফকিহগণ নিম্নলিখিত মাসয়ালাগুলো নির্ধারণ করেছেন:

১. দেওয়ানি মামলার মূল ভিত্তি (البينة واليمين):

দেওয়ানি বা সম্পত্তি সংক্রান্ত বিরোধের ক্ষেত্রে সাধারণ আদালতের মূল আইনি কায়দা হলো—প্রমাণের দায়িত্ব বাদীর এবং অস্বীকার করলে কসম কাটার দায়িত্ব বিবাদীর। তবে কোনো ব্যক্তি যদি দেওয়ানি চুক্তির বরখেলাপ করে, তবে কাযি বা বিচারক চুক্তি বাস্তবায়ন করতে বা ক্ষতিপূরণ দিতে তাকে বাধ্য করতে পারেন। হানাফি ফিকহ অনুযায়ী, ঋণের মামলায় বিবাদী যদি অর্থ পরিশোধে ইচ্ছাকৃত বিলম্ব করে, তবে কাযি তাকে সাময়িক কারাদণ্ডও দিতে পারেন।

২. ফৌজদারি মামলার প্রমাণ ও দণ্ড কার্যকরের এক্তিয়ার:

ফৌজদারি অপরাধের ক্ষেত্রে সাধারণ আদালত হুদুদ (যেমন: চুরির দণ্ড) এবং কিসাস (হত্যার দণ্ড) এর মতো মামলা পরিচালনা করে। তবে ফকিহদের সর্বসম্মত সিদ্ধান্ত হলো, সাধারণ কাযি অপরাধ প্রমাণ করতে পারলেও রাষ্ট্রপ্রধান বা তাঁর অনুমোদিত বিশেষ নির্বাহী কর্তৃপক্ষ (যেমন: সুলতান বা ইমাম) ছাড়া কেউ এককভাবে এই শারীরিক দণ্ড বা শাস্তি কার্যকর করতে পারবে না।

৩. এক্তিয়ারের সীমাবদ্ধতা (تخصيص القضاء):

ফিকহি কায়দা অনুযায়ী, শাসক বা রাষ্ট্রপ্রধান সাধারণ আদালতের কাযিকে নির্দিষ্ট ভৌগোলিক এলাকা (Territorial Jurisdiction) অথবা নির্দিষ্ট বিষয়ের (Subject-matter Jurisdiction) মধ্যে সীমাবদ্ধ করে দিতে পারেন। যেমন: একজন কাযিকে কেবল পারিবারিক আদালতের দায়িত্ব দেওয়া হলো, তিনি দেওয়ানি বা ফৌজদারি মামলার বিচার করতে পারবেন না। এই রূপরেখা বর্তমান আধুনিক দেওয়ানি ও ফৌজদারি আদালতের গাঠনিক রূপের সাথে হুবহু মিলে যায়।

- একাডেমিক রেফারেন্স (উৎস গ্রন্থসমূহ)

হানাফি ফিকহ: ইমাম আলাউদ্দীন আল-কাসানি (রহ.), বাদায়েউস সানায়ে ফি তারতিবিশ শারায়ে, কিতাবুল কাযা (فصل في بيان محل القضاء وأما ولاية القاضي), খণ্ড: ৭, পৃষ্ঠা: ২-৪; এবং ইমাম ইবনু নুজাইম, আল-আশবাহ ওয়ান নাযaiর, পৃষ্ঠা: ২৫৪।

মালেকি ফিকহ: ইবনে জুযাই আল-কালবি, আল-কাওয়ানিন আল-ফিকহিয়্যাহ, কিতাবুল কাযা, পৃষ্ঠা: ৩১৫-৩১৬।
শাফেয়ি ফিকহ: ইমাম মাওয়ার্দি (রহ.), আল-আহকামুস সুলতানিয়াহ (الأحكام السلطانية - ولاية القضاء), পৃষ্ঠা: ৯৩-১০৫ (দারুল হাদিস); এবং খতিব শিরবিনি, মুগনি আল-মুহতাজ, খণ্ড: ৪, পৃষ্ঠা: ৩৭৫।
হাম্বলি ফিকহ: ইমাম ইবনে কুদামা, আল-মুগনি, কিতাব আদাবিল কাযি (فصل في تخصيص القاضي ببلد أو زمان أو حادثة), খণ্ড: ১১, পৃষ্ঠা: ৩৭৬-৩৭৮; এবং কাযি আবু ইয়ালা, আল-আহকামুস সুলতানিয়াহ, পৃষ্ঠা: ৬০।

৩.২ 'আল-হিসবাহ' বা ভ্রাম্যমাণ প্রশাসনিক, ভোক্তা ও বাজার আদালত

ইসলামি বিচার ব্যবস্থার একটি অন্যতম যুগান্তকারী, গতিশীল ও বিশেষায়িত আদালত হলো 'উইলায়াতুল হিসবাহ' (ولاية الحسبة) বা ভ্রাম্যমাণ আদালত। সমকালীন আইনি পরিভাষায় যাকে আমরা ভোক্তা অধিকার সংরক্ষণ অধিদপ্তর, বাজার নিয়ন্ত্রণ ট্রাইব্যুনাল এবং ভ্রাম্যমাণ প্রশাসনিক আদালত (Mobile Court) বলে থাকি, ইসলামি আইনশাস্ত্রে তার সামগ্রিক ও প্রাতিষ্ঠানিক রূপই হলো এই হিসবাহ ব্যবস্থা। এই আদালতের মূল চালিকাশক্তি হলো শরিয়তের "আমর বিল মা'রুফ ওয়া নাহি আনিল মুনকার" (সৎ কাজের আদেশ ও অসৎ কাজের নিষেধ) এর সার্বজনীন নীতি।

এই বিশেষ আদালতের দায়িত্বপ্রাপ্ত প্রধান বিচারপতি বা বিচারিক ম্যাজিস্ট্রেটকে বলা হয় 'মুহতাসিব' (محتسب)। সাধারণ দেওয়ানি ও ফৌজদারি আদালতের (আল-কাযা) মতো এখানে দীর্ঘ শুনানির প্রয়োজন হয় না। বরং মুহতাসিব নিজে বাজারে বাজারে ঘুরে বা প্রশাসনিক নজরদারি চালিয়ে ঘটনাস্থলেই অপরাধের তাৎক্ষণিক বিচার (Summary Trial) করার এবং সাজা দেওয়ার আইনি এখতিয়ার রাখেন। মূলত সামাজিক নৈতিকতা রক্ষা, ওজনে কারচুপি রোধ, কৃত্রিম সংকট (মজুতদারি) দমন এবং জননিরাপত্তা নিশ্চিত করাই এই আদালতের প্রধান কাজ।

- কুরআনের আয়াত ও অনুবাদ

সামাজিক জীবনে অধিকার হরণ, ওজনে কম দেওয়া এবং বাজার ও জনজীবনে বিপর্যয় বা বিশৃঙ্খলা সৃষ্টির কঠোর নিন্দা জানিয়ে আল্লাহ তাআলা ইরশাদ করেন:

وَيْلٌ لِلْمُطَفِّفِينَ ۝ الَّذِينَ إِذَا اكْتَالُوا عَلَى النَّاسِ يَسْتَوْفُونَ ۝ وَإِذَا كَالُوهُمْ أَوْ وَزَنُوهُمْ يُخْسِرُونَ

অনুবাদ: "ধ্বংস নিশ্চিত যারা ওজনে কম দেয় তাদের জন্য। যারা মানুষের কাছ থেকে মেপে নেওয়ার সময় পূর্ণমাত্রায় নেয়। আর যখন তাদের মেপে দেয় কিংবা ওজন করে দেয়, তখন তারা কম দেয়।" (সূরা আল-মুতাফফিফিন, আয়াত: ১-৩)

- হাদিসের মতন ও অনুবাদ

ভোক্তা ও বাজার আদালতের (হিসবাহ) মূল ভিত্তি এবং খাদ্যে ভেজাল বা প্রতারণা রোধে রাসূলুল্লাহ (সা.) স্বয়ং প্রথম 'মুহতাসিব' বা ভ্রাম্যমাণ বিচারক হিসেবে ঐতিহাসিক দৃষ্টান্ত স্থাপন করে ইরশাদ করেছেন:

أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَرَّ عَلَى صُبْرَةِ طَعَامٍ، فَأَدْخَلَ يَدَهُ فِيهَا، فَنَالَتْ أَصَابِعُهُ بَلَلًا، فَقَالَ :مَا هَذَا يَا صَاحِبَ الطَّعَامِ؟ قَالَ :أَصَابَتْهُ السَّمَاءُ يَا رَسُولَ اللَّهِ، قَالَ :أَفَلَا جَعَلْتَهُ فَوْقَ الطَّعَامِ كَيْ يَرَاهُ النَّاسُ؟ مَنْ غَشَّ فَلَيْسَ مِنِّي

অনুবাদ: "রাসূলুল্লাহ (সা.) একদিন বাজারে একটি খাদ্যের (শস্যের) স্তূপের পাশ দিয়ে যাচ্ছিলেন। তিনি স্তূপের ভেতরে নিজের হাত ঢুকিয়ে দিলেন, ফলে তাঁর আঙুলগুলো ভিজে গেল (ভিতরে ভেজা শস্য ছিল)। তিনি বললেন, 'হে শস্যের মালিক! এটি কী?' সে বলল, 'আল্লাহর রাসূল! বৃষ্টির কারণে এটি ভিজে গিয়েছিল।' তিনি বললেন, 'তবে তুমি এই ভেজা অংশটি শস্যের ওপরে রাখলে না কেন, যাতে ক্রেতারা তা দেখতে পেত? মনে রেখো, যে ব্যক্তি (ব্যবসায়) প্রতারণা বা ভেজাল দেয়, সে আমার দলভুক্ত নয়।" (সহিহ মুসলিম, হাদিস নং: ১০২; সুনানে তিরমিজি, হাদিস নং: ১৩১৫)

- ফিকহি মাসয়ালা ও তাত্ত্বিক বিশ্লেষণ

ইসলামি আইনশাস্ত্রে 'উইলায়াতুল হিসবাহ'-এর এক্তিয়ার (Jurisdiction) এবং সাধারণ আদালতের সাথে এর কাঠামোগত পার্থক্য নিরুপণে ফকিহগণ নিম্নলিখিত মাসয়ালাগুলো সুনির্দিষ্ট করেছেন:

১. হিসবাহ আদালতের স্বয়ংক্রিয় বিচারিক এক্তিয়ার (التحرك تلقائياً):

সাধারণ আদালতের (আল-কাযা) নিয়ম হলো—যতক্ষণ না কোনো বাদী এসে মামলা করছে, ততক্ষণ বিচারক নিজে থেকে বিচার শুরু করতে পারেন না। কিন্তু হিসবাহ আদালতের ক্ষেত্রে এই নিয়ম প্রযোজ্য নয়। মুহতাসিব বা ভ্রাম্যমাণ আদালতের বিচারক কোনো আনুষ্ঠানিক অভিযোগ ছাড়াই নিজে বাজারে বা জনপদে কোনো অনিয়ম (যেমন: ওজনে কম দেওয়া বা রাস্তায় জনগণের চলাচলে বাধা সৃষ্টি) দেখলে স্বয়ংক্রিয়ভাবে অ্যাকশন নিতে, অপরাধীকে আটক করতে এবং ঘটনাস্থলেই সাজা দিতে আইনিভাবে বাধ্য।

২. ভোক্তা অধিকার, ভেজাল ও কৃত্রিম সংকট (এহতিকার) দমন:

ব্যবসায়ীরা যদি অধিক মুনাফার আশায় নিত্যপ্রয়োজনীয় পণ্য গুদামজাত করে বাজারে কৃত্রিম সংকট তৈরি করে (যাকে ফিকহের পরিভাষায় 'এহতিকার' বা মজুতদারি বলা হয়), তবে মুহতাসিব সেই গুদাম সিলগালা করতে পারেন এবং পণ্যগুলো ন্যায্যমূল্যে বাজারে বিক্রি করে দেওয়ার নির্দেশ দিতে পারেন। এছাড়া পণ্যে ভেজাল, মেয়াদোত্তীর্ণ পণ্য বিক্রি বা ক্ষতিকারক কেমিক্যাল ব্যবহারের অপরাধে তিনি তৎক্ষণাৎ আর্থিক জরিমানা এবং পণ্য বাজেয়াপ্ত করার মাসয়ালা বা আইনি এখতিয়ার রাখেন।

৩. জনদুর্ভোগ ও পরিবেশ দূষণ রোধে প্রশাসনিক এখতিয়ার:

হিসবাহ আদালতের এক্তিয়ার কেবল বাজারের মধ্যেই সীমাবদ্ধ নয়। কোনো ব্যক্তি যদি সাধারণ মানুষের চলাচলের রাস্তায় প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি করে দোকান বা বাড়ি বাড়ায়, শহরের পরিবেশ দূষিত করে বা আবাসিক এলাকায় ক্ষতিকর কলকারখানা স্থাপন করে জনদুর্ভোগ তৈরি করে, তবে মুহতাসিব কোনো দীর্ঘায়িত মামলা ছাড়াই সরাসরি বুলডোজার দিয়ে বা প্রশাসনিক ক্ষমতাবলে তা উচ্ছেদ করার আইনি অধিকার রাখেন।

- একাডেমিক রেফারেন্স (উৎস গ্রন্থসমূহ)

হিসবাহ বিষয়ের মূল আকর গ্রন্থ: ইমাম ইবনে তাইমিয়াহ (রহ.), আল-হিসবাহ ফিল ইসলাম (الحسبة في الإسلام), পৃষ্ঠা: ৭-১৮; এবং ইমাম আল-মাওয়ার্দি (রহ.), আল-আহকামুস সুলতানিয়াহ, বাবুল হিসবাহ (الباب العشرون: في أحكام الحسبة), পৃষ্ঠা: ২৪০-২৫৮ (দারুল হাদিস কায়রো)।

হানাফি ফিকহ ও রাজকীয় আইন: ইমাম ইবনে আবিদিন (রহ.), রদ্দুল মুহতার আলাদ দুররিল মুখতার, কিতাবুল কাযা, খণ্ড: ৫, পৃষ্ঠা: ৪১২; এবং ফাতাওয়া আল-আলামগিরী (আল-ফাতাওয়া আল-হিন্দিয়াহ), খণ্ড: ৩, কিতাবুল কারাহিয়্যাহ (فصل في الاحتكار)، পৃষ্ঠা: ২১৩।

মালেকি ফিকহ: ইমাম ইবনে ফারহুন (রহ.), তাবসিরাতুল হুক্কাম ফি উসুলিল আকযিয়াহ ওয়া মানাহিজি আল-হুকাম, খণ্ড: ২, পৃষ্ঠা: ২৮৪-২৮৮ (বাজার নিয়ন্ত্রণ ও মুহতাসিবের এক্তিয়ার অধ্যায়)।

শাফেয়ি ফিকহ: ইমাম আবু হামিদ আল-গাজালি (রহ.), ইহয়াউ উলুমিদ্দীন, কিতাবুল আমার বিল মা'রুফ ওয়া নাহি আনিল মুনকার (আরকানুল হিসবাহ), খণ্ড: ২, পৃষ্ঠা: ৩১০-৩২৫; এবং খতিব শিরবিনি, মুগনি আল-মুহতাজ, খণ্ড: ৪, পৃষ্ঠা: ২১৪।

৩.৩ 'উইলায়াতুল মাযালিম' বা উচ্চ প্রশাসনিক আদালত / জবাবদিহিতা ট্রাইব্যুনাল

ইসলামি বিচার ব্যবস্থার সর্বোচ্চ, সবচেয়ে শক্তিশালী এবং অনন্য একটি আদালত হলো 'উইলায়াতুল মাযালিম' (ولاية المظالم) বা উচ্চ প্রশাসনিক ট্রাইব্যুনাল। আধুনিক বিচার ব্যবস্থার সুপ্রিম কোর্ট (Supreme Court), প্রশাসনিক ট্রাইব্যুনাল (Administrative Tribunal) এবং ন্যায়পাল (Ombudsman)-এর সমন্বিত রূপই হলো এই মাযালিম আদালত। সাধারণ নাগরিকরা যখন রাষ্ট্রের প্রভাবশালী কর্মকর্তা, মন্ত্রী, আমলা, এমনকি স্বয়ং খলিফা বা রাষ্ট্রপ্রধানের জুলুম ও ক্ষমতার অপব্যবহারের শিকার হন, তখন তার প্রতিকার ও বিচারের জন্য এই আদালতের শরণাপন্ন হন।

এই আদালতের বিচারককে 'কাযিউল মাযালিম' (قاضي المظالم) বলা হয়, এবং অনেক সময় স্বয়ং খলিফা বা সুলতান এই আদালতের প্রধান হিসেবে এজলাসে বসতেন। সাধারণ আদালতের (আল-কাযা) তুলনায় মাযালিম আদালতের ক্ষমতা ও এক্তিয়ার ছিল অনেক ব্যাপক ও শক্তিশালী। সাধারণ আদালত যে সমস্ত প্রভাবশালী অপরাধীকে সমন পাঠাতে বা শাস্তি দিতে হিমশিম খেত, মাযালিম আদালত নিজের বিশেষ রাষ্ট্রীয়

নির্বাহী ক্ষমতাবলে (Executive Power) তাদের মুহূর্তের মধ্যে বিচারের মুখোমুখি করতে পারত।

- কুরআনের আয়াত ও অনুবাদ

রাষ্ট্রীয় ক্ষমতা ও পদের অপব্যবহার করে জনগণের ওপর জুলুম করা এবং বিচার বিভাগকে অবদমিত করার বিরুদ্ধে কঠোর হুঁশিয়ারি উচ্চারণ করে আল্লাহ তাআলা ইরশাদ করেন:

وَلَا تَحْسَبَنَّ اللَّهَ غَافِلًا عَمَّا يَعْمَلُ الظَّالِمُونَ ۚ إِنَّمَا يُؤَخِّرُهُمْ لِيَوْمٍ تَشْخَصُ فِيهِ الْأَبْصَارُ

অনুবাদ: "আর তুমি কখনোই মনে করো না যে, জালিমরা যা করছে সে বিষয়ে আল্লাহ গাফেল বা উদাসীন। তিনি তো তাদের সেই দিন পর্যন্ত অবকাশ দিচ্ছেন, যেদিন তাদের চোখগুলো (আতঙ্কে) স্থির হয়ে যাবে।" (সূরা ইব্রাহিম, আয়াত: ৪২)

- হাদিসের মতন ও অনুবাদ

শাসক ও আমলাদের জবাবদিহিতা নিশ্চিত করতে এবং জনগণের অধিকার হরণের বিরুদ্ধে রাসূলুল্লাহ (সা.) স্বয়ং মাযালিম আদালতের ভিত্তি স্থাপন করে ইরশাদ করেছেন:

مَنِ اسْتَعْمَلْنَاهُ مِنْكُمْ عَلَى عَمَلٍ فَكَتَمَنَا مِخْيَاطًا فَمَا فَوْقَهُ كَانَ غُلُولًا يَأْتِي بِهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ

অনুবাদ: "তোমাদের মধ্য থেকে যাকে আমরা রাষ্ট্রের কোনো সরকারি পদে নিযুক্ত করলাম, অতঃপর সে যদি একটি সুঁই বা তার চেয়েও কোনো ছোট জিনিস (জনগণের হক বা সম্পদ থেকে) গোপন করে বা আত্মসাৎ করে, তবে তা রাষ্ট্রীয় আত্মসাৎ (খিয়ানত) হিসেবে গণ্য হবে; যা নিয়ে সে কিয়ামতের দিনে উপস্থিত হতে বাধ্য হবে।" (সহিহ মুসলিম, হাদিস নং: ১৮৩৩; সুনানে আবু দাউদ, হাদিস নং: ৩৫৮১)

- ফিকহি মাসয়ালা ও তাত্ত্বিক বিশ্লেষণ

ইসলামি আইনশাস্ত্রে 'উইলায়াতুল মাযালিম'-এর বিশেষ এক্তিয়ার এবং এর বিচারিক কার্যপদ্ধতি সম্পর্কে ফকিহগণ নিম্নলিখিত মাসয়ালাগুলো সুনির্দিষ্ট করেছেন:

১. ক্ষমতার অপব্যবহার ও অবৈধ সম্পদ বাজেয়াপ্তকরণ (مصادرة الأموال الإستثنائية):
মাযালিম আদালতের অন্যতম প্রধান ফিকহি মাসয়ালা হলো—কোনো সরকারি কর্মকর্তা বা আমলা যদি পদের প্রভাব খাটিয়ে অবৈধ উপায়ে সম্পদ অর্জন করেন বা প্রজাদের জমি দখল করেন, তবে মাযালিম আদালতের বিচারক সেই অবৈধ সম্পত্তি বাজেয়াপ্ত

করে প্রকৃত মালিককে ফিরিয়ে দিতে পারেন। খলিফা ওমর ইবনে আবদুল আজিজ (রহ.) এই নীতি প্রয়োগ করে উমাইয়া রাজপরিবারের সদস্যদের অন্যায্যভাবে দখলকৃত সমস্ত রাষ্ট্রীয় ও ব্যক্তিগত সম্পত্তি মাযালিম আদালতের মাধ্যমে বাজেয়াপ্ত করেছিলেন।

২. সরকারি কর্মকর্তা ও কর সংগ্রাহকদের বিরুদ্ধে মামলার এক্তিয়ার:

রাষ্ট্রের কর বা রাজস্ব আদায়কারী (আমেল) যদি সাধারণ জনগণের ওপর শরিয়ত নির্ধারিত সীমার বাইরে অতিরিক্ত কর চাপিয়ে দেয় বা বলপ্রয়োগ করে, তবে ভুক্তভোগী নাগরিক সরাসরি মাযালিম আদালতে আপিল করতে পারেন। এই আদালত করের হার পুনর্নির্ধারণ করার এবং অতিরিক্ত আদায়কৃত অর্থ ফেরত দেওয়ার আইনি আদেশ জারি করতে বাধ্য।

৩. সাধারণ আদালতের (আল-কাযা) রায় বাস্তবায়ন ও তদারকি:

প্রভাবশালী কোনো ব্যক্তি বা গোষ্ঠীর বিরুদ্ধে সাধারণ দেওয়ানি বা ফৌজদারি আদালত রায় দেওয়ার পর, অপরাধী যদি বাহুবল বা রাজনৈতিক প্রভাবে সেই রায় বাস্তবায়নে বাধা দেয়, তবে সাধারণ কাযি মামলাটি মাযালিম আদালতে স্থানান্তর করেন। মাযালিম আদালত তার বিশেষ নির্বাহী ক্ষমতাবলে সামরিক বা পুলিশি শক্তি প্রয়োগ করে সাধারণ আদালতের রায় বাস্তবায়ন নিশ্চিত করে।

- একাডেমিক রেফারেন্স (উৎস গ্রন্থসমূহ)

মাযালিম বিষয়ের মূল আকর গ্রন্থ: ইমাম আল-মাওয়ার্দি (রহ.), আল-আহকামুস সুলতানিয়াহ, বাব: উইলায়াতুল মাযালিম (الباب السابع: في ولاية المظالم), পৃষ্ঠা: ৭৭-৯২ (دار الكتب العلمية - بيروت); এবং কাযি আবু ইয়ালা আল-ফাররা, আল-আহকামুস সুলতানিয়াহ, পৃষ্ঠা: ৭৩-৮৫।

হানাফি ফিকহ ও বিচারিক প্রশাসনিক আইন: ইমাম আলাউদ্দীন আল-কাসানি (রহ.), বাদায়েউস সানায়ে ফি তারতিবিশ শারায়ে, কিতাবুল কাযা, খণ্ড: ৭, পৃষ্ঠা: ৪-৫; এবং ইবনে ফাহদুন, তাবসিরাতুল হুক্কাম, খণ্ড: ১, পৃষ্ঠা: ১৫।

শাফেয়ি ফিকহ ও উসুল: ইমাম ইবনে হাজার আল-হাইতামি, তুহফাতুল মুহতাজ ফি শারহিল মিনহাজ, কিতাবুল কাযা ওয়া শাহাদাত, খণ্ড: ১০, পৃষ্ঠা: ২৩৫।

হাম্বলি ফিকহ: ইমাম ইবনে তাইমিয়াহ (রহ.), আস-সিয়াহসাতুশ শারিইয়াহ ফি ইসলাহির রাঈ ওয়ার রাইয়্যাহ (السياسة الشرعية في إصلاح الراعي والرعية), পৃষ্ঠা: ৫৮-৬৫; এবং ইমাম ইবনে কায়্যিম আল-জাওযিয়্যাহ, আত-তুরুকুল হুকমিয়াহ ফিস সিয়াসাতিশ শারিইয়াহ (الطرق الحكمية), পৃষ্ঠা: ১৭-২২।

৩.৪ 'কাযিল কুযাত' বা প্রধান বিচারপতি পদের সূচনা ও বিবর্তন

ইসলামি বিচার ব্যবস্থার প্রাতিষ্ঠানিক বিবর্তনের ইতিহাসে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ পদটি হলো 'কাযিল কুযাত' (قَاضِي الْقُضَاةِ) বা প্রধান বিচারপতি (Chief Justice)। ইসলামের প্রাথমিক যুগে (খোলাফায়ে রাশেদীনের আমলে) প্রতিটি প্রদেশে স্বাধীনভাবে বিচারক নিয়োগ দেওয়া হতো এবং খলিফা নিজেই বিচার বিভাগের সর্বোচ্চ তদারককারী হিসেবে দায়িত্ব পালন করতেন। কিন্তু আব্বাসীয় খিলাফতের আমলে, বিশেষ করে খলিফা হারুন উর-রশীদের শাসনামলে (১৭০ হিজরি/৭৮৬ খ্রিস্টাব্দ), রাষ্ট্রের বিস্তার ও আইনি জটিলতা বৃদ্ধির কারণে বিচার বিভাগকে একটি স্বাধীন ও সুসংগঠিত প্রাতিষ্ঠানিক রূপ দেওয়ার প্রয়োজনীয়তা দেখা দেয়।

এরই ধারাবাহিকতায় সমগ্র মুসলিম বিশ্বের বিচারকদের নিয়োগ, তদারকি ও অপসারণের জন্য একটি কেন্দ্রীয় পদের সৃষ্টি করা হয়, যাকে 'কাযিল কুযাত' বলা হয়। ইসলামের ইতিহাসে সর্বপ্রথম প্রধান বিচারপতি হিসেবে অলঙ্কৃত হন ইমাম আবু হানিফা (রহ.)-এর প্রধানতম ছাত্র, বিখ্যাত ফকিহ ও ইমাম—আবু ইউসুফ ইয়াকুব ইবনে ইব্রাহিম (রহ.)। এই পদের সৃষ্টির মাধ্যমে ইসলামি বিচার বিভাগ রাষ্ট্রের নির্বাহী বিভাগ (Executive Branch) থেকে সম্পূর্ণ স্বাধীন ও স্বায়ত্তশাসিত একটি সংস্থায় পরিণত হয়।

- কুরআনের আয়াত ও অনুবাদ

বিচার বিভাগের শৃঙ্খলা রক্ষা, যোগ্য ও বিশ্বস্ত ব্যক্তিদের বিচারিক উচ্চ পদে নিয়োগদান এবং আমানতদারিতার সাথে তা পরিচালনার নির্দেশ দিয়ে আল্লাহ তাআলা ইরশাদ করেন:

اِنَّ اللّٰهَ يَاْمُرُكُمْ اَنْ تُؤَدُّوا الْاَمٰنٰتِ اِلٰٓى اَهْلِهَا ۙ وَ اِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ اَنْ تَحْكُمُوْا بِالْعَدْلِ ؕ اِنَّ اللّٰهَ نِعِمَّا يَعِظُكُمْ بِهٖ ؕ اِنَّ اللّٰهَ كَانَ سَمِيْعًا بَصِيْرًا

অনুবাদ: "নিশ্চয়ই আল্লাহ তোমাদের নির্দেশ দিচ্ছেন যে, তোমরা যেন আমানতসমূহ তার যোগ্য মালিকদের (বা যোগ্য ব্যক্তিদের) কাছে সোপর্দ করো। আর যখন তোমরা মানুষের মধ্যে বিচার-ফয়সালা করবে, তখন যেন ইনসাফের সাথে বিচার করো।" (সূরা আন-নিসা, আয়াত: ৫৮)

- হাদিসের মতন অনুবাদ

বিচারকদের যোগ্যতা তদারকি করা, তাদের বেতন-ভাতা নির্ধারণ এবং প্রাতিষ্ঠানিক শৃঙ্খলা বজায় রাখার বিষয়ে সুন্নাহর ভিত্তি স্থাপন করে রাসূলুল্লাহ (সা.) ইরশাদ করেছেন:

مَنِ اسْتَعْمَلْنَاهُ عَلَى عَمَلٍ فَرَزَقْنَاهُ رِزْقًا، فَمَا أَخَذَ بَعْدَ ذَلِكَ فَهُوَ غُلُولٌ

অনুবাদ: "আমরা যাকে রাষ্ট্রীয় কোনো দায়িত্ব বা কাজের জন্য নিযুক্ত করলাম এবং তাকে (বায়তুল মাল থেকে) একটি সুনির্দিষ্ট রিযিক বা বেতন-ভাতা নির্ধারণ করে দিলাম; এর বাইরে সে যদি অতিরিক্ত কোনো কিছু গ্রহণ করে, তবে তা আত্মসাৎ (খিয়ানত) বলে গণ্য হবে।" (সুনানে আবি দাউদ, হাদিস নং: ২৯৪৩; মুস্তাদরাকে আল-হাকিম, হাদিস নং: ১৪৫০)

- ফিকহি মাসয়ালা ও তাত্ত্বিক বিশ্লেষণ

ইসলামি আইনশাস্ত্রে 'কাযিল কুযাত' বা প্রধান বিচারপতির আইনি এখতিয়ার (Jurisdiction) এবং বিচারক নিয়োগের শর্তাবলী সম্পর্কে ফকিহগণ নিম্নলিখিত মাসয়ালাগুলো সুনির্দিষ্ট করেছেন:

১. প্রধান বিচারপতির আইনি নিয়োগের ক্ষমতা (صلاحية تعيين القضاة):

ফিকহি কায়দা অনুযায়ী, খলিফা বা রাষ্ট্রপ্রধান যখন কোনো ফকিহকে 'কাযিল কুযাত' পদে নিয়োগ দেন, তখন স্বয়ংক্রিয়ভাবে রাষ্ট্রের সমস্ত আঞ্চলিক বিচারক (কাযি) নিয়োগ, বদলি এবং বরখাস্ত করার আইনি ক্ষমতা প্রধান বিচারপতির অধীনে চলে যায়। খলিফা সরাসরি বিচারক নিয়োগে হস্তক্ষেপ করতে পারেন না। ইমাম আবু ইউসুফ (রহ.) যখন প্রধান বিচারপতি হন, তখন তাঁর সুপারিশ ও অনুমোদন ছাড়া আব্বাসীয় খিলাফতের কোথাও কোনো বিচারক নিয়োগ দেওয়া হতো না।

২. বিচারকদের স্বাধীনতায় 'কাযিল কুযাত'-এর ভূমিকা:

প্রধান বিচারপতির একটি প্রধান মাসয়ালা হলো—রাষ্ট্র বা কোনো প্রভাবশালী আমলা যদি কোনো আঞ্চলিক বিচারকের ওপর অন্যায় রায় দেওয়ার জন্য চাপ সৃষ্টি করে, তবে সেই বিচারককে সুরক্ষা দেওয়া কাযিল কুযাতের আইনি দায়িত্ব। যদি কোনো কাযি দুর্নীতির আশ্রয় নেন, তবে প্রধান বিচারপতি তাঁর বিরুদ্ধে তদন্ত কমিটি গঠন করার এবং অপরাধ প্রমাণিত হলে তাকে স্থায়ীভাবে অপসারণ করার একক বিচারিক এখতিয়ার রাখেন।

৩. মাজহাবের প্রাতিষ্ঠানিকীকরণ ও বিবর্তন:

কাযিল কুযাত পদের বিবর্তনের সাথে ফিকহি মাজহাবের প্রসারের গভীর সম্পর্ক রয়েছে। হানাফি ফিকহের ইমাম আবু ইউসুফ (রহ.) প্রধান বিচারপতি হওয়ায় সরকারি আদালতগুলোতে হানাফি ফিকহের নিয়মানুযায়ী বিচারকার্য পরিচালনার আইনি রূপরেখা তৈরি হয়। পরবর্তীতে মামলুক সুলতান বাইবার্সের আমলে (৬৬৩ হিজরি) এই পদে একটি বড় বিবর্তন আসে। তিনি কায়রোতে চার মাজহাবের (হানাফি, মালেকি, শাফেয়ি ও হাম্বলি) জন্য চারজন পৃথক প্রধান বিচারপতি নিয়োগের ব্যবস্থা করেন, যাতে নিজ নিজ মাজহাবের নাগরিকরা তাদের নিজস্ব ফিকহ অনুযায়ী বিচার পেতে পারে।

- একাডেমিক রেফারেন্স (উৎস গ্রন্থসমূহ)

হানাফি ফিকহ ও বিচারিক ইতিহাস: ইমাম ইবনে আবিদিন (রহ.), রদ্দুল মুহতার আলাদ দুররিল মুখতার, কিতাবুল কাযা (فصل في تقليد القضاء), খণ্ড: ৫, পৃষ্ঠা: ৩৫৬-৩৫৮; এবং ইমাম ইবনে হাজর আল-আসকালানি, رفع الإصر عن قضاة مصر (রাফউল ইসর আন কুদাতিল মিসর - বিচারকদের ইতিহাস গ্রন্থ), পৃষ্ঠা: ২৫-৩০।

মালেকি ফিকহ ও প্রশাসনিক রূপরেখা: ইমাম ইবনে ফারহুন (রহ.), তাবসিরাতুল হুক্কাম ফি উসুলিল আকযিয়াহ, খণ্ড: ১, পৃষ্ঠা: ১৯-২১; এবং আল-কাদি আইয়াদ, ترتيب المدارك و تنوير المسالك, খণ্ড: ১, পৃষ্ঠা: ৬৮।

শাফেয়ি ফিকহ ও রাষ্ট্রীয় দর্শন: ইমাম আল-মাওয়ার্দি (রহ.), আল-আহকামুস সুলতানিয়াহ, কিতাব ولاية القضاء (বিচারক নিয়োগের শর্তাবলী), পৃষ্ঠা: ৯৫-৯৮ (دار الكتب العلمية); এবং খতিব শিরবিনি, মুগনি আল-মুহতাজ, খণ্ড: ৪, পৃষ্ঠা: ৩৭৬-৩৭৭।

হাম্বলি ফিকহ ও উসুল: কাযি আবু ইয়ালা আল-ফাররা, আল-আহকামুস সুলতানিয়াহ, পৃষ্ঠা: ৬১-৬৩; এবং ইমাম ইবনে কুদামা, আল-মুগনি, কিতাবুল কাযা, খণ্ড: ১১, পৃষ্ঠা: ৩৭৬।

অধ্যায় ৪: ইসলামি দণ্ডবিধি: হুদুদ, কিসাস ও তা'যির

ইসলামি ফৌজদারি আইনশাস্ত্রের (Islamic Criminal Jurisprudence) মূল ভিত্তি হলো এর সুনির্দিষ্ট দণ্ডবিধি, যা সমাজে অপরাধের চূড়ান্ত বিলোপ এবং শান্তি-শৃঙ্খলা বজায় রাখার জন্য অবতীর্ণ হয়েছে। এই চতুর্থ অধ্যায়ে ইসলামের শাস্তির তিন প্রধান স্তর—হুদুদ, কিসাস ও তা'যিরের প্রকৃতি, উদ্দেশ্য, অপরাধের প্রকারভেদ এবং এগুলোর প্রয়োগের কঠোর আইনি শর্তসমূহ নিয়ে বিস্তারিত ও তাত্ত্বিক আলোচনা করা হয়েছে।

৪.১ 'হুদুদ' বা কুরআন-সুন্নাহ দ্বারা নির্ধারিত শাস্তি

ইসলামি ফৌজদারি দণ্ডবিধির (Criminal Law) সবচেয়ে সংবেদনশীল ও অপরিবর্তনীয় অংশ হলো 'হুদুদ' (حدود)। এটি 'হদ' (حد) শব্দের বহুবচন, যার আভিধানিক অর্থ—সীমারেখা, প্রতিবন্ধক বা সুনির্দিষ্ট অংশ। শরিয়তের পরিভাষায়, মানুষের সার্বিক নিরাপত্তা ও সামাজিক শৃঙ্খলা রক্ষার স্বার্থে যে সমস্ত অপরাধকে "আল্লাহর অধিকার" (حق الله) বা সামষ্টিক সামাজিক অধিকারের পরিপন্থী ঘোষণা করে পবিত্র কোরআন ও সুন্নাহর টেক্সট (نص) দ্বারা শাস্তি সুনির্দিষ্ট করে দেওয়া হয়েছে, সেগুলোকে 'হুদুদ' বলা হয়।

হুদুদ আইনের মূল বৈশিষ্ট্য হলো—অপরাধ আদালতে অকাট্যভাবে প্রমাণিত হওয়ার পর শরিয়ত নির্ধারিত শাস্তি কমানো, বাড়ানো, পরিবর্তন করা বা ক্ষমা করার কোনো অধিকার কোনো বিচারক (কাযি), ভুক্তভোগী ব্যক্তি বা স্বয়ং রাষ্ট্রপ্রধানের থাকে না। ইসলামি আইনশাস্ত্রে হুদুদের অন্তর্ভুক্ত প্রধান অপরাধগুলো হলো: ব্যভিচার (যিনা), অপবাদ (কাযফ), মদ্যপান (শুরবুল খামর), চুরি (সারিকাহ), ডাকাতি বা সশস্ত্র লুণ্ঠন (হিরাবাহ), এবং ধর্মত্যাগ (ইরতিদাদ)।

- কুরআনের আয়াত ও অনুবাদ

হুদুদ অপরাধের অন্যতম প্রধান ও মারাত্মক অপরাধ 'হিরাবাহ' (ডাকাতি বা সমাজবিরোধী সশস্ত্র তৎপরতা) এবং এর কঠোর শাস্তির আইনি বিধান ঘোষণা করে আল্লাহ তাআলা ইরশাদ করেন:

إِنَّمَا جَزَاءُ الَّذِينَ يُحَارِبُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيَسْعَوْنَ فِي الْأَرْضِ فَسَادًا أَنْ يُقَتَّلُوا أَوْ يُصَلَّبُوا أَوْ تُقَطَّعَ أَيْدِيهِمْ وَأَرْجُلُهُمْ مِنْ خِلَافٍ أَوْ يُنْفَوْا مِنَ الْأَرْضِ ۚ ذَٰلِكَ لَهُمْ خِزْيٌ فِي الدُّنْيَا ۖ وَلَهُمْ فِي الْآخِرَةِ عَذَابٌ عَظِيمٌ

অনুবাদ: "যারা আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করে এবং দুনিয়ায় ধ্বংসাত্মক কাজ (ডাকাতি, সন্ত্রাস ও জননিরাপত্তা বিঘ্নিতকরণ) করে বেড়ায়, তাদের শাস্তি কেবল এই যে—তাদের হত্যা করা হবে অথবা ক্রুশবিদ্ধ করা হবে, কিংবা বিপরীত দিক থেকে তাদের হাত ও পা কেটে ফেলা হবে, অথবা তাদের দেশ থেকে নির্বাসিত করা হবে। এটি তাদের জন্য দুনিয়ায় লাঞ্ছনা, আর আখিরাতে তাদের জন্য রয়েছে মহা আজাব।" (সূরা আল-মায়িদাহ, আয়াত: ৩৩)

- হাদিসের মতন ও অনুবাদ

হুদুদ আইনের অপরিবর্তনীয়তা এবং এ ক্ষেত্রে কোনো প্রকার সুপারিশ বা পক্ষপাতিত্বের সুযোগ নেই তা স্পষ্ট করে রাসূলুল্লাহ (সা.) ইরশাদ করেছেন:

تَعَافُوا الْحُدُودَ فِيمَا بَيْنَكُمْ، فَمَا بَلَغَنِي مِنْ حَدٍّ فَقَدْ وَجَبَ

অনুবাদ: "তোমরা নিজেদের মধ্যে (আদালতে মামলা পৌঁছানোর আগেই) হুদুদ সংক্রান্ত অপরাধগুলো ক্ষমা করে দাও (বা মীমাংসা করে নাও)। কেননা, হুদুদ সংক্রান্ত কোনো অপরাধের মামলা যখন আমার (বা আদালতের) কাছে পৌঁছে যাবে, তখন তা কার্যকর করা ওয়াজিব (বা বাধ্যতামূলক) হয়ে যায়।" (সুনানে আবু দাউদ, হাদিস নং: ৪৩৭৬; সুনানে নাসায়ি, হাদিস নং: ৪৮৮৬)

- ফিকহি মাসয়ালা ও তাত্ত্বিক বিশ্লেষণ

ইসলামি ফৌজদারি আইনে 'হুদুদ' অপরাধের বিচারিক প্রয়োগ, প্রমাণ ও শাস্তি কার্যকরের পদ্ধতি সম্পর্কে ফকিহগণ নিম্নলিখিত মাসয়ালাগুলো সুনির্দিষ্ট করেছেন:

১. সন্দেহ বা সংশয়ের কারণে হদ বাতিল হওয়া (درء الحدود بالشبهات):

হুদুদ আইনের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ ফিকহি মূলনীতি হলো—সামান্যতম সন্দেহ বা সংশয় (Doubt) থাকলে হদ বা সুনির্দিষ্ট শারীরিক শাস্তি কার্যকর করা যাবে না। যেমন: চুরির

মালটি যদি কোনো সাধারণ বা যৌথ মালিকানার সম্পত্তি হয়, অথবা অপরাধী যদি প্রচণ্ড ক্ষুধার তাড়নায় নিরুপায় হয়ে খাদ্য চুরি করে, তবে সেখানে হদের শাস্তি (হাত কাটা) বাতিল হয়ে যাবে। এই ক্ষেত্রে মামলাটি সাধারণ 'তা'যির' বা সংশোধনমূলক শাস্তির অধীনে চলে যাবে।

২. সাক্ষ্যের কঠোরতা ও প্রত্যাহার (الرجوع عن الإقرار والشهادة):

হুদুদ অপরাধ প্রমাণের জন্য ইসলামি সাক্ষ্য আইন (Law of Evidence) অত্যন্ত কঠোর। যেমন, যিনা বা ব্যভিচার প্রমাণের জন্য চারজন বিশ্বস্ত পুরুষ সাক্ষীর প্রত্যক্ষ সাক্ষ্য বা চারবার স্বীকারোক্তি আবশ্যক। হানাফি ও শাফেয়ি ফিকহ অনুযায়ী, অপরাধী যদি নিজের স্বীকারোক্তির মাধ্যমে হদের মুখোমুখি হয় এবং শাস্তি কার্যকরের ঠিক পূর্ব মুহূর্তেও নিজের স্বীকারোক্তি প্রত্যাহার (Retract) করে, তবে তার হদের শাস্তি তৎক্ষণাৎ মওকুফ হয়ে যাবে।

৩. ক্ষমা ও আপসের অযোগ্যতা (عدم جواز الصلح والعفو):

হুদুদ মামলার ক্ষেত্রে ফকিহদের সর্বসম্মত সিদ্ধান্ত হলো, অপরাধের বিষয়টি প্রমাণের পর কোনো প্রকার আর্থিক জরিমানা বা ক্ষতিপূরণের বিনিময়ে আপস (Compounding) করা আইনত অবৈধ। উদাহরণস্বরূপ, চুরির মামলায় চোর যদি মালটির মালিকের সাথে আপস করে টাকা ফেরত দেয়, তবুও আদালতে মামলা প্রমাণিত হলে বিচারক হদ কার্যকর করতে বাধ্য; মালিকের ক্ষমার কোনো আইনি এক্তিয়ার এখানে নেই।

- একাডেমিক রেফারেন্স (উৎস গ্রন্থসমূহ)

হানাফি ফিকহ: ইমাম আলাউদ্দীন আল-কাসানি (রহ.), বাদায়েউস সানায়ে ফি তারতিবিশ শারায়ে, কিতাবুল হুদুদ (فصل في بيان ما تدرأ به الحدود من الشبهات), খণ্ড: ৭, পৃষ্ঠা: ৩৩-৩৬; এবং ইমাম ইবনুল হুমাম, ফাতহুল কাদির, কিতাবুল হুদুদ, খণ্ড: ৫, পৃষ্ঠা: ১১৫-১২০।

মালেকি ফিকহ: ইবনে জুযাই আল-কালবি, আল-কাওয়ানিন আল-ফিকহিয়্যাহ, কিতাবুল হুদুদ ওয়াল জিনায়াত, পৃষ্ঠা: ৪২৭-৪৩৫; এবং ইমাম ইবনে রুশদ, বিদায়াতুল মুজতাহিদ ওয়া নিহায়াতুল মুকতাসিদ, খণ্ড: ৪, কিতাবুল হুদুদ, পৃষ্ঠা: ২৫০-২৬৫।

শাফেয়ি ফিকহ: ইমাম মাওয়ার্দি (রহ.), আল-আহকামুস সুলতানিয়াহ, পৃষ্ঠা: ২২১-২২৮; এবং খতিব শিরবিনি, মুগনি আল-মুহতাজ, খণ্ড: ৪, পৃষ্ঠা: ১৪৩-১৫৫ (কিতাবুল হুদুদ)। হাম্বলি ফিকহ: ইমাম ইবনে কুদামা, আল-মুগনি, কিতাবুল হুদুদ (فصل في شروط وجوب الحد), খণ্ড: ১২, পৃষ্ঠা: ৩-১৫; এবং ইমাম ইবনে তাইমিয়াহ, আস-সিয়াহসাতুশ শারিইয়াহ, পৃষ্ঠা: ৯০-১০৫।

৪.২ 'কিসাস' ও 'দিয়াত' বা সমপরিমাণ শাস্তি এবং রক্তপণ নীতি

ইসলামি ফৌজদারি আইনের (Criminal Law) মানবীয় ও ক্ষতিপূরণমূলক বিচারের এক অনন্য রূপরেখা হলো 'কিসাস' (قصاص) ও 'দিয়াত' (دية)। কিসাস শব্দের আভিধানিক অর্থ—অনুগমন করা বা সমতা বিধান করা। শরিয়তের পরিভাষায়, কোনো ব্যক্তি অন্যায়ভাবে কাউকে হত্যা করলে বা শারীরিক আঘাত করে অঙ্গহানি ঘটালে, অপরাধীকে ঠিক সমপরিমাণ শাস্তি দেওয়াকে কিসাস বলা হয়। এটি মূলত "ব্যক্তির অধিকার" বা "ভুক্তভোগীর অধিকার" (حق العبد) এর অন্তর্ভুক্ত।

কিসাসের সমান্তরাল আইনি বিকল্প হলো 'দিয়াত' বা রক্তপণ (Blood Money) এবং 'আর্শ' (ارشد - অঙ্গহানির ক্ষতিপূরণ)। কিসাস যেহেতু ভুক্তভোগী বা তার পরিবারের একক অধিকার, তাই তারা চাইলে অপরাধীকে পুরোপুরি ক্ষমা করতে পারে, অথবা কিসাসের পরিবর্তে নির্দিষ্ট আর্থিক ক্ষতিপূরণ বা দিয়াত গ্রহণ করে আপস করতে পারে। ইসলামের এই বিধানটি অপরাধ দমনের পাশাপাশি প্রতিশোধের আগুন নিভিয়ে সামাজিক সম্প্রীতি ও পুনর্বাসনে (Restorative Justice) এক যুগান্তকারী ভূমিকা পালন করে।

- কুরআনের আয়াত ও অনুবাদ

অন্যায় হত্যাকাণ্ডের শাস্তিস্বরূপ কিসাসের বিধান এবং ক্ষমার মাধ্যমে দিয়াত বা রক্তপণ গ্রহণের আইনি অবকাশ ঘোষণা করে আল্লাহ তাআলা ইরশাদ করেন:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِصَاصُ فِي الْقَتْلَى ۖ ...فَمَنْ عُفِيَ لَهُ مِنْ أَخِيهِ شَيْءٌ فَاتِّبَاعٌ بِالْمَعْرُوفِ وَأَدَاءٌ إِلَيْهِ بِإِحْسَانٍ ۗ ذَٰلِكَ تَخْفِيفٌ مِنْ رَبِّكُمْ وَرَحْمَةٌ

অনুবাদ: "হে মুমিনগণ! হত্যাকাণ্ডের ব্যাপারে তোমাদের ওপর কিসাস (সমতাভিত্তিক শাস্তি) ফরজ করা হয়েছে। ... অতঃপর যাকে তার ভাইয়ের (নিহতের ওয়ারিশদের) পক্ষ থেকে কিছুটা ক্ষমা করা হবে, তবে প্রচলিত নিয়ম অনুসরণ করা উচিত এবং সদয়ভাবের সাথে (রক্তপণ) আদায় করা উচিত। এটি তোমাদের রবের পক্ষ থেকে একটি শিথিলতা এবং বিশেষ রহমত।" (সূরা আল-বাকারাহ, আয়াত: ১৭৮)

- হাদিসের মতন ও অনুবাদ

কিসাস ও দিয়াতের আইনি এখতিয়ার যে সম্পূর্ণভাবে নিহতের অভিভাবকদের ওপর ন্যস্ত এবং দিয়াতের সাধারণ পরিমাণ কী হবে, তা নির্ধারণ করে রাসূলুল্লাহ (সা.) ইরশাদ করেছেন:

مَنْ قُتِلَ لَهُ قَتِيلٌ فَهُوَ بِخَيْرِ النَّظَرَيْنِ إِمَّا أَنْ يُفْدَى وَإِمَّا أَنْ يُقْتَلَ

অনুবাদ: "যার কোনো আত্মীয়কে অন্যায়ভাবে হত্যা করা হয়েছে, সে দুটি বিষয়ের মধ্যে সর্বোত্তমটি বেছে নেওয়ার অধিকার পাবে—হয় সে ফিদয়া (দিয়াত বা রক্তপণ) গ্রহণ করবে, না হয় সে কিসাস (ঘাতকের মৃত্যুদণ্ড) দাবি করবে।" (সহিহ বুখারি, হাদিস নং: ২৪৩৪; সহিহ মুসলিম, হাদিস নং: ১৩৫৫)

অন্য এক হাদিসে রাসূলুল্লাহ (সা.) পূর্ণ দিয়াতের পরিমাণ ১০০টি উট বা সমমূল্যের মুদ্রা সুনির্দিষ্ট করেছেন (সুনানে নাসায়ি, হাদিস নং: ৪৮৫৩)।

- ফিকহি মাসয়ালা ও তাত্ত্বিক বিশ্লেষণ

ইসলামি আইনশাস্ত্রে কিসাস কার্যকর করার শর্তাবলী এবং দিয়াত বণ্টনের নিয়ম সম্পর্কে ফকিহগণ নিম্নলিখিত মাসয়ালাগুলো সুনির্দিষ্ট করেছেন:

১. কিসাস কার্যকরে সমস্ত ওয়ারিশদের ঐকমত্যের শর্ত (اشتراط اتفاق الأولياء):

ফিকহি কায়দা অনুযায়ী, নিহতের যদি একাধিক উত্তরাধিকারী (ওয়ারিশ) থাকে, তবে কিসাস (মৃত্যুদণ্ড) কার্যকর করতে হলে সমস্ত ওয়ারিশদের একমত হতে হবে। যদি তাদের মধ্য থেকে একজন ওয়ারিশও অপরাধীকে ক্ষমা করে দেয় বা দিয়াতের বিনিময়ে আপস করতে রাজি হয়, তবে ঘাতকের কিসাসের (মৃত্যুদণ্ডের) শাস্তি তৎক্ষণাৎ বাতিল হয়ে যাবে। এই ক্ষেত্রে অপরাধী বাকি ওয়ারিশদের তাদের হিস্যা অনুযায়ী দিয়াত বা রক্তপণ দিতে বাধ্য থাকবে।

২. ইচ্ছাকৃত বনাম ভুলবশত হত্যাকাণ্ড (القتل العمد وشبه العمد والخطأ):

হত্যাকাণ্ড যদি সম্পূর্ণ ইচ্ছাকৃত (আমদ) হয়, তবেই কেবল কিসাস ওয়াজিব হয়। কিন্তু যদি ভুলবশত (খাতা) কোনো মানুষ মারা যায় (যেমন: শিকার করতে গিয়ে লক্ষ্যভ্রষ্ট হয়ে কোনো মানুষকে গুলি করা), তবে ফকিহদের সর্বসম্মত সিদ্ধান্ত অনুযায়ী সেখানে কোনো কিসাস হবে না। এই ক্ষেত্রে অপরাধীর ওপর 'দিয়াতে مخففة' (হালকা রক্তপণ) ওয়াজিব হবে, যা অপরাধীর আক্বিলাহ (পিতৃব্য গোষ্ঠী বা বিমা/সমষ্টিগত তহবিল) থেকে নিহতের পরিবারকে তিন বছরের মধ্যে পরিশোধ করতে হবে।

৩. অঙ্গহানির ক্ষেত্রে কিসাসের শর্ত (قصاص الأعضاء):

মানুষের চোখ, কান, হাত বা দাঁত নষ্ট করার ক্ষেত্রেও কিসাসের বিধান রয়েছে। তবে ফিকহের মাসয়ালা হলো—অঙ্গহানির ক্ষেত্রে কিসাস কেবল তখনই নেওয়া যাবে, যখন অপরাধীর অঙ্গে ঠিক সমপরিমাণ আঘাত করা নিখুঁতভাবে সম্ভব এবং কিসাস নিতে গিয়ে অপরাধীর জীবননাশের কোনো আশঙ্কা থাকবে না। যদি সমতা রক্ষা করা অসম্ভব বা ঝুঁকিপূর্ণ হয় (যেমন: হাড় ভাঙা বা গভীর ক্ষত), তবে কিসাস বাতিল হয়ে 'আর্শ' বা শরিয়ত নির্ধারিত নির্দিষ্ট আর্থিক জরিমানা বাধ্যতামূলক হবে।

- একাডেমিক রেফারেন্স (উৎস গ্রন্থসমূহ)

হানাফি ফিকহ: ইমাম আলাউদ্দীন আল-কাসানি (রহ.), বাদায়েউস সানায়ে ফি তারতিবিশ শারায়ে, কিতাবুল জিনায়াত (فصل في بيان شرائط وجوب القصاص), খণ্ড: ৭, পৃষ্ঠা: ৮৫-৯২; এবং ইমাম ইবনে আবিদিন (রহ.), রদ্দুল মুহতার, কিতাবুল জিনায়াত, খণ্ড: ৬, পৃষ্ঠা: ৫২৮-৫৩৫।

মালেকি ফিকহ: ইমাম ইবনে রুশদ, বিদায়াতুল মুজতাহিদ ওয়া নিহায়াতুল মুকতাসিদ, কিতাবুল জিনায়াত (القول في القصاص), খণ্ড: ৪, পৃষ্ঠা: ২০২-২১৮; এবং ইবনে জুযাই, আল-কাওয়ানিন আল-ফিকহিয়্যাহ, পৃষ্ঠা: ৪১৭।

শাফেয়ি ফিকহ: খতিব শিরবিনি, মুগনি আল-মুহতাজ ইলা মা'রিফাতি মাআনি আলফাজিল মিনহাজ, কিতাবুল জিরার (القصاص في النفس), খণ্ড: ৪, পৃষ্ঠা: ৩-১৫; এবং ইমাম আল-শাফেয়ি, কিতাবুল উম্ম, খণ্ড: ৬, কিতাবুল জিনায়াত।

হাম্বলি ফিকহ: ইমাম ইবনে কুদামা, আল-মুগনি, কিতাবুল জিনায়াত (باب القصاص فيما دون النفس), খণ্ড: ১১, পৃষ্ঠা: ৪৫০-৪৬৫; এবং কাযি আবু ইয়ালা, আল-আহকামুস সুলতানিয়াহ, পৃষ্ঠা: ২১৯।

৪.৩ 'তা'যির' বা সমকালীন বিচারক ও রাষ্ট্রের বিবেচনামূলক শাস্তি

ইসলামি ফৌজদারি বিচার ব্যবস্থার সবচেয়ে গতিশীল, নমনীয় এবং সমসাময়িক যুগের সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ আইনি ধারা হলো 'তা'যির' (تعزير)। তা'যির শব্দের আভিধানিক অর্থ—সম্মান করা, বারণ করা, সংশোধন করা বা তিরস্কার করা। শরিয়তের পরিভাষায়, যে সমস্ত অপরাধের জন্য পবিত্র কোরআন ও সুন্নাহর টেক্সটে (نص) কোনো সুনির্দিষ্ট শাস্তি (হদ) বা সমতাভিত্তিক বিচার (কিসাস) নির্ধারিত নেই, বরং অপরাধের প্রকৃতি, অপরাধীর অবস্থা এবং সমকালীন সামাজিক প্রেক্ষাপট বিবেচনা করে শাস্তি নির্ধারণের একক এখতিয়ার ইসলামি আদালতের বিচারক (কাযি) বা আইনপ্রণেতা রাষ্ট্রের ওপর ছেড়ে দেওয়া হয়েছে, তাকে 'তা'যির' বলা হয়।

হুদুদ ও কিসাস যেখানে অপরিবর্তনীয়, সেখানে তা'যির হলো সম্পূর্ণ পরিবর্তনশীল। যুগের পরিবর্তনের সাথে সাথে নতুন নতুন যেসব অপরাধের সৃষ্টি হয় (যেমন: ট্রাফিক আইন লঙ্ঘন, সাইবার ক্রাইম, কর ফাঁকি, কালোবাজারি, আর্থিক জালিয়াতি ইত্যাদি), সেগুলোকে রাষ্ট্র তা'যির আইনের আওতাভুক্ত করে শাস্তি সাজার আইনি কাঠামো তৈরি করতে পারে। তা'যিরের মূল উদ্দেশ্য অপরাধীকে ধ্বংস করা নয়, বরং তাকে সংশোধন করা এবং সমাজকে ফেতনা ও বিশৃঙ্খলা থেকে রক্ষা করা।

- কুরআনের আয়াত ও অনুবাদ

অন্যায়, জুলুম এবং সমাজে বিশৃঙ্খলা সৃষ্টিকারী কর্মকাণ্ডের বিরুদ্ধে শাসন ও সংশোধনমূলক পদক্ষেপ গ্রহণের সাধারণ আইনি মূলনীতি ঘোষণা করে আল্লাহ তাআলা ইরশাদ করেন:

وَالَّذِينَ يُؤْذُونَ الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ بِغَيْرِ مَا اكْتَسَبُوا فَقَدِ احْتَمَلُوا بُهْتَانًا وَإِثْمًا مُبِينًا

অনুবাদ: "আর যারা মুমিন পুরুষ ও মুমিন নারীদের অপরাধ ছাড়াই কষ্ট দেয়, তারা নিশ্চয়ই এক মহা অপবাদ এবং স্পষ্ট পাপের বোঝা বহন করে।" (সূরা আল-আহযাব, আয়াত: ৫৮)

এই আয়াত থেকে ফকিহগণ নীতিগত ইস্তিম্বাত করেছেন যে, মুমিনদের কষ্টদায়ক বা ক্ষতিকর যেকোনো অন্যায় আচরণের বিরুদ্ধে রাষ্ট্র শাস্তিমূলক ব্যবস্থা নিতে পারে।

- হাদিসের মতন ও অনুবাদ

তা'যির বা সংশোধনমূলক শাস্তির একটি আইনি সর্বোচ্চ সীমারেখা টেনে দিয়ে এবং এর প্রয়োগের ক্ষেত্র স্পষ্ট করে রাসূলুল্লাহ (সা.) ইরশাদ করেছেন:

لَا يُجْلَدُ فَوْقَ عَشَرَةِ أَسْوَاطٍ إِلَّا فِي حَدٍّ مِنْ حُدُودِ اللَّهِ

অনুবাদ: "আল্লাহর হুদুদ (নির্ধারিত সীমা)-এর অন্তর্ভুক্ত কোনো অপরাধ ছাড়া অন্য কোনো (তা'যির বা সংশোধনমূলক) অপরাধে কাউকে দশটির বেশি বেত্রাঘাত করা যাবে না।" (সহিহ বুখারি, হাদিস নং: ৬৮৪৮; সহিহ মুসলিম, হাদিস নং: ১৭০৮)

হানাফি ফিকহসহ অধিকাংশ মাজহাবে এই হাদিসের আলোকে তা'যিরের শারীরিক শাস্তিকে হদ-এর সর্বনিম্ন শাস্তি (যেমন অপবাদের শাস্তি ৮০ বেত্রাঘাত বা গোলামের ক্ষেত্রে ৪০ বেত্রাঘাত)-এর চেয়ে কম রাখার নীতিগত সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে।

- ফিকহি মাসয়ালা ও তাত্ত্বিক বিশ্লেষণ

ইসলামি আইনশাস্ত্রে তা'যিরী ব্যবস্থার বিচারিক প্রয়োগ এবং এর আইনি এক্তিয়ার সম্পর্কে ফকিহগণ নিম্নলিখিত মাসয়ালাগুলো সুনির্দিষ্ট করেছেন:

১. তা'যিরের শাস্তির বৈচিত্র্য ও প্রকারভেদ (تنوع العقوبات التعزيرية):

ফিকহি বিধি অনুযায়ী, তা'যিরের শাস্তি শুধু বেত্রাঘাতের মধ্যে সীমাবদ্ধ নয়। অপরাধের গুরুত্ব বিবেচনা করে বিচারক বিভিন্ন স্তরের শাস্তি নির্ধারণ করতে পারেন; যেমন—মৌখিক তিরস্কার (وعظ), জনসমক্ষে অপরাধের নিন্দা বা অপদস্থকরণ (تشهير), সুনির্দিষ্ট জরিমানা বা আর্থিক দণ্ড (غرامة مالية), কারাদণ্ড (حبس), সমাজসেবামূলক কাজ, এবং সমাজবিরোধী মারাত্মক অপরাধের ক্ষেত্রে চরম দণ্ড বা মৃত্যুদণ্ড (القتل تعزيراً—যেমন চরমপন্থী সন্ত্রাসী বা মাদক চোরাকারবারীদের ক্ষেত্রে)।

২. ক্ষমা ও আপসের সুযোগ (جواز العفو والأصل في التعزير):

হুদুদ অপরাধের মতো তা'যির আপসের অযোগ্য নয়। যদি অপরাধটি সম্পূর্ণ রাষ্ট্রীয় বা সামাজিক শৃঙ্খলা সংক্রান্ত (حق الله) হয়, তবে অপরাধী অনুতপ্ত হলে রাষ্ট্রপ্রধান বা বিচারক তাকে সম্পূর্ণ ক্ষমা করতে পারেন। আর যদি অপরাধটি কোনো নির্দিষ্ট ব্যক্তির অধিকারের (حق العبد) সাথে সংশ্লিষ্ট হয় (যেমন: গালি দেওয়া বা মারধর করা), তবে ভুক্তভোগী ব্যক্তি ক্ষমা করে দিলে কাযি মামলাটি খারিজ করে দিতে পারেন।

৩. সন্দেহ বা পরিস্থিতির আলোকে শাস্তি নির্ধারণ (تأثير الشبهات والظروف):

হুদুদ মামলায় সামান্যতম সন্দেহ বা সংশয় (Shubhat) থাকলে শাস্তি বাতিল হয়ে যায়, কিন্তু তা'যিরের ক্ষেত্রে সংশয়ের কারণে মামলা বাতিল হয় না। কোনো অপরাধের প্রমাণ যদি হুদুদের অকাট্য মানদণ্ডে উন্নীত হতে না পারে (যেমন: ব্যভিচারের চারজন সাক্ষী পাওয়া যায়নি, কিন্তু লৈঙ্গিক অপরাধের অন্যান্য আলামত স্পষ্ট), তবে বিচারক হদ বাতিল করে তাকে তা'যিরী ধারায় কারাদণ্ড বা বেত্রাঘাতের আদেশ দিতে পারেন।

- একাডেমিক রেফারেন্স (উৎস গ্রন্থসমূহ)

হানাফি ফিকহ ও বিচারিক প্রয়োগ: ইমাম আলাউদ্দীন আল-কাসানি (রহ.), বাদায়েউস সানায়ে ফি তারতিবিশ শারায়ে, কিতাবুত তা'যির (فصل في بيان محل التعزير), খণ্ড: ৭, পৃষ্ঠা: ৬৩-৬৫; এবং ইমাম ইবনুল হুমাম, ফাতহুল কাদির, কিতাবুল হুদুদ, বাবুত তা'যির, খণ্ড: ৫, পৃষ্ঠা: ৩৪৫-৩৫০।

মালেকি ফিকহ: ইবনে জুযাই আল-কালবি, আল-কাওয়ানিন আল-ফিকহিয়্যাহ, পৃষ্ঠা: ৪৩৬; এবং ইমাম ইবনে রুশদ, বিদায়াতুল মুজতাহিদ, খণ্ড: ৪, পৃষ্ঠা: ২৬৬-২৭০।

শাফেয়ি ফিকহ ও প্রশাসনিক আইন: খতিব শিরবিনি, মুগনি আল-মুহতাজ, কিতাবুল হুদুদ (فصل في التعزير وأحكامه), খণ্ড: ৪, পৃষ্ঠা: ১৯১-১৯৬; এবং ইমাম আল-মাওয়ার্দি, আল-আহকামুস সুলতানিয়াহ, পৃষ্ঠা: ২৩৫-২৪২।

হাম্বলি রাষ্ট্রদর্শন ও তা'যির নীতি: ইমাম ইবনে তাইমিয়াহ (রহ.), আস-সিয়াহসাতুশ শারিইয়াহ ফি ইসলাহির রাঈ ওয়ার রাইয়্যাহ, পৃষ্ঠা: ১০৬-১২০; এবং ইমাম ইবনে কায়্যিম আল-জাওযিয়্যাহ, আত-তুরুকুল হুকমিয়াহ ফিস সিয়াসাতিশ শারিইয়াহ, পৃষ্ঠা: ৭৮-৮৫।

৪.৪ ইসলামি শাস্তির মূল দর্শন: অপরাধের প্রতিশোধ বনাম সমাজ সংস্কারের প্রতিরোধক ব্যবস্থা

ইসলামি ফৌজদারি বিচার ব্যবস্থার (Islamic Criminal Jurisprudence) মূল লক্ষ্য কেবল অপরাধীকে শাস্তি দেওয়া বা আক্ষরিক অর্থে প্রতিশোধ নেওয়া নয়; বরং এর পেছনে রয়েছে এক গভীর সামষ্টিক কল্যাণ এবং সমাজ সংস্কারের সুদূরপ্রসারী দর্শন। ইসলামি দণ্ডবিধির দর্শন মূলত তিনটি প্রধান আধুনিক তত্ত্বের এক অনন্য সমন্বয়:

১. প্রতিরোধক তত্ত্ব (Deterrent Theory): যা সমাজে অপরাধের বিস্তার রোধে দৃষ্টান্তমূলক আইনি ভীতি তৈরি করে।
২. প্রতিকারমূলক বা সমতাভিত্তিক তত্ত্ব (Retributive Theory): যা মজলুমের অধিকার প্রতিষ্ঠা ও ক্ষোভ প্রশমন করে।
৩. সংশোধনমূলক তত্ত্ব (Reformative Theory): যা অপরাধীকে সুস্থ জীবনে ফিরিয়ে আনার সুযোগ দেয়।

পশ্চিমা আইনের সমালোচকরা প্রায়শই হুদুদ ও কিসাসের শাস্তিকে "নিষ্ঠুর" বা "কেবলই প্রতিশোধমূলক" বলে আখ্যায়িত করেন। তবে ইসলামি আইনের সূক্ষ্ম বিশ্লেষণে দেখা যায়, এই কঠোর শাস্তির মূল উদ্দেশ্য হলো অপরাধের প্রতি শূন্য-সহনশীলতা (Zero-Tolerance) তৈরি করা, যাতে কেউ অপরাধ করার সাহসই না পায়। একই সাথে, ইসলাম শাস্তি কার্যকর করার ক্ষেত্রে প্রমাণের যে কঠোর মানদণ্ড নির্ধারণ করেছে এবং সন্দেহ থাকলে শাস্তি মওকুফের যে ধারা (درء الحدود بالشبهات) রেখেছে, তা প্রমাণ করে যে ইসলামের মূল ঝোঁক শাস্তির নির্মমতার দিকে নয়, বরং অপরাধ প্রতিরোধ এবং সমাজ ও নাগরিকের জান-মাল-ইজ্জতের সামগ্রিক সুরক্ষার (مقاصد الشريعة) দিকে।

- কুরআনের আয়াত ও অনুবাদ

ইসলামি দণ্ডবিধির অন্যতম স্তম্ভ 'কিসাস'-এর মূল দর্শন যে মানুষের জীবন রক্ষা এবং অপরাধের প্রতিরোধক ব্যবস্থা, তা স্পষ্ট করে আল্লাহ তাআলা ইরশাদ করেন:

وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حَيَاةٌ يَا أُولِي الْأَلْبَابِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ

অনুবাদ: "আর হে বুদ্ধিমান সম্প্রদায়! কিসাসের (সমতাভিত্তিক শাস্তির) মধ্যেই তোমাদের জন্য রয়েছে জীবন, যাতে তোমরা (হত্যাকাণ্ড ও অপরাধ থেকে) বেঁচে থাকতে পারো।" (সূরা আল-বাকারাহ, আয়াত: ১৭৯)

ইমাম ফখরুদ্দীন রাযীসহ মুফাসসিরগণ বলেন, যখন একজন সম্ভাব্য খুনি জানবে যে কাউকে হত্যা করলে তাকেও মরতে হবে, তখন সে হত্যাকাণ্ড থেকে বিরত থাকবে। ফলে ঘাতক এবং ভুক্তভোগী—উভয়ের জীবনই রক্ষা পাবে। এটাই শাস্তির আসল প্রতিরোধক রূপ।

- হাদিসের মতন ও অনুবাদ

শাস্তি কার্যকর করার চেয়ে অপরাধীর সংশোধন ও তা মওকুফ করার সুযোগ খোঁজা যে আদালতের জন্য বেশি উত্তম, তা স্পষ্ট করে রাসূলুল্লাহ (সা.) ইরশাদ করেছেন:

ادْرَءُوا الْحُدُودَ عَنِ الْمُسْلِمِينَ مَا اسْتَطَعْتُمْ، فَإِنْ كَانَ لَهُ مَخْرَجٌ فَخَلُّوا سَبِيلَهُ، فَإِنَّ الإِمَامَ أَنْ يُخْطِئَ فِي الْعَفْوِ خَيْرٌ مِنْ أَنْ يُخْطِئَ فِي الْعُقُوبَةِ

অনুবাদ: "তোমরা তোমাদের সাধ্যানুযায়ী মুসলমানদের থেকে হুদুদ (কঠোর শাস্তি) দূর করো বা মওকুফের চেষ্টা করো। যদি অপরাধীর (মুক্তির বা সংশোধনের) কোনো পথ থাকে, তবে তার পথ ছেড়ে দাও। কেননা, একজন শাসকের (বা বিচারকের) ক্ষমার ক্ষেত্রে ভুল করা, শাস্তির ক্ষেত্রে ভুল করার চেয়ে অনেক গুণ উত্তম।" (জামেউত তিরমিযী, হাদিস নং: ১৪২৪; মুস্তাদরাকে আল-হাকিম, হাদিস নং: ৮১৬৩)

- ফিকহি মাসয়ালা ও তাত্ত্বিক বিশ্লেষণ

ইসলামি দণ্ডবিধির উদ্দেশ্য, সামষ্টিক হিকমত এবং অপরাধ প্রতিরোধের দর্শন সম্পর্কে ফকিহগণ নিম্নলিখিত আইনি মাসয়ালা ও মূলনীতিগুলো সুনির্দিষ্ট করেছেন:

১. 'মাকাসিদুশ শারিআহ' বা শরিয়তের পঞ্চ-সুরক্ষা নীতি (الحفاظ على الضروريات الخمس):

ইসলামি আইনশাস্ত্রের ইমামগণ (যেমন ইমাম শাতিলী ও আল-গাজালী) একমত হয়েছেন যে, ইসলামি শাস্তির মূল দর্শন হলো মানুষের পাঁচটি মৌলিক অধিকারের নিখুঁত সুরক্ষা দেওয়া। এই সুরক্ষার ভিত্তিতেই শাস্তির পরিমাপ নির্ধারিত হয়:

ক. জীবনের সুরক্ষা (حفظ النفس): যার জন্য কিসাসের বিধান।

খ. বংশের বা ইজ্জতের সুরক্ষা (حفظ النسل والعرض): যার জন্য যিনা ও কাযফ (অপবাদ)-এর হদ।
গ. সম্পত্তির সুরক্ষা (حفظ المال): যার জন্য চুরি ও ডাকাতির হদ।
ঘ. মেধা বা বিবেকের সুরক্ষা (حفظ العقل): যার জন্য মদ্যপানের শাস্তি।
ঙ. ধর্মের বা আস্থার সুরক্ষা (حفظ الدين): যার জন্য ইরতিদাদের দণ্ড।

২. প্রকাশ্য শাস্তির মনস্তাত্ত্বিক প্রতিরোধ প্রভাব (للعبرة والزجر علناً):
পবিত্র কুরআনে হুদুদ কার্যকর করার সময় মুমিনদের একটি দলকে উপস্থিত থাকার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে ("এবং তাদের শাস্তি কার্যকরকালে মুমিনদের একটি দল যেন উপস্থিত থাকে" — সূরা আন-নূর: ২)। ফিকহি মাসয়ালা অনুযায়ী, শাস্তির এই প্রকাশ্য রূপটি কোনো পাশবিক প্রদর্শনীর জন্য নয়, বরং এর পেছনে রয়েছে মনস্তাত্ত্বিক প্রতিরোধ (Psychological Deterrence)। জনসমক্ষে শাস্তি দেখলে সমাজে অপরাধপ্রবণ ব্যক্তিদের মনে তীব্র ভীতি তৈরি হয়, যা অপরাধের হার শূন্যের কোঠায় নামিয়ে আনতে বাধ্য করে।

৩. অপরাধের কারণ দূরীকরণ ও শাস্তির ভারসাম্য (تلازم العقوبة ودفع أسباب الجريمة):
ইসলামি দর্শনে রাষ্ট্র শুধু কঠোর শাস্তিই চাপায় না, বরং অপরাধের পেছনের সামাজিক ও অর্থনৈতিক কারণগুলো আগে দূর করে। ফিকহি কায়দা অনুযায়ী, খলিফা ওমর (রা.)-এর আমলে দুর্ভিক্ষের বছর চোরের হাত কাটার হদ স্থগিত করা হয়েছিল। ফকিহদের সিদ্ধান্ত হলো—রাষ্ট্র যতক্ষণ না নাগরিকদের বায়তুল মাল থেকে মৌলিক অর্থনৈতিক নিরাপত্তা (সোশ্যাল সেফটি নেট) নিশ্চিত করছে, ততক্ষণ পর্যন্ত অভাবের তাড়নায় করা চুরির ওপর হদ কার্যকর করা আইনি ইনসাফের পরিপন্থী। অর্থাৎ, ইসলামি শাস্তির দর্শন হলো—প্রথমে সুযোগের সমতা তৈরি করা, অতঃপর অপরাধের বিরুদ্ধে সর্বোচ্চ কঠোর হওয়া।

- একাডেমিক রেফারেন্স (উৎস গ্রন্থসমূহ)

শরিয়তের দর্শন ও দণ্ডবিধি তত্ত্ব (مقاصد الشريعة): ইমাম আবু ইসহাক আল-শাতিলী (রহ.), আল-মুয়াফাকাত ফি উসুলিশ শারিআহ, কিতাবুল মাকাসিদ (المقاصد الضرورية), বৈরুত: দারুল কুতুবিল ইলমিয়্যাহ, খণ্ড: ২, পৃষ্ঠা: ১৭-২৫।

ইমাম আবু হামিদ আল-গাজালী (রহ.), আল-মুস্তাসফা মিন ইলমিল উসুল, খণ্ড: ১, পৃষ্ঠা: ২৮৬-২৮৮।

হানাফি ফিকহ ও রাষ্ট্রীয় দণ্ডবিধি দর্শন: ইমাম আলাউদ্দীন আল-কাসানি (রহ.), বাদায়েউস সানায়ে ফি তারতিবিশ শারায়ে, কিতাবুল হুদুদ (فصل في بيان تشريع الحدود وأحكامها), বৈরুত: দারু ইহইয়ায়িত তুরাসিল আরাবি, খণ্ড: ৭, পৃষ্ঠা: ২-৬। কামালুদ্দীন ইবনুল হুমাম (রহ.), ফাতহুল কাদির, কিতাবুল হুদুদ (باب الجنايات وعقوباتها), কায়রো: বুলাক সংস্করণ, খণ্ড: ৫, পৃষ্ঠা: ১১১-১১৬।

মালেকি ফিকহ ও সামাজিক কল্যাণ দর্শন (المصالح المرسلة): ইমাম ইবনে রুশদ আল-কুরতুবি, বিদায়াতুল মুজতাহিদ ওয়া নিহায়াতুল মুকতাসিদ, কিতাবুল হুদুদ ওয়াল জিনায়াত, কায়রো: দারুল হাদিস, খণ্ড: ৪, পৃষ্ঠা: ২২৫-২৩২। শিহাবুলদ্দীন আল-কারাফী (রহ.), আল-ফুরূক (أنوار البروق في أنواء الفروق), খণ্ড: ৪, পৃষ্ঠা: ১৭৮-১৮৪।

হাম্বলি বিচারিক রাজনীতি ও অপরাধ বিজ্ঞান (السياسة الشرعية): ইমাম ইবনে তাইমিয়াহ (রহ.), আস-সিয়াহসাতুশ শারিইয়াহ ফি ইসলাহির রাঈ ওয়ার রাইয়্যাহ, কায়রো: দারুল কিতাবিল আরাবি, পৃষ্ঠা: ৮৮-৯৮।

অধ্যায় ৫: ইসলামিক বিচারিক কার্যবিধি ও সাক্ষ্য আইন

একটি মামলার শুরু থেকে শেষ রায় কার্যকর হওয়া পর্যন্ত আদালতের প্রতিটি পদক্ষেপ নিখুঁত ও বিতর্কহীন হওয়া জরুরি। এই পঞ্চম অধ্যায়ে ইসলামি আদালতের কার্যপ্রণালী বিধি (Adjective/Procedural Law) এবং সাক্ষ্য আইনের (Law of Evidence) সূক্ষ্ম ফিকহি ও তাত্ত্বিক দিকগুলো উন্মোচন করা হয়েছে। কোনো নিরপরাধ ব্যক্তি যেন আইনি মারপ্যাঁচে সাজা না পায়, তা নিশ্চিত করতে ইসলামের সাক্ষ্য গ্রহণ ও সত্য অনুসন্ধানের মানদণ্ড কতখানি কঠোর, তা এই অধ্যায়ের মূল আলোচ্য বিষয়।

৫.১ মামলার মূল ভিত্তি: বাদীর প্রমাণ ও বিবাদীর শপথ

ইসলামি বিচার ব্যবস্থার (Islamic Law of Procedure and Evidence) দেওয়ানি ও ফৌজদারি উভয় প্রকার মামলা পরিচালনার মূল ভিত্তি দাঁড়িয়ে আছে একটি অমোঘ আইনি সূত্রের ওপর। এই সূত্র অনুযায়ী, যেকোনো বিরোধ বা দাবির ক্ষেত্রে প্রমাণের প্রাথমিক দায়ভার ন্যস্ত থাকে দাবিদার বা বাদীর ওপর, আর বাদী যদি কোনো অকাট্য প্রমাণ উপস্থাপনে ব্যর্থ হয়, তবে বিবাদী বা অভিযুক্ত ব্যক্তি নিজের সত্যতা প্রমাণে আল্লাহর নামে শপথ গ্রহণ করার আইনি সুযোগ পায়।

ইসলামি আইনশাস্ত্রে বাদীকে বলা হয় 'মুদ্দা'ঈ' (مدعي)—যিনি এমন একটি দাবি উত্থাপন করেন যা বাহ্যিক অবস্থা বা প্রাথমিক পরিস্থিতির (Status Quo) পরিপন্থী। আর বিবাদীকে বলা হয় 'মুদ্দা'আ আলাইহি' (مدعى عليه)—যিনি বাদীর দাবি অস্বীকার করেন এবং নিজের মূল অবস্থানে অটল থাকেন। এই ধারার মূল আইনি দর্শন হলো—যেকোনো মানুষ জন্মগতভাবে নির্দোষ বা দায়মুক্ত (البراءة الأصلية)। সুতরাং, কেউ যদি কারও বিরুদ্ধে কোনো অধিকার বা অপরাধের দাবি তোলে, তবে তাকেই প্রমাণ নিয়ে আসতে হবে; অন্যথায় কেবল মৌখিক দাবির ভিত্তিতে কাউকে শাস্তি বা আর্থিক জরিমানা করা আইনত অসম্ভব।

- কুরআনের আয়াত ও অনুবাদ

মামলা-মোকদ্দমা ও পারস্পরিক লেনদেনের ক্ষেত্রে সাক্ষ্য-প্রমাণ সংরক্ষণ এবং আদালতের বাইরে বা ভেতরে ইনসাফ প্রতিষ্ঠার সাধারণ আইনি নির্দেশ দিয়ে আল্লাহ তাআলা ইরশাদ করেন:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا تَدَايَنْتُمْ بِدَيْنٍ إِلَىٰ أَجَلٍ مُسَمًّى فَاكْتُبُوهُ ۚ ...وَاسْتَشْهِدُوا شَهِيدَيْنِ his مِنْ رِجَالِكُمْ ۖ فَإِنْ لَمْ يَكُونَا رَجُلَيْنِ فَرَجُلٌ وَامْرَأَتَانِ مِمَّنْ تَرْضَوْنَ مِنَ الشُّهَدَاءِ

অনুবাদ: "হে মুমিনগণ! যখন তোমরা নির্দিষ্ট মেয়াদের জন্য পরস্পরের মধ্যে ঋণের লেনদেন করো, তখন তা লিখে রাখো। ... আর তোমাদের পুরুষদের মধ্য থেকে দুজন সাক্ষী রাখো। যদি দুজন পুরুষ না পাওয়া যায়, তবে একজন পুরুষ ও দুজন নারী—যাদের সাক্ষ্যের ব্যাপারে তোমরা সন্তুষ্ট, তাদের মধ্য থেকে (সাক্ষী মনোনীত করো)।" (সূরা আল-বাকারাহ, আয়াত: ২৮২)

এই আয়াত থেকে ফকিহগণ মামলার দাবি প্রমাণের জন্য সাক্ষ্য আইনি কাঠামোর সর্বোচ্চ গুরুত্ব ইস্তিম্বাত করেছেন।

- হাদিসের মতন ও অনুবাদ

ইসলামি সাক্ষ্য ও বিচারিক কার্যবিধির মূল ভিত্তি এবং চিরন্তন আইনি ম্যাক্সিম (Legal Maxim) ঘোষণা করে রাসূলুল্লাহ (সা.) ইরশাদ করেছেন:

لَوْ يُعْطَى النَّاسُ بِدَعْوَاهُمْ، لَادَّعَى رِجَالٌ دِمَاءَ رِجَالٍ وَأَمْوَالَهُمْ، وَلَكِنِ الْبَيِّنَةُ عَلَى الْمُدَّعِي وَالْيَمِينُ عَلَى مَنْ أَنْكَرَ،

অনুবাদ: "মানুষকে যদি কেবল তাদের দাবির ভিত্তিতেই (সবকিছু) দিয়ে দেওয়া হতো, তবে কিছু মানুষ অন্য মানুষের রক্ত (জীবন) ও সম্পদের ওপর দাবি বসিয়ে দিতো (এবং সমাজ ধ্বংস হতো)। তবে আইনি বিধান হলো—বাদী বা দাবিদারের ওপর প্রমাণ (Evidence) উপস্থাপন করা আবশ্যক, আর যে অস্বীকার করে (বিবাদী) তার ওপর শপথ (Oath) গ্রহণ করা আবশ্যক।" (সহিহ মুসলিম, কিতাবুল আকদিয়্যাহ, হাদিস নং: ১৭১১; সুনানে বাইহাকি, হাদিস নং: ২১২০৪)

- ফিকহি মাসয়ালা ও তাত্ত্বিক বিশ্লেষণ

ইসলামি আইনশাস্ত্রে বাদীর প্রমাণ ও বিবাদীর শপথের ব্যবহারিক ও বিচারিক প্রয়োগ সম্পর্কে ফকিহগণ নিম্নলিখিত মাসয়ালাগুলো সুনির্দিষ্ট করেছেন:

১. বাদী ও বিবাদী নির্ধারণের আইনি মানদণ্ড (تعريف المدعي والمدعى عليه):

হানাফি ফিকহের অন্যতম মূল কিতাব 'মাজাল্লাতুল আহকাম আল-আদলিয়্যাহ' (ধারা: ১৬২৯) অনুযায়ী, "বাদী হলেন সেই ব্যক্তি যিনি নিজের বক্তব্য দ্বারা বাহ্যিক অবস্থা বা নীরব পরিস্থিতি পরিবর্তন করতে চান।" আর বিবাদী হলেন তিনি, যিনি নিজেকে দায়মুক্ত রাখার মূল অবস্থানে স্থির থাকেন। যেমন: একজন দাবি করল, "আমি এই ব্যক্তির কাছে এক হাজার টাকা পাই।" এখানে দাবিদার হলেন বাদী; কারণ তিনি একটি নতুন দায় চাপাতে চাচ্ছেন। আর অপর পক্ষ যদি তা অস্বীকার করে, তবে সে বিবাদী; কারণ সে নিজের আদিম দায়মুক্তির (أصل براءة الذمة) ওপর অটল আছে। এই ক্ষেত্রে বাদীর প্রমাণ দেওয়া বাধ্যতামূলক।

২. শপথ প্রত্যাখ্যান বা নকুল ফিল ইয়ামিন (النكول عن اليمين):

বাদী যদি আদালতে কোনো সাক্ষী বা দালিলিক প্রমাণ (বাইয়্যিনাহ) হাজির করতে না পারে, তবে বিচারক বিবাদীকে আল্লাহর নামে শপথ করার নির্দেশ দেবেন। বিবাদী যদি সত্য পাঠ করে শপথ করে, তবে মামলা খারিজ হয়ে যাবে। কিন্তু বিবাদী যদি শপথ করতে অস্বীকার করে—পরিভাষায় যাকে 'নকুল' (Refusal to take oath) বলা হয়—তবে হানাফি ফিকহ অনুযায়ী, বিবাদীর এই নীরবতা বা অস্বীকৃতিকে পরোক্ষ স্বীকারোক্তি হিসেবে গণ্য করা হবে এবং বাদীর পক্ষে ডিক্রি বা রায় জারি করা হবে। (তবে শাফেয়ি ও মালেকি ফিকহ মতে, এই অবস্থায় শপথটি বাদীর দিকে ফিরিয়ে দেওয়া হবে—যাকে 'আল-ইয়ামিন আল-মারদুদাহ' বলা হয়)।

৩. ফৌজদারি বা হুদুদ মামলায় শপথের অকার্যকারিতা (لا يمين في الحدود والقصاص):

ফকিহদের সর্বসম্মত সিদ্ধান্ত হলো, বাদীর প্রমাণ ও বিবাদীর শপথের এই সমীকরণটি মূলত দেওয়ানি, আর্থিক ও সাধারণ অধিকারের মামলার ক্ষেত্রে প্রযোজ্য। হুদুদ (যেমন: ব্যভিচার, চুরি) বা কিসাস (হত্যাকাণ্ড)-এর মতো মারাত্মক ফৌজদারি অপরাধের ক্ষেত্রে কোনো বিবাদীকে শপথের মাধ্যমে দায়মুক্ত করা যায় না। অর্থাৎ, বাদী যদি চুরির অপরাধে কোনো সাক্ষী না দিতে পারে, তবে বিবাদীকে শপথ করিয়ে চুরির হদ (হাত কাটা) বা হত্যার কিসাস কার্যকর বা মওকুফ করা যাবে না; কারণ হুদুদ ও কিসাস কেবল অকাট্য প্রমাণ বা সুনির্দিষ্ট স্বীকারোক্তি ছাড়া সাব্যস্ত হয় না।

- একাডেমিক রেফারেন্স (উৎস গ্রন্থসমূহ)

হানাফি ফিকহ ও দেওয়ানি আইন বিধি: ইমাম আলাউদ্দীন আল-কাসানি (রহ.), বাদায়েউস সানায়ে ফি তারতিবিশ শারায়ে, কিতাবুল কাজা (فصل في بيان حكم الدعوى), বৈরুত: দারু ইহইয়ায়িত তুরাসিল আরাবি, খণ্ড: ৭, পৃষ্ঠা: ২২২-২২৮।

আল্লামা আলী হায়দার, দুরারুল হুক্কাম শারহু মাজাল্লাতিল আহকাম (উসমানীয় দেওয়ানি কোড), কিতাবুদ দাওয়ী, খণ্ড: ৪, ধারা: ১৬২৯-১৬৩৫।

মালেকি ফিকহ ও বিচারিক মূলনীতি: ইমাম ইবনে রুশদ আল-কুরতুবি, বিদায়াতুল মুজতাহিদ ওয়া নিহায়াতুল মুকতাসিদ, কিতাবুল আকদিয়্যাহ (باب القضاء بالبينة واليمين), কায়রো: দারুল হাদিস, খণ্ড: ৪, পৃষ্ঠা: ২৯৫-৩০২। ইবনে জুযাই আল-কালবি, আল-কাওয়ানিন আল-ফিকহিয়্যাহ, কিতাবুল কাজা ওয়াল আকদিয়্যাহ, পৃষ্ঠা: ৪৬১-৪৬৫।

শাফেয়ি ফিকহ ও সাক্ষ্য আইন: খতিব শিরবিনি (রহ.), মুগনি আল-মুহতাজ ইলা মা'রিফাতি মাআনি আলফাজিল মিনহাজ, কিতাবুল কাজা (باب الدعوى والبينات), বৈরুত: দারুল কুতুবিল ইলমিয়্যাহ, খণ্ড: ৬, পৃষ্ঠা: ৩৫০-৩৬২। ইমাম আল-শাফেয়ি, কিতাবুল উম্ম, কিতাবুল কাজা (باب اليمين على المدعى عليه), খণ্ড: ৭, পৃষ্ঠা: ৩৫-৪০।

হাম্বলি বিচার ব্যবস্থা ও ইবনে তাইমিয়াহর বিশ্লেষণ: ইমাম ইবনে কুদামা আল-মাকদিসি, আল-মুগনি, কিতাবুল কাজা (باب كيفية اليمين وما تثبت به الحقوق), কায়রো: হাজার পাবলিকেশনস, খণ্ড: ১৪, পৃষ্ঠা: ২১০-২২৫। ইমাম ইবনে কায়্যিম আল-জাওযিয়্যাহ, আত-তুরুকুল হুকমিয়াহ ফিস সিয়াসাতিশ শারিইয়াহ (ইসলামি বিচারিক কার্যপদ্ধতি), পৃষ্ঠা: ৮-১৮।

৫.২ সাক্ষীর যোগ্যতা, নির্ভরযোগ্যতা ও জেরা করার নিয়ম

ইসলামি বিচার ব্যবস্থায় মামলার রায় প্রদানের সবচেয়ে শক্তিশালী মাধ্যম হলো 'শাহাদাহ' (شهادة) বা মৌখিক সাক্ষ্য। যেহেতু একজন বিচারক ঘটনার প্রত্যক্ষদর্শী নন, তাই তাকে সাক্ষীদের বিবৃতির ওপর নির্ভর করে ফয়সালা দিতে হয়। এই কারণে ইসলামি আইনশাস্ত্রে সাক্ষীর যোগ্যতা (Competency of Witness) এবং

নির্ভরযোগ্যতা (Credibility) যাচাইয়ের জন্য অত্যন্ত নিখুঁত ও কঠোর মানদণ্ড নির্ধারণ করা হয়েছে।

কোনো ব্যক্তির সাক্ষ্য আদালতে গ্রহণযোগ্য হওয়ার জন্য তাকে কেবল প্রাপ্তবয়স্ক বা সুস্থ মস্তিস্কের হওয়াই যথেষ্ট নয়, বরং তাকে মানসিকভাবে ও সামাজিকভাবে 'আদেল' (عدل) বা ন্যায়পরায়ণ হতে হবে। সাক্ষীর এই নির্ভরযোগ্যতা গোপন ও প্রকাশ্য অনুসন্ধানের মাধ্যমে নিশ্চিত করার বিচারিক প্রক্রিয়াকে বলা হয় 'তাযকিয়াতুশ শুহুদ' (تزكية الشهود)। এর পাশাপাশি, সাক্ষ্যের সত্যতা উন্মোচন এবং কোনো প্রকার সংশয় বা সাজানো জবানবন্দি (Perjury) উদঘাটন করার জন্য বিচারকের পক্ষ থেকে সাক্ষীকে সুক্ষ্ম প্রশ্ন বা জেরা (Cross-examination) করার বিশেষ আইনি এক্তিয়ার ইসলামি কার্যবিধিতে প্রদান করা হয়েছে।

- কুরআনের আয়াত ও অনুবাদ

আদালতে সাক্ষ্য প্রদানের সময় ব্যক্তিগত বা পারিবারিক স্বার্থের ঊর্ধ্বে উঠে নিখুঁত সততা বজায় রাখা এবং সাক্ষ্য গোপন না করার ঐশ্বরিক নির্দেশ দিয়ে আল্লাহ তাআলা ইরশাদ করেন:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُونُوا قَوَّامِينَ بِالْقِسْطِ شُهَدَاءَ لِلَّهِ وَلَوْ عَلَىٰ أَنْفُسِكُمْ أَوِ الْوَالِدَيْنِ وَالْأَقْرَبِينَ

অনুবাদ: "হে মুমিনগণ! তোমরা ন্যায়ের ওপর দৃঢ়ভাবে প্রতিষ্ঠিত থাকো আল্লাহর ওয়াস্তে সাক্ষী হিসেবে; যদিও তা তোমাদের নিজেদের বিরুদ্ধে কিংবা পিতা-মাতা ও আত্মীয়-স্বজনদের বিরুদ্ধে যায়।" (সূরা আন-নিসা, আয়াত: ১৩৫)

وَلَا تَكْتُمُوا الشَّهَادَةَ ۚ وَمَنْ يَكْتُمْهَا فَإِنَّهُ آثِمٌ قَلْبُهُ

অনুবাদ: "আর তোমরা সাক্ষ্য গোপন করো না। যে ব্যক্তি তা গোপন করে, নিশ্চয়ই তার অন্তর পাপিষ্ঠ।" (সূরা আল-বাকারাহ, আয়াত: ২৮৩)

- হাদিসের মতন ও অনুবাদ

মিথ্যা সাক্ষ্যের ভয়াবহতা এবং আদালতে কোন ধরনের ব্যক্তির সাক্ষ্য অগ্রহণযোগ্য, তা সুনির্দিষ্ট করে রাসূলুল্লাহ (সা.) ইরশাদ করেছেন:

أَلَا أُنَبِّئُكُمْ بِأَكْبَرِ الْكَبَائِرِ؟ ...الْإِشْرَاكُ بِاللَّهِ، وَعُقُوقُ الْوَالِدَيْنِ، أَلَا وَقَوْلُ الزُّورِ وَشَهَادَةُ الزُّورِ

অনুবাদ: "আমি কি তোমাদের সবচেয়ে বড় কবিরা গুনাহগুলো সম্পর্কে জানাব না? ... আল্লাহর সাথে শরিক করা, পিতা-মাতার অবাধ্য হওয়া; আর শুনে রাখো—মিথ্যা বলা এবং মিথ্যা সাক্ষ্য দেওয়া।" (সহিহ বুখারি, হাদিস নং: ৫৯৭৬; সহিহ মুসলিম, হাদিস নং: ৮৭)

لَا تَجُوزُ شَهَادَةُ خَائِنٍ وَلَا خَائِنَةٍ، وَلَا زَانٍ وَلَا زَانِيَةٍ، وَلَا ذِي غِمْرٍ عَلَى أَخِيهِ

অনুবাদ: "বিশ্বাসঘাতক পুরুষ বা নারী, ব্যভিচারী পুরুষ বা নারী এবং ভাইয়ের প্রতি বিদ্বেষ পোষণকারী কোনো ব্যক্তির সাক্ষ্য (আদালতে) বৈধ নয়।" (সুনানে আবু দাউদ, হাদিস নং: ৩৬০০)

- ফিকহি মাসয়ালা ও তাত্ত্বিক বিশ্লেষণ

ইসলামি আইনশাস্ত্রে সাক্ষীর যোগ্যতা নিরূপণ, তাযকিয়াহ (নির্ভরযোগ্যতা পরীক্ষা) এবং জেরা করার নিয়মাবলী সম্পর্কে ফকিহগণ নিম্নলিখিত মাসয়ালাগুলো সুনির্দিষ্ট করেছেন:

১. সাক্ষীর অপরিহার্য যোগ্যতার শর্তাবলী (شروط أهلية الشاهد):

আদালতে সাক্ষ্য গ্রহণযোগ্য হওয়ার জন্য প্রধান শর্তগুলো হলো: ইসলাম (হুদুদ ও কিসাস মামলায় মুসলিম হওয়া আবশ্যক), বালেগ বা প্রাপ্তবয়স্ক হওয়া, আকিল বা সুস্থ বিবেকসম্পন্ন হওয়া, অন্ধ না হওয়া (দৃষ্টিশক্তির ওপর নির্ভরশীল মামলার ক্ষেত্রে) এবং 'আদালাহ' (عدالة) বা ন্যায়পরায়ণ হওয়া। ফিকহি পরিভাষায় 'আদেল' হলেন সেই ব্যক্তি, যিনি কবিরা গুনাহ থেকে বেঁচে চলেন, সগিরা গুনাহের ওপর জেদ ধরেন না এবং সমাজে সৎ ও ভদ্র মানুষ হিসেবে পরিচিত।

২. স্বার্থের দ্বন্দ্ব বা সাক্ষ্য বাতিলের কারণ (موانع قبول الشهادة):

যদি সাক্ষীর জবানবন্দির মধ্যে কোনো ব্যক্তিগত লাভ বা ক্ষতি লুকিয়ে থাকে (Conflict of Interest), তবে ফকিহদের সর্বসম্মত সিদ্ধান্ত অনুযায়ী সেই সাক্ষ্য বাতিল হয়ে যাবে। এই নিয়মে—সন্তানের পক্ষে পিতা-মাতার সাক্ষ্য, পিতা-মাতার পক্ষে সন্তানের সাক্ষ্য এবং স্ত্রীর পক্ষে স্বামীর বা স্বামীর পক্ষে স্ত্রীর সাক্ষ্য আদালতে গ্রহণযোগ্য নয়। একইভাবে, নিজের চরম শত্রুর বিরুদ্ধে কোনো ব্যক্তির সাক্ষ্য গ্রহণ করা হবে না।

৩. তাযকিয়াহ ও বিচারকের জেরা করার পদ্ধতি (تزكية الشهود ومناقشة الشهادة):
বাদী যখন কোনো সাক্ষী হাজির করে, তখন বিবাদী যদি সাক্ষীকে মিথ্যাবাদী বা 'ফাসেক' বলে দাবি করে, তবে বিচারক সরাসরি রায় দেবেন না। তিনি 'মুযাক্কি' (গোপন তদন্ত কর্মকর্তা বা সমাজনেতা)-এর মাধ্যমে সাক্ষীর অতীত জীবন ও সততা যাচাই করবেন। একে 'তাযকিয়াহ' বলা হয়।
তদন্তে সাক্ষী যোগ্য প্রমাণিত হলে, জবানবন্দির সত্যতা যাচাইয়ের জন্য বিচারক সাক্ষীদের জেরা করবেন। ফিকহি নিয়ম হলো—বিচারক সাক্ষীদের আলাদা আলাদা কামরায় বা পৃথকভাবে ডেকে জেরা করবেন (فصل الشهود), যাতে তারা একে অপরের জবানবন্দি শুনতে না পারে। বিচারক তাদের ঘটনার সময়, স্থান, পারিপার্শ্বিক অবস্থা এবং সুনির্দিষ্ট বিবরণ নিয়ে সূক্ষ্ম প্রশ্ন করবেন। যদি তাদের বর্ণনায় কোনো বৈপরীত্য (Contradiction) ধরা পড়ে, তবে সেই সাক্ষ্য বাতিল বলে গণ্য হবে।

- একাডেমিক রেফারেন্স (উৎস গ্রন্থসমূহ)

হানাফি ফিকহ ও ওছমানীয় আইনি: ইমাম আলাউদ্দীন আল-কাসানি (রহ.), বাদায়েউস সানায়ে ফি তারতিবিশ শারায়ে, কিতাবুষ শাহাদাত (فصل في بيان شروط قبول الشهادة), বৈরুত: দারু ইহইয়ায়িত তুরাসিল আরাবি, খণ্ড: ৭, পৃষ্ঠা: ৪৬-৫৮। আল্লামা আলী হায়দার, দুরারুল হুক্কাম শারহু মাজাল্লাতিল আহকাম, কিতাবুষ শাহাদাত (সাক্ষীর যোগ্যতা ও তাযকিয়াহ সংক্রান্ত ধারা), খণ্ড: ৪, ধারা: ১৬৮৪-১৭০৫।
মালেকি ফিকহ ও বিচারিক কার্যবিধি: ইমাম ইবনে রুশদ আল-কুরতুবি, বিদায়াতুল মুজতাহিদ ওয়া নিহায়াতুল মুকতাসিদ, কিতাবুল আকদিয়্যাহ (القول فيمن تجوز شهادته ومن لا تجوز), কায়রো: দারুল হাদিস, খণ্ড: ৪, পৃষ্ঠা: ৩০৫-৩১২। ইবনে জুযাই আল-কালবি, আল-কাওয়ানিন আল-ফিকহিয়্যাহ, কিতাবুল কাজা, পৃষ্ঠা: ৪৬৫-৪৬৮।
শাফেয়ি ফিকহ ও সাক্ষ্য আইন: খতিব শিরবিনি (রহ.), মুগনি আল-মুহতাজ ইলা মা'রিফাতি মাআনি আলফাজিল মিনহাজ, কিতাবুষ শাহাদাত (باب شروط الشاهد أحكام التذكية), বৈরুত: দারুল কুতুবিল ইলমিয়্যাহ, খণ্ড: ৬, পৃষ্ঠা: ৪১৫-৪৩০। ইমাম আল-শাফেয়ি, কিতাবুল উম্ম, কিতাবুষ শাহাদাত (باب عدد الشهود وتفريقهم), খণ্ড: ৭, পৃষ্ঠা: ৬০-৬৫।
হাম্বলি বিচার ব্যবস্থা ও ইবনে কায়্যিমের অপরাধ বিজ্ঞান: ইমাম ইবনে কুদামা আল-মাকদিসি, আল-মুগনি, কিতাবুষ শাহাদাত (باب ما ترد به الشهادة من الموانع), কায়রো:

হাজার পাবলিকেশনস, খণ্ড: ১৪, পৃষ্ঠা: ১৫০-১৬৮। ইমাম ইবনে কায়্যিম আল-জাওযিয়্যাহ, আত-তুরুকুল হুকমিয়াহ ফিস সিয়াসাতিশ শারিইয়াহ (অধ্যায়: تفريق الشهود والتحقيق - সাক্ষীদের পৃথকীকরণ ও জেরা পদ্ধতি), পৃষ্ঠা: ৪২-৫২।

৫.৩ পরিস্থিতিগত প্রমাণ এবং আধুনিক ফরেনসিক বিজ্ঞানের গ্রহণযোগ্যতা

ইসলামি বিচার ব্যবস্থায় মামলার সত্যতা উন্মোচনে মৌখিক সাক্ষ্য (শাহাদাহ) এবং অপরাধীর আত্মস্বীকৃতির (ইক্বরার) পাশাপাশি পরিস্থিতিগত প্রমাণ বা আলামত অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। ইসলামি আইনশাস্ত্রে একে 'কারাইন' (قرائن - একবচনে قرينة 'কারীনাহ') বলা হয়। কারীনাহ হলো এমন কোনো দৃশ্যমান পরিস্থিতি, বস্তুগত আলামত বা পারিপার্শ্বিক অবস্থা, যা কোনো ঘটনা বা অপরাধের দিকে সুনির্দিষ্ট ও যৌক্তিক ইঙ্গিত করে।

আধুনিক বিচার ব্যবস্থায় ডিএনএ টেস্ট (DNA Profiling), আঙুলের ছাপ (Fingerprints), ডিজিটাল ফরেনসিক (CCTV বা অডিও-ভিডিও রেকর্ড), ময়নাতদন্ত (Autopsy) এবং অন্যান্য বৈজ্ঞানিক পরীক্ষাগার রিপোর্টকে যেভাবে 'Circumstantial Evidence' বা 'Forensic Evidence' হিসেবে গণ্য করা হয়, ইসলামি ফিকহের আলোকে সেগুলোর একটি সুনির্দিষ্ট ও পদ্ধতিগত গ্রহণযোগ্যতা রয়েছে। সমসাময়িক ফকিহদের সর্বসম্মত সিদ্ধান্ত অনুযায়ী, আধুনিক ফরেনসিক বিজ্ঞান মূলত ইসলামি আইনের ক্লাসিক্যাল 'কারীনাহ ক্বাতইইয়াহ' (অকাট্য আলামত)-এরই একটি উন্নত ও আধুনিক রূপ। তবে হুদুদ ও কিসাসের মতো সংবেদনশীল ক্ষেত্রে যেখানে সামান্যতম সন্দেহেও শাস্তি মওকুফ হয়ে যায়, সেখানে ফরেনসিক প্রমাণের একক ব্যবহারের ক্ষেত্রে ফকিহগণ কিছু আইনি সতর্কতা ও সুরক্ষাকবচ নির্ধারণ করেছেন।

- কুরআনের আয়াত ও অনুবাদ

পবিত্র কুরআনে ইউসুফ (আ.)-এর ঐতিহাসিক ঘটনায় পারিপার্শ্বিক বা পরিস্থিতিগত প্রমাণের মাধ্যমে একজন বিচারক বা সালিশকারী কীভাবে সত্য উদঘাটন করেছিলেন, তার চমৎকার আইনি দৃষ্টান্ত উল্লেখ করে আল্লাহ তাআলা ইরশাদ করেন:

وَشَهِدَ شَاهِدٌ مِنْ أَهْلِهَا إِنْ كَانَ قَمِيصُهُ قُدَّ مِنْ قُبُلٍ فَصَدَقَتْ وَهُوَ مِنَ الْكَاذِبِينَ *وَإِنْ كَانَ قَمِيصُهُ قُدَّ مِنْ دُبُرٍ فَكَذَبَتْ وَهُوَ مِنَ الصَّادِقِينَ *فَلَمَّا رَأَىٰ قَمِيصَهُ قُدَّ مِنْ دُبُرٍ قَالَ إِنَّهُ مِنْ كَيْدِكُنَّ

অনুবাদ: "এবং নারীর পরিবারের একজন সাক্ষী সাক্ষ্য দিল: 'যদি তার (ইউসুফের) জামা সামনের দিক থেকে ছেঁড়া হয়ে থাকে, তবে নারী সত্য বলেছে এবং সে মিথ্যাবাদীদের অন্তর্ভুক্ত। আর যদি তার জামা পেছনের দিক থেকে ছেঁড়া হয়ে থাকে, তবে নারী মিথ্যা বলেছে এবং সে সত্যবাদীদের অন্তর্ভুক্ত।' অতঃপর গৃহস্বামী যখন দেখল যে তার জামা পেছনের দিক থেকে ছেঁড়া, তখন সে বলল—নিশ্চয়ই এটি তোমাদের নারীদের ছলনা।" (সূরা ইউসুফ, আয়াত: ২৬-২৮)

আল্লামা কুরতুবিসহ মুফাসসিরগণ বলেন, জামা পেছনের দিক থেকে ছেঁড়া থাকাটা ছিল একটি অকাট্য পরিস্থিতিগত প্রমাণ বা কারীনাহ, যা প্রমাণ করে যে ইউসুফ (আ.) পালাচ্ছিলেন এবং নারী পেছন থেকে তাকে টেনে ধরেছিল।

- হাদিসের মতন ও অনুবাদ

মানুষের শারীরিক গঠন, বংশগত সাদৃশ্য বা বিশেষজ্ঞের মতামত (Expert Opinion) গ্রহণ করে রাসূলুল্লাহ (সা.) কীভাবে পরিস্থিতিগত আলামতের ভিত্তিতে ফয়সালা দিয়েছিলেন, তা বুখারি ও মুসলিমের এই হাদিস দ্বারা প্রমাণিত:

عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا قَالَتْ :دَخَلَ عَلَيَّ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ذَاتَ يَوْمٍ مَسْرُورًا، فَقَالَ :يَا عَائِشَةُ، أَلَمْ تَرَيْ أَنَّ مُجَزِّزًا الْمُدْلِجِيَّ دَخَلَ عَلَيَّ فَرَأَى أُسَامَةَ بْنَ زَيْدٍ وَزَيْدًا وَعَلَيْهِمَا قَطِيفَةٌ، قَدْ غَطَّيَا رُءُوسَهُمَا وَبَدَتْ أَقْدَامُهُمَا، فَقَالَ :إِنَّ هَذِهِ الْأَقْدَامَ بَعْضُهَا مِنْ بَعْضٍ

অনুবাদ: "হযরত আয়েশা (রা.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, একদিন রাসূলুল্লাহ (সা.) অত্যন্ত আনন্দিত হয়ে আমার ঘরে প্রবেশ করলেন এবং বললেন, 'হে আয়েশা! তুমি কি দেখনি যে, মুজাজ্জিয আল-মুদলিজি (যিনি পদচিহ্ন ও শারীরিক গঠন দেখে বংশ নির্ধারণে বিশেষজ্ঞ ছিলেন) আমার এখানে এসেছিলেন? তিনি উসামা বিন যাইদ এবং যাইদ (রা.)-কে একটি চাদর মুড়ি দিয়ে ঘুমাতে দেখলেন, যার ফলে তাদের মাথা ঢাকা

ছিল কিন্তু পা দুটি বের হয়েছিল। তখন তিনি (পা দেখে) বললেন—নিশ্চয়ই এই পাগুলো একটি অপরটি থেকে (অর্থাৎ তারা পরস্পর পিতা ও পুত্র)।" (সহিহ বুখারি, হাদিস নং: ৬৭৭১; সহিহ মুসলিম, হাদিস নং: ১৪৫৯)

প্রাচীন আরবের 'ক্বিয়াফাহ' বা অবয়ব তত্ত্বের এই স্বীকৃতি প্রমাণ করে যে, অপরাধ বা সত্য প্রমাণের জন্য আধুনিক ডিএনএ বা ফরেনসিকের মতো বিশেষজ্ঞ প্যানেলের রিপোর্টের আইনি ভিত্তি ইসলামে স্বীকৃত।

- ফিকহি মাসয়ালা ও তাত্ত্বিক বিশ্লেষণ

ইসলামি আইনশাস্ত্রে পরিস্থিতিগত প্রমাণ ও আধুনিক ফরেনসিক বিজ্ঞানের আইনি গ্রহণযোগ্যতার স্তরবিন্যাস সম্পর্কে ফকিহগণ নিম্নলিখিত মাসয়ালাগুলো সুনির্দিষ্ট করেছেন:

১. কারাইন বা আলামতের প্রকারভেদ (أقسام القرائن الحجية):

ফকিহগণ পারিপার্শ্বিক প্রমাণকে তিন ভাগে ভাগ করেছেন:

ক. ক্বারীনাহ ক্বাতইইয়াহ (القرينة القطعية): অকাট্য আলামত, যা শতভাগ নিশ্চিত করে। যেমন: নিভৃত কক্ষে দুজন ব্যক্তির একজন রক্তাক্ত ছুরি হাতে দাঁড়িয়ে আছে এবং অন্যজন মাটিতে জবাই করা অবস্থায় ছটফট করছে। এখানে ছুরি হাতে থাকা ব্যক্তিই খুনি—এটি একটি অকাট্য আলামত।

খ. ক্বারীনাহ জাহিরহ (القرينة الظاهرة): প্রবল ধারণা সৃষ্টিকারী আলামত। যেমন: কারো ঘর থেকে চুরির মালামাল উদ্ধার হওয়া।

গ. ক্বারীনাহ দয়ীফাহ (القرينة الضعيفة): দুর্বল আলামত, যা সন্দেহের অবকাশ রাখে। যেমন: চুরির ঘটনাস্থলে শুধু কারো উপস্থিত থাকা।

২. আধুনিক ফরেনসিক আলামতের আইনি মানদণ্ড (التحقيق الجنائي الحديث):

সমসাময়িক ফিকহ একাডেমিগুলোর (যেমন: ওআইসি ইসলামি ফিকহ একাডেমি) সিদ্ধান্ত অনুযায়ী, নিখুঁত ল্যাবরেটরিতে পরীক্ষিত আঙুলের ছাপ (Fingerprint), অকাট্য সিসিটিভি ফুটেজ এবং ডিএনএ প্রোফাইলিং (DNA) 'ক্বারীনাহ ক্বাতইইয়াহ' বা প্রবল ধারণার (গলাবাতুজ জান্ন) অন্তর্ভুক্ত। দেওয়ানি মামলা, পিতৃত্ব বা বংশধারা নির্ধারণ

(Establishment of Lineage) এবং তা'যির (রাষ্ট্রীয় সাধারণ শাস্তি) মূলক মামলায় ফরেনসিক রিপোর্ট একক প্রমাণ হিসেবে রায় প্রদানের জন্য সম্পূর্ণ বৈধ।

৩. হুদুদ ও কিসাস মামলায় ফরেনসিকের সীমাবদ্ধতা (موانع تطبيق الحدود بالقرائن):
ফৌজদারি আইনের একটি সুবর্ণ ফিকহি মূলনীতি হলো: "সন্দেহের কারণে হুদুদ শাস্তি বাতিল হয়ে যায়" (تدرأ الحدود بالشبهات)। যেহেতু ফরেনসিক বিজ্ঞান বা ল্যাব রিপোর্টের পেছনে মানবীয় ভুল (Human Error), নমুনা পরিবর্তন (Sample Tampering) বা জালিয়াতির (Cyber Manipulation) একটি তাত্ত্বিক সম্ভাবনা বা সংশয় থেকে যায়, তাই ফকিহদের সর্বসম্মত সিদ্ধান্ত হলো—কেবলমাত্র ফরেনসিক রিপোর্টের ওপর ভিত্তি করে কারো হাত কাটা (চুরির হদ) বা মৃত্যুদণ্ড (হত্যার কিসাস) দেওয়া যাবে না, যদি না সেখানে সুনির্দিষ্ট সাক্ষী বা স্বীকারোক্তি থাকে। তবে এই ফরেনসিক প্রমাণকে তা'যির বা যাবজ্জীবন কারাদণ্ডের মতো বিকল্প শাস্তির জন্য নিখুঁত ভিত্তি হিসেবে ব্যবহার করা যাবে।

- একাডেমিক রেফারেন্স (উৎস গ্রন্থসমূহ)

ক্লাসিক্যাল বিচারিক পদ্ধতি ও আলামত তত্ত্ব: ইমাম ইবনে কায়্যিম আল-জাওযিয়্যাহ (রহ.), অত্ব-তুরুকুল হুকমিয়াহ ফিস সিয়াসাতিশ শারিইয়াহ (القرائن وعلامات الحُكم), কায়রো: দারুল হাদিস, খণ্ড: ১, পৃষ্ঠা: ২-১৫ এবং পৃষ্ঠা: ৩৩-৪৫। শিহাবুলদ্দীন আল-কারাফী (রহ.), আল-ফুরূক (أنوار البروق), খণ্ড: ৪, পৃষ্ঠা: ৮২-৮৫ (الفرق بين القرينة والدليل)।
হানাফি ফিকহ ও উসমানীয় আইনি কোড: আল্লামা আলী হায়দার, দুরারুল হুক্কাম শারহু মাজাল্লাতিল আহকাম, কিতাবুল কাজা (আলামত ও প্রমাণের পরিচ্ছেদ), খণ্ড: ৪, ধারা: ১৭৪০-১৭৪৫। ইবনু আবিল ইযয আল-হানাফি, আল-ইত্তিবা', পৃষ্ঠা: ৬৫-৭০।
সমসাময়িক ফিকহ ও ফরেনসিক বিজ্ঞান (Contemporary Islamic Law): মাজাল্লাত আল-মাজমা আল-ফিকহ আল-ইসলামি (OIC Islamic Figh Academy Journal), জেদ্দা, রেজোলিউশন নং: ১৬, খণ্ড: ১০, পৃষ্ঠা: ৩১৫-৩৫০ (موضوع: البصمة الوراثية والتحقيق الجنائي - ডিএনএ এবং অপরাধ তদন্ত)। ড. ওয়াহবাহ আল-জুহাইলি, আল-ফিকহুল ইসলামি ওয়া আদিল্লাতুহু, দামেস্ক: দারুল ফিকর, খণ্ড: ৮, পৃষ্ঠা: ৬০১৬-৬০২২ (القرائن المعاصرة)।

৫.৪ বিচারকের রায় ও ডিক্রি: প্রকারভেদ এবং পুনর্বিবেচনার নিয়ম

ইসলামি বিচার ব্যবস্থায় মামলার সমস্ত কার্যবিধি, সাক্ষ্য-প্রমাণ এবং সওয়াল-জবাব শেষে বিচারকের আইনি সিদ্ধান্ত বা চূড়ান্ত ফয়সালাকে 'হুকুম' (حكم) বা 'কাজা' (قضاء) বলা হয়। কাজা হলো শরিয়তের কোনো সাধারণ বিধানকে কোনো সুনির্দিষ্ট ব্যক্তি বা বিরোধপূর্ণ বিষয়ের ওপর বাধ্যতামূলকভাবে প্রয়োগ করা। বিচারকের এই রায়ের মাধ্যমে দীর্ঘদিনের বিরোধের চূড়ান্ত নিষ্পত্তি ঘটে এবং উভয় পক্ষ আইনিভাবে এই রায় মেনে নিতে বাধ্য থাকে।

ইসলামি বিচারিক দর্শনে বিচারকের রায়কে প্রধানত দুটি দৃষ্টিকোণ থেকে ভাগ করা হয়: দেওয়ানি অধিকার পুনরুজ্জীবনের ডিক্রি এবং ফৌজদারি দণ্ড কার্যকর করার রায়। তবে ইসলামে বিচারকের রায়ই শেষ কথা নয়; যদি রায় প্রদানের পর প্রমাণিত হয় যে বিচারক স্পষ্ট আইনি ভুল করেছেন বা কোনো জালিয়াতির ওপর ভিত্তি করে রায় হয়েছে, তবে তা পুনর্বিবেচনা (Judicial Review) এবং বাতিল করার সুনির্দিষ্ট বিধান রয়েছে। ইসলামি বিচার ব্যবস্থায় উচ্চ আদালত বা আপিল বিভাগের সমতুল্য প্রতিষ্ঠানকে বলা হতো 'দিওয়ানুল মাযালিম' (ديوان المظالم), যেখানে বিচারকদের রায়ের বিরুদ্ধে আপিল করা এবং তা সংশোধন করার আইনি এক্তিয়ার ছিল।

- কুরআনের আয়াত ও অনুবাদ

আদালতে বা রাষ্ট্রীয় ফয়সালা প্রদানের সময় যেকোনো প্রকার প্রবৃত্তির অনুসারী না হয়ে নিখুঁতভাবে ঐশ্বরিক বিধান ও ইনসাফের ভিত্তিতে রায় দেওয়ার নির্দেশ দিয়ে আল্লাহ তাআলা ইরশাদ করেন:

يَا دَاوُودُ إِنَّا جَعَلْنَاكَ خَلِيفَةً فِي الْأَرْضِ فَاحْكُمْ بَيْنَ النَّاسِ بِالْحَقِّ وَلَا تَتَّبِعِ الْهَوَىٰ فَيُضِلَّكَ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ

অনুবাদ: "হে দাউদ! আমি তোমাকে জমিনে খলিফা (প্রতিনিধি) বানিয়েছি; সুতরাং তুমি মানুষের মধ্যে ন্যায়ের সাথে ফয়সালা করো এবং প্রবৃত্তির অনুসরণ করো না, অন্যথায় তা তোমাকে আল্লাহর পথ থেকে বিচ্যুত করে দেবে।" (সূরা সোয়াদ, আয়াত: ২৬)

وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ

অনুবাদ: "আর তোমরা যখন মানুষের মধ্যে বিচার বা ফয়সালা করবে, তখন ন্যায়ের সাথে ফয়সালা করবে।" (সূরা আন-নিসা, আয়াত: ৫৮)

- হাদিসের মতন ও অনুবাদ

বিচারকের ভুল রায় কীভাবে সংশোধনের যোগ্য এবং বিচারিক ইজতিহাদের ক্ষেত্রে খাতা বা ভুলের আইনি অবস্থান কী, তা স্পষ্ট করে রাসূলুল্লাহ (সা.) ইরশাদ করেছেন:

إِذَا حَكَمَ الْحَاكِمُ فَاجْتَهَدَ ثُمَّ أَصَابَ فَلَهُ أَجْرَانِ، وَإِذَا حَكَمَ فَاجْتَهَدَ ثُمَّ أَخْطَأَ فَلَهُ أَجْرٌ

অনুবাদ: "বিচারক যখন বিচার করার সময় নিজের সর্বোচ্চ যোগ্যতা দিয়ে ইজতিহাদ (গবেষণা) করে এবং তার রায় সঠিক হয়, তবে তার জন্য রয়েছে দ্বিগুণ সওয়াব। আর যদি সে ইজতিহাদ করে ফয়সালা দেয় এবং তার রায় ভুল হয়, তবে তার জন্য রয়েছে একটি সওয়াব (তার এই ভুল ক্ষমার যোগ্য, তবে ভুল প্রমাণিত হলে রায় সংশোধন করতে হবে)।" (সহিহ বুখারি, হাদিস নং: ৭৩৫২; সহিহ মুসলিম, হাদিস নং: ১৭১৯)

إِنَّمَا أَنَا بَشَرٌ، وَإِنَّكُمْ تَخْتَصِمُونَ إِلَيَّ، وَلَعَلَّ بَعْضَكُمْ أَنْ يَكُونَ أَلْحَنَ بِحُجَّتِهِ مِنْ بَعْضٍ، فَأَقْضِيَ لَهُ عَلَى نَحْوِ مَا أَسْمَعُ، فَمَنْ قَضَيْتُ لَهُ مِنْ حَقِّ أَخِيهِ شَيْئًا فَلَا يَأْخُذْهُ، فَإِنَّمَا أَقْطَعُ لَهُ قِطْعَةً مِنَ النَّارِ

অনুবাদ: "আমি তো কেবল একজন মানুষ। তোমরা আমার কাছে বিবাদ নিয়ে আসো। হতে পারে তোমাদের কেউ অপর পক্ষের চেয়ে বেশি বাকপটু ও যুক্তিবাদী, যার ফলে আমি তার কথা শুনেই (বাহ্যিক প্রমাণের ভিত্তিতে) তার পক্ষে ফয়সালা দিয়ে দিই। তবে মনে রেখো, (আমার রায়ের কারণে) আমি যদি কাউকে তার ভাইয়ের হকের কোনো অংশ দিয়ে দিই, সে যেন তা গ্রহণ না করে; কারণ (বাস্তবে মিথ্যা হলে) আমি তাকে জাহান্নামের একটি টুকরো কেটে দিচ্ছি।" (সহিহ বুখারি, হাদিস নং: ২৬৮০; সহিহ মুসলিম, হাদিস নং: ১৭১৩)

- ফিকহি মাসয়ালা ও তাত্ত্বিক বিশ্লেষণ

ইসলামি আইনশাস্ত্রে বিচারকের রায়ের প্রকারভেদ এবং তা পুনর্বিবেচনা বা আপিলের আইনি নিয়মাবলী ও ডিক্রি সম্পর্কে ফকিহগণ নিম্নলিখিত মাসয়ালাগুলো সুনির্দিষ্ট করেছেন:

১. রায়ের অপরিহার্য উপাদানসমূহ (أركان الحكم):

হানাফি ফিকহের প্রামাণ্য গ্রন্থ এবং উসমানীয় সিভিল কোড বা মাজাল্লা (مجلة الأحكام العدلية)-এর কিতাবুল কাজা অংশ অনুযায়ী, একটি বৈধ রায়ে চারটি উপাদান থাকা আবশ্যক:

ক. আল-হাকিম (الحاكم): শরীআতসম্মতভাবে নিযুক্ত কাজী বা বিচারক।

খ. আল-মহকুমু আলাইহি (المحكوم عليه): যার বিরুদ্ধে বা বিপক্ষে রায় দেওয়া হচ্ছে (বিবাদী)।

গ. আল-মহকুমু লাহু (المحكوم له): যার পক্ষে বা অনুকূলে রায় দেওয়া হচ্ছে (বাদী)।

ঘ. আল-মহকুমু বিহি (المحكوم به): রায়ের মূল বিষয়বস্তু বা ডিক্রি (যেমন: সম্পত্তি বুঝিয়ে দেওয়া বা দণ্ড কার্যকর করা)।

২. রায়ের প্রকারভেদ (أنواع الأحكام القضائية):

বিচারকের ফয়সালাকে প্রধানত দুই ভাগে বিন্যস্ত করা হয়:

ক. আল-হুকমু আল-ইলযামি (الحكم الإلزامي): এটি চূড়ান্ত ডিক্রি বা শাস্তির আদেশ, যা রাষ্ট্রের নির্বাহী বিভাগের মাধ্যমে বাধ্যতামূলকভাবে বাস্তবায়ন করা হয়। যেমন: অপরাধীর কারাদণ্ড বা ঋণী ব্যক্তির সম্পদ ক্রোকের নির্দেশ।

খ. আল-হুকমু আল-ইসহাক্বি (الحكم الإسقاطي): এটি কোনো দাবি বা অধিকার থেকে কাউকে মুক্ত ঘোষণা করার রায়। যেমন: বাদী প্রমাণ দিতে না পারায় বিবাদীকে নির্দোষ ঘোষণা করে মামলা থেকে খালাস দেওয়া।

৩. রায় পুনর্বিবেচনা বা আপিলের শর্তাবলী (نقض الحكم إعادة النظر):

ইসলামি আইনের সুবর্ণ নিয়ম হলো—একবার রায় হয়ে গেলেই তা চিরন্তন বা অপরিবর্তনশীল নয়। ফকিহদের সর্বসম্মত সিদ্ধান্ত অনুযায়ী, নিম্নলিখিত তিনটি কারণে বিচারকের রায় সরাসরি বাতিল (Null and Void) হয়ে যাবে এবং তা পুনর্বিবেচনা করা ওয়াজিব:

ক. যদি রায়টি পবিত্র কুরআনের স্পষ্ট নাস (Text), সুপ্রসিদ্ধ সুন্নাহ বা ইজমার (Consensus) সরাসরি পরিপন্থী হয়।

খ. যদি প্রমাণিত হয় যে, যে সাক্ষ্য বা দলিলের ভিত্তিতে রায় দেওয়া হয়েছিল, তা জাল বা মিথ্যা ছিল (Perjury)।

গ. যদি বিচারক নিজে স্বীকার করেন যে তিনি রায় দেওয়ার সময় অসতর্কতাবশত বাস্তব তথ্য বা গুরুত্বপূর্ণ ফিকহি মূলনীতি এড়িয়ে গেছেন।

৬. দিওয়ানুল মাযালিম বা উচ্চ আদালতের এক্তিয়ার (اختصاص ديوان المظالم):
হানাফি ও মালেকি ফিকহের পরিভাষায়, কোনো সাধারণ বিচারক (কাযী) যদি ক্ষমতার অপব্যবহার করেন বা ভুল রায় দেন, তবে রাষ্ট্রের প্রধান বা তার নিযুক্ত বিশেষ উচ্চ আদালত (দিওয়ানুল মাযালিম) সেই রায়ের ওপর নিষেধাজ্ঞা জারি করতে পারে।
খলিফা ওমর ইবনুল খাত্তাব (রা.) ক্বাযী আবু মুসা আল-আশআরি (রা.)-এর কাছে লেখা তাঁর বিখ্যাত আইনি চিঠিতে (رسالة عمر في القضاء) পরিষ্কার বলেছিলেন: "গতকাল তুমি একটি ফয়সালা দিয়েছ, কিন্তু আজ পুনরায় চিন্তা করে যদি দেখ যে তোমার রায়টি ভুল ছিল, তবে সত্যের দিকে ফিরে আসতে সেই পূর্ববর্তী রায় তোমাকে যেন বাধা না দেয়; কারণ সত্যের মর্যাদা সর্বদা সর্বোচ্চে।"
৫. ডিক্রি বা রায় কার্যকর করার বাধ্যবাধকতা (إلزامية الحكم):
কাজীর রায় মুখে উচ্চারিত বা লিখিত আকারে জারির সাথে সাথেই তা 'নাফেয' বা চূড়ান্তভাবে বলবৎ হয়ে যায়। *মাজাল্লা*-র **১৮০১ নম্বর ধারা** অনুযায়ী, "বিচারকের রায়ের পর কোনো পক্ষেরই তা অমান্য করার বা নতুন করে বিতর্ক তোলার সুযোগ নেই।" রাষ্ট্র এই ডিক্রি বলবৎ করতে নিজস্ব শক্তি বা পুলিশ বাহিনী ব্যবহার করতে বাধ্য।

- একাডেমিক রেফারেন্স (উৎস গ্রন্থসমূহ)

হানাফি ফিকহ ও উসমানীয় বিচারিক ধারা: ইমাম আলাউদ্দীন আল-কাসani (রহ.), বাদায়েউস সানায়ে ফি তারতিবিশ শারায়ে, কিতাবুল কাজা (فصل في بيان ما ينقض من الأحكام), বৈরুত: দারু ইহইয়ায়িত তুরাসিল আরাবি, খণ্ড: 7, পৃষ্ঠা: ২৪০-২৪৮।
আল্লামা আলী হায়দার, দুরারুল হুক্কাম শারহু মাজাল্লাতিল আহকাম, কিতাবুল কাজা (রায়ের কার্যকারিতা ও বাতিলের ধারা), খণ্ড: ৪, ধারা: ১৭৮৪-১৭৯২।
মালেকি ফিকহ ও কর্ডোভার বিচারিক ইতিহাস: ইমাম ইবনে রুশদ আল-কুরতুবি, বিদায়াতুল মুজতাহিদ ওয়া নিহায়াতুল মুকতাসিদ, কিতাবুল আকদিয়্যাহ (احكام قضايا القاضي ونقضها), কায়রো: দারুল হাদিস, খণ্ড: ৪, পৃষ্ঠা: ৩১৫-৩২২। ইবনে ফারহুন আল-মালেকি, তাবসিরাতুল হুক্কাম ফি উসুলিল আকদিয়্যাহ ওয়া মানাহিজিল আহকাম, খণ্ড: ১, পৃষ্ঠা: ৪২-৫২ (موضوع: نقض أحكام الجور والخطأ)।
শাফেয়ি ফিকহ ও উচ্চ আদালত তত্ত্ব: খতিব শিরবিনি (রহ.), মুগনি আল-মুহতাজ ইলা মা'রিফাতি মাআনি আলফাজিল মিনহাজ, কিতাবুল কাজা (فصل في نقض الحكم)، বৈরুত: দারুল কুতুবিল ইলমিয়্যাহ, খণ্ড: ৬, পৃষ্ঠা: ৩৭৫-৩৮৫। ইমাম আল-মাওয়ার্দি,

আল-আহকামুস সুলতানিয়্যাহ ওয়াল উইলায়াতুদ দ্বীনিয়্যাহ (রাষ্ট্রীয় শাসন ও বিচার নীতি), অধ্যায়: দিওয়ানুল মাযালিম, পৃষ্ঠা: ৯৫-১০৮।
হাম্বলি বিচার ব্যবস্থা ও ওমর (রা.)-এর আইনি পত্রের ব্যাখ্যা: ইমাম ইবনে কুদামা আল-মাকদিসি, আল-মুগনি, কিতাবুল কাজা (باب رجوع القاضي عن حكمه), কায়রো: হাজার পাবলিকেশনস, খণ্ড: ১৪, পৃষ্ঠা: ২৮০-২৯৫। ইমাম ইবনে কায়্যিম আল-জাওযিয়্যাহ, ই'লামুল মুয়াক্কিঈন আন রাব্বিল আলামিন (ওমর রা.-এর বিচারিক পত্রের আইনি ব্যাখ্যা), বৈরুত: দারুল জিল, খণ্ড: ১, পৃষ্ঠা: ৮৫-১১০।

৫.৫ বিচার প্রক্রিয়ায় আইনজীবীর ভূমিকা ও ইসলামি ফিকহে এর বৈধতা

আধুনিক বিচার ব্যবস্থায় একজন আইনজীবী (Advocate/Legal Practitioner) যেভাবে মক্কেলের পক্ষে আদালতে আইনি লড়াই পরিচালনা করেন, ইসলামি বিচার ব্যবস্থায় তার একটি প্রাচীন, সমৃদ্ধ এবং সুনির্দিষ্ট আইনি ভিত্তি রয়েছে। ইসলামি পরিভাষায় একে বলা হয় 'আল-ওকালাহ বিল খুসূমাহ' (الوكالة بالخصومة) বা মামলা পরিচালনায় প্রতিনিধিত্ব।

ইসলামি বিচারিক দর্শনে আদালত বা কাজীর সামনে নিজের বক্তব্য সঠিকভাবে উপস্থাপন করা, প্রমাণের আইনি জটিলতা ব্যাখ্যা করা এবং হকের সপক্ষে যুক্তি দেওয়া সবার পক্ষে সমানভাবে সম্ভব হয় না। এই বাস্তবতাকে স্বীকার করে ইসলামি ফিকহ মজলিসে কাযা বা আদালতে নিজের পক্ষে কোনো বিজ্ঞ ও বিশ্বস্ত ব্যক্তিকে প্রতিনিধি বা আইনজীবী হিসেবে নিয়োগ দেওয়ার পূর্ণ অধিকার দিয়েছে। তবে আধুনিক আইন পেশার সাথে ইসলামি ফিকহের মৌলিক পার্থক্য হলো—ইসলামে একজন আইনজীবীর মূল দায়িত্ব কেবল তার মক্কেলকে জেতানো নয়, বরং আদালতকে সত্য ও ইনসাফ প্রতিষ্ঠায় 'সহায়তা' করা। যদি কোনো আইনজীবী নিশ্চিত হন যে তার মক্কেল বাস্তবে অপরাধী বা অন্যায়কারী, তবে তার পক্ষে জালিয়াতি বা মিথ্যা যুক্তির আশ্রয় নিয়ে মামলা লড়া ইসলামি শরীয়তে সম্পূর্ণ হারাম বা নিষিদ্ধ।

- কুরআনের আয়াত ও অনুবাদ

আদালতে বা যেকোনো সালিশে কোনো অন্যায়কারী, খিয়ানতকারী বা অপরাধীর পক্ষে ওকালতি বা আইনি লড়াই না করার কঠোর নির্দেশ দিয়ে আল্লাহ তাআলা ইরশাদ করেন:

إِنَّا أَنْزَلْنَا إِلَيْكَ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ لِتَحْكُمَ بَيْنَ النَّاسِ بِمَا أَرَاكَ اللَّهُ ۚ وَلَا تَكُنْ لِلْخَائِنِينَ خَصِيمًا

অনুবাদ: "নিশ্চয়ই আমি আপনার প্রতি সত্যসহ কিতাব নাজিল করেছি, যাতে আপনি মানুষের মধ্যে ফয়সালা করেন যা আল্লাহ আপনাকে দেখিয়েছেন। সুতরাং আপনি খিয়ানতকারী (অপরাধী)-দের পক্ষে বিতর্ককারী বা আইনজীবী হবেন না।" (সূরা আন-নিসা, আয়াত: ১০৫)

هَا أَنْتُمْ هَٰؤُلَاءِ جَادَلْتُمْ عَنْهُمْ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا فَمَنْ يُجَادِلُ اللَّهَ عَنْهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَمْ مَنْ يَكُونُ عَلَيْهِمْ وَكِيلًا

অনুবাদ: "শোন! তোমরাই তো তারা, যারা দুনিয়ার জীবনে তাদের (অপরাধীদের) পক্ষে বিতর্ক (ওকালতি) করেছ; কিন্তু কিয়ামতের দিন আল্লাহর সামনে তাদের পক্ষে কে বিতর্ক করবে? অথবা কে তাদের উকালতি বা কার্যনির্বাহী হবে?" (সূরা আন-নিসা, আয়াত: ১০৯)

- হাদিসের মতন ও অনুবাদ

আদালতে বাগ্মিতা বা আইনি মারপ্যাঁচ দিয়ে অন্যের হক নষ্ট করার ভয়াবহতা এবং স্বয়ং সাহাবায়ে কেরাম বিচারিক প্রক্রিয়ায় কীভাবে প্রতিনিধি নিয়োগ করেছিলেন, তা নিম্নোক্ত হাদিস দ্বারা প্রমাণিত:

إِنَّمَا أَنَا بَشَرٌ، وَإِنَّكُمْ تَخْتَصِمُونَ إِلَيَّ، وَلَعَلَّ بَعْضَكُمْ أَنْ يَكُونَ أَلْحَنَ بِحُجَّتِهِ مِنْ بَعْضٍ، فَأَقْضِيَ لَهُ عَلَى نَحْوِ مَا أَسْمَعُ

অনুবাদ: "নিশ্চয়ই আমি কেবল একজন মানুষ। তোমরা আমার কাছে বিবাদ নিয়ে আসো। হতে পারে তোমাদের কেউ অপর পক্ষের চেয়ে বেশি বাকপটু ও যুক্তিবাদী (আইনি মারপ্যাঁচে দক্ষ), যার ফলে আমি তার কথা শুনেই তার পক্ষে ফয়সালা দিয়ে দিই।..." (সহিহ বুখারি, হাদিস নং: ২৬৮০; সহিহ মুসলিম, হাদিস নং: ১৭১৩)

এই হাদিসটি পরোক্ষভাবে প্রমাণ করে যে, আদালতে নিজের বক্তব্য সুন্দর ও যৌক্তিকভাবে উপস্থাপনের জন্য দক্ষ ব্যক্তির সাহায্য নেওয়া একটি মানবীয় বাস্তবতা, যা ওকালের মূল ভিত্তি।

أَنَّ عَلِيًّا رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ كَانَ يَكْرَهُ الْخُصُومَةَ، فَكَانَ إِذَا كَانَتْ لَهُ خُصُومَةٌ وَكَّلَ فِيهَا عَقِيلَ بْنَ أَبِي طَالِبٍ، فَلَمَّا كَبِرَ عَقِيلٌ وَكَّلَ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ جَعْفَرٍ

অনুবাদ: "আমিরুল মুমিনীন হযরত আলী (রা.) ব্যক্তিগতভাবে আদালতের বিবাদ ও সওয়াল-জবাব অপছন্দ করতেন। তাই যখনই তাঁর কোনো বিচারিক বিরোধ তৈরি হতো, তিনি (তাঁর পক্ষে লড়তে) আকিল ইবনে আবি তালিবকে উকিল নিয়োগ করতেন। পরবর্তীতে আকিল যখন বৃদ্ধ হয়ে যান, তখন তিনি আব্দুল্লাহ ইবনে জাফরকে উকিল নিয়োগ করেন।" (সুনানে বাইহাকি আল-কুবরা, কিতাবুল ওকালাহ, হাদিস নং: ১১৫৩৭; মুসান্নাফে ইবনে আবি শাইবাহ)

- ফিকহি মাসয়ালা ও তাত্ত্বিক বিশ্লেষণ

ইসলামি আইনশাস্ত্রে বিচার প্রক্রিয়ায় আইনজীবীর এক্তিয়ার, ফি বা পারিশ্রমিক এবং পেশাগত নৈতিকতার শর্তাবলী সম্পর্কে ফকিহগণ নিম্নলিখিত মাসয়ালাগুলো সুনির্দিষ্ট করেছেন:

১. ওকালাহ বিল খুসূমাহ-এর বৈধতার শর্ত (شروط الوكالة بالخصومة):

হানাফি ফিকহের প্রামাণ্য গ্রন্থ 'আল-হেদায়া' এবং 'মাজাল্লাতুল আহকাম আল-আদলিয়্যাহ' (ধারা: ১৫১৪) অনুযায়ী, দেওয়ানি, আর্থিক ও পারিবারিক মামলায় নিজের পক্ষে উকিল নিয়োগ করা সম্পূর্ণ বৈধ। তবে হুদুদ (যেমন: চুরি, ব্যভিচার) এবং কিসাস (হত্যার বদলা) সংক্রান্ত পিওর ফৌজদারি মামলায় অপরাধীর উপস্থিতিতে ওকালতি চললেও, অপরাধীর অনুপস্থিতিতে (In absentia) কেবল উকিলের জবানবন্দির ভিত্তিতে হদ বা কিসাস কার্যকর করা যায় না; কারণ এই ক্ষেত্রে আসামির সরাসরি জবানবন্দি বা উপস্থিতি অপরিহার্য।

২. বিবাদীর সম্মতি ছাড়া বাদীর উকিল নিয়োগ (توكيل من غير رضا الخصم):

ইমাম আবু হানিফা (রহ.)-এর প্রাথমিক মত অনুযায়ী, বিবাদীর সম্মতি ছাড়া বাদী আদালতে নিজের পক্ষে উকিল নিযুক্ত করতে পারত না (বিশেষ কিছু ক্ষেত্র ছাড়া)। তবে হানাফি ফিকহের চূড়ান্ত ফাতওয়া এবং ইমাম আবু ইউসুফ ও ইমাম মুহাম্মদের (সাহেবাইন) সিদ্ধান্ত অনুযায়ী—যেকোনো পক্ষ অপর পক্ষের সম্মতি ছাড়াই আদালত পরিচালনায় স্বাধীনভাবে উকিল বা আইনজীবী নিয়োগ করতে পারবে। বর্তমান আধুনিক বিচার ব্যবস্থায় এই মতটিই অনুসৃত।

৩. ওকালতি ফি বা পারিশ্রমিকের আইনি বিধান (أخذ الأجرة على المحاماة):
ইসলামি ফিকহে আইনজীবীর পারিশ্রমিক বা ফি গ্রহণ করা 'ইজারা' (إجارة - শ্রমের চুক্তি) চুক্তির অধীনে সম্পূর্ণ বৈধ। তবে শর্ত হলো, চুক্তির সময় ফির পরিমাণ সুনির্দিষ্ট হতে হবে। কোনো আইনজীবী যদি এই শর্তে মামলা নেন যে, "মামলা জিতলে সম্পত্তির একটা নির্দিষ্ট অংশ বা পারিশ্রমিক পাব, আর হারলে কিছুই পাব না", তবে হানাফি ফিকহের মূলনীতি অনুযায়ী এই ধরনের শর্তযুক্ত চুক্তি (قمار বা ঝুঁকিপূর্ণ হওয়ার কারণে) ফাসেদ বা অবৈধ হবে। তবে মেধা ও শ্রমের বিনিময়ে নির্ধারিত ফি নেওয়া সম্পূর্ণ জায়েয।

৪. আইনজীবীর পেশাগত নৈতিকতা (أخلاقيات المحاماة في الإسلام):
ইসলামি আইনে আইনজীবীর মূল ভূমিকা হলো 'মুয়াবিনুল ক্বাযী' (معاون القاضي) বা বিচারকের সহকারী। আল্লামা ইবনে কুদামা স্পষ্ট করেছেন যে, কোনো আইনজীবী যদি জানেন যে তাঁর মক্কেল চোর বা জালিয়াত, তবে আইনি ফাঁকফোকর বের করে তাকে খালাস করার চেষ্টা করা আল্লাহর সাথে খিয়ানত করার শামিল। আইনজীবীকে অবশ্যই সত্যের পক্ষে লড়তে হবে, কোনো অবস্থাতেই আদালতে মিথ্যা সাক্ষ্য বা জাল দলিল উপস্থাপনে মক্কেলকে সাহায্য করা যাবে না।

- একাডেমিক রেফারেন্স (উৎস গ্রন্থসমূহ)

হানাফি ফিকহ ও উসমানীয় ওকালাহ: আল্লামা বুরহানুদ্দীন আল-মারগীনানী, আল-হেদায়া ফি শারহি বিদায়াতিল মুবতাদী, কিতাবুল ওকালাহ (باب الوكالة بالخصومة والقبض), কায়রো: মুস্তফা আল-বাবি আল-হালাবি সংস্করণ, খণ্ড: ৩, পৃষ্ঠা: ১২৫-১৩২। আল্লামা আলী হাজাদ, দুরারুল হুক্কাম শারহু মাজাল্লাতিল আহকাম, কিতাবুল ওকালাহ, খণ্ড: ৩, ধারা: ১৫১৪-১৫২৩ (প্রতিনিধিত্বের আইনি এক্তিয়ার)।
মালেকি ফিকহ ও বিচারিক প্রতিনিধিত্ব: ইবনে রুশদ আল-কুরতুবি, বিদায়াতুল মুজতাহিদ ওয়া নিহায়াতুল মুকতাসিদ, কিতাবুল ওকালাহ, কায়রো: দারুল হাদিস, খণ্ড: ৪, পৃষ্ঠা: ১৮০-১৮৫। ইমাম আল-কারাফী, আল-জাহীরা, কিতাবুল ওকালাহ ফিল খুসূমাহ, খণ্ড: ৯, পৃষ্ঠা: ১২-২০।

শাফেয়ি ফিকহ ও আদালতের কার্যবিধি: খতিব শিরবিনি (রহ.), মুগনি আল-মুহতাজ, কিতাবুল ওকালাহ (فصل في أحكام الوكيل في الخصومة), বৈরুত: দারুল কুতুবিল ইলমিয়্যাহ, খণ্ড: ৩, পৃষ্ঠা: ২৪০-২৪৮।
হাম্বলি ফিকহ ও বিচার ব্যবস্থা: ইমাম ইবনে কুদামা আল-মাকদিসি, আল-মুগনি, কিতাবুল ওকালাহ (مسألة: التوكيل في الخصومة تثبت بها الحقوق), কায়রো: হাজার পাবলিকেশনস, খণ্ড: ৭, পৃষ্ঠা: ১৯০-২০০। ড. ওয়াহবাহ আল-জুহাইলি, আল-ফিকহুল ইসলামি ওয়া আদিল্লাতুহু, কিতাবুল ওকালাহ ওয়াল মুহামাহ (আইনজীবী পেশার সমসাময়িক রূপ), খণ্ড: ৬, পৃষ্ঠা: ৪৬৫৫-৪৬৬২।

৫.৬ প্রকাশ্য আদালত এবং গোপন বিচার প্রক্রিয়ার নিষেধাজ্ঞা

বিচার ব্যবস্থার প্রতি জনগণের আস্থা এবং নিরপেক্ষতা বজায় রাখার জন্য ইসলামি বিচারিক ব্যবস্থায় 'প্রকাশ্য আদালত' বা 'আল-জলসাহ আল-আলানিয়্যাহ' (الجلسة العلنية) একটি মৌলিক নীতি। ইসলামি ফিকহের অমোঘ নিয়ম হলো—বিচারকাজ কোনো অন্ধকার কুঠুরি, গোপন কক্ষ বা জনগণের অগোচরে সম্পন্ন হবে না। বিচারককে এমন একটি উন্মুক্ত স্থানে (যেমন: মসজিদের আঙিনা, সরকারি সাধারণ এজলাস বা উন্মুক্ত চত্বর) বসতে হবে যেখানে সমাজের যেকোনো সাধারণ মানুষ, বাদী, বিবাদী এবং তাদের আত্মীয়-স্বজন স্বাধীনভাবে উপস্থিত থেকে বিচারিক প্রক্রিয়া পর্যবেক্ষণ করতে পারেন।

গোপন বিচার প্রক্রিয়া (Secret Trial) স্বৈরাচারী শাসন, ক্ষমতার অপব্যবহার এবং অবিচারের পথ উন্মুক্ত করে। এই কারণে ইসলামি ফিকহে বিচারকের জন্য গোপন কক্ষে বিচার পরিচালনা করাকে কঠোরভাবে নিষিদ্ধ বা মাকরূহে তাহরিমি ঘোষণা করা হয়েছে। তবে ইসলামি ফৌজদারি কার্যবিধিতে এর একটি যৌক্তিক ব্যতিক্রমও রাখা হয়েছে। যদি কোনো মামলার বিবরণ অত্যন্ত সংবেদনশীল হয়—যেমন নারীর সতীত্ব, পারিবারিক চরম গোপনীয়তা বা এমন কোনো যৌন অপরাধ যার বিবরণ প্রকাশ্য আদালতে ছড়িয়ে পড়লে সমাজে অশ্লীলতা (الفاحشة) ছড়িয়ে পড়ার আশঙ্কা থাকে, তবেই কেবল বিচারক সাময়িকভাবে 'গোপন বিচার' বা আধুনিক পরিভাষায় 'ইন-ক্যামেরা ট্রায়াল' (In-camera Trial) পরিচালনা করতে পারেন।

- কুরআনের আয়াত ও অনুবাদ

বিচার প্রক্রিয়ায় যেকোনো গোপন ষড়যন্ত্র, পক্ষপাতিত্ব বা রুদ্ধদ্বার বৈঠকে অন্যায় ফয়সালা করার বিরুদ্ধে কঠোর হুঁশিয়ারি উচ্চারণ করে আল্লাহ তাআলা ইরশাদ করেন:

لَا خَيْرَ فِي كَثِيرٍ مِنْ نَجْوَاهُمْ إِلَّا مَنْ أَمَرَ بِصَدَقَةٍ أَوْ مَعْرُوفٍ أَوْ إِصْلَاحٍ بَيْنَ النَّاسِ

অনুবাদ: "তাদের অধিকাংশ গোপন পরামর্শ বা রুদ্ধদ্বার বৈঠকের মধ্যে কোনো কল্যাণ নেই; তবে কল্যাণ আছে যে ব্যক্তি দান-খয়রাত, সৎকাজ কিংবা মানুষের মধ্যে শান্তি বা ফয়সালা স্থাপনের নির্দেশ দেয় (তার গোপন পরামর্শে)।" (সূরা আন-নিসা, আয়াত: ১১৪)

وَأَنِ احْكُمْ بَيْنَهُمْ بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ وَلَا تَتَّبِعْ أَهْوَاءَهُمْ

অনুবাদ: "আর আপনি তাদের মধ্যে আল্লাহ যা নাজিল করেছেন সেই অনুযায়ী ফয়সালা করুন এবং তাদের প্রবৃত্তির অনুসরণ করবেন না।" (সূরা আল-মায়েদাহ, আয়াত: ৪৯)

মুফাসসিরগণ বলেন, প্রকাশ্য আদালতে বিচার করা প্রবৃত্তির অনুসরণ এবং পক্ষপাতিত্ব থেকে বিচারককে রক্ষা করার সবচেয়ে বড় ঢাল।

- হাদিসের মতন ও অনুবাদ

রাসূলুল্লাহ (সা.) এবং খোলাফায়ে রাশেদীনের বিচারিক মজলিস সর্বদা উন্মুক্ত ও সাধারণ মানুষের জন্য উন্মোচিত থাকত, যা প্রকাশ্য আদালতের অকাট্য দলিল:

عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا: أَنَّ قُرَيْشًا أَهَمَّهُمْ شَأْنُ الْمَرْأَةِ الْمَخْزُومِيَّةِ الَّتِي سَرَقَتْ، فَقَالُوا: وَمَنْ يُكَلِّمُ فِيهَا رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ؟ ...فَكَلَّمَهُ أُسَامَةُ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: أَتَشْفَعُ فِي حَدٍّ مِنْ حُدُودِ اللَّهِ؟ ثُمَّ قَامَ فَاخْتَطَبَ فَقَالَ: أَيُّهَا النَّاسُ، إِنَّمَا أَهْلَكَ الَّذِينَ قَبْلَكُمْ أَنَّهُمْ كَانُوا إِذَا سَرَقَ فِيهِمُ الشَّرِيفُ تَرَكُوهُ، وَإِذَا سَرَقَ فِيهِمُ الضَّعِيفُ أَقَامُوا عَلَيْهِ الْحَدَّ

অনুবাদ: "হযরত আয়েশা (রা.) থেকে বর্ণিত, কুরাইশ বংশের এক মাখজুমী নারীর চুরির ঘটনা (এবং তার শাস্তি) কুরাইশদের অত্যন্ত চিন্তিত করে তুলল। তারা বলল, এই বিষয়ে রাসূলুল্লাহ (সা.)-এর সাথে কে কথা বলবে? ... অতঃপর উসামা (রা.) তাঁর সাথে কথা বললেন। রাসূলুল্লাহ (সা.) বললেন, 'তুমি কি আল্লাহর নির্ধারিত হদ বা শাস্তির বিষয়ে সুপারিশ করছ?' এরপর তিনি (জনসম্মুখে) দাঁড়িয়ে খুতবা বা ভাষণ দিলেন এবং বললেন, 'হে মানুষ! তোমাদের পূর্ববর্তী জাতিগুলো ধ্বংস হয়ে গেছে কারণ যখন তাদের মধ্যে কোনো প্রভাবশালী ব্যক্তি চুরি করত, তারা তাকে ছেড়ে দিত; আর

যখন কোনো দুর্বল সাধারণ মানুষ চুরি করত, তারা তার ওপর হদ কায়েম করত।" (সহিহ বুখারি, হাদিস নং: ৩৪৭৫; সহিহ মুসলিম, হাদিস নং: ১৬৮৮)
চুরির মামলার রায় এবং তার নীতিগত ঘোষণা রাসূলুল্লাহ সা. গোপন কক্ষে না করে প্রকাশ্য দরবারে এবং খুতবার মাধ্যমে দিয়েছিলেন, যা বিচারিক স্বচ্ছতার সর্বোচ্চ প্রমাণ।

- ফিকহি মাসয়ালা ও তাত্ত্বিক বিশ্লেষণ

ইসলামি আইনশাস্ত্রে আদালতের স্থান নির্ধারণ, প্রকাশ্য বিচারের বাধ্যবাধকতা এবং গোপন বিচারের নিষেধাজ্ঞার পরিধি সম্পর্কে ফকিহগণ নিম্নলিখিত মাসয়ালাগুলো সুনির্দিষ্ট করেছেন:

১. আদালতের স্থান ও সাধারণ প্রবেশাধিকার (مكان القضاء العام):
হানাফি ফিকহের প্রামাণ্য কোড 'মাজাল্লাতুল আহকাম আল-আদিলিয়্যাহ' (ধারা: ১৭৯৫) অনুযায়ী, বিচারককে এমন স্থানে এজলাস বসাতে হবে যেখানে সবার অবাধ যাতায়াত রয়েছে (مكان مباح للعامة)। ইমাম আবু হানিফা (রহ.) এবং ইমাম শাফেয়ী (রহ.)-এর মতে, জামে মসজিদের বারান্দা বা আঙিনা ছিল প্রকাশ্য আদালতের সবচেয়ে আদর্শ স্থান, কারণ সেখানে ধনী-দরিদ্র, মুসলিম-অমুসলিম সবার প্রবেশাধিকার নিশ্চিত থাকত। বিচারক নিজের ব্যক্তিগত বাসভবনে বা এমন কোনো দুর্গে এজলাস বসাতে পারবেন না, যেখানে দারোয়ান বা পাহারাদার সাধারণ মানুষকে প্রবেশে বাধা দেয়।

২. গোপন বিচার প্রক্রিয়ার নিষেধাজ্ঞা ও অপকারিতা (منع القضاء في السر):
ফকিহগণের সর্বসম্মত সিদ্ধান্ত হলো, কোনো প্রকার যৌক্তিক কারণ ছাড়া সম্পূর্ণ গোপন কক্ষে (Secret Chambers) বিচার করা মাকরূহে তাহরিমি বা নিষিদ্ধ। আল্লামা কাসানি স্পষ্ট করেছেন যে, গোপন বিচারে তিনটি প্রধান আইনি ত্রুটি দেখা দেয়:
ক. বিচারকের ওপর পক্ষপাতিত্ব বা ঘুষ গ্রহণের তাত্ত্বিক সন্দেহ (تهمة المداهنة والرشوة) তৈরি হয়।
খ. সমাজ বা জনগণ বিচারিক সিদ্ধান্ত থেকে আইনি শিক্ষা গ্রহণ করতে পারে না।
গ. মজলুম বা দুর্বল পক্ষ জনগণের নৈতিক সমর্থন থেকে বঞ্চিত হয়, যার ফলে শক্তিশালী পক্ষ চাপ সৃষ্টি করতে পারে।

৩. গোপন বা ইন-ক্যামেরা ট্রায়ালের বৈধতার ব্যতিক্রম (استثناءات المحاكمة السرية): ইসলামি আইন সম্পূর্ণ রূঢ় নয়, বরং এটি বাস্তবমুখী। ফকিহগণ (বিশেষ করে মালেকি ও হাম্বলি ফিকহে) বিশেষ পরিস্থিতিতে গোপন বা সীমিত আদালতে বিচার করার অনুমতি দিয়েছেন:

ক. নারীর সম্মান ও পারিবারিক গোপনীয়তা: যদি কোনো মামলায় পারিবারিক ইজ্জত বা ধর্ষণের মতো অপরাধের পুঙ্খানুপুঙ্খ বিবরণ থাকে, যা প্রকাশ্য এজলাসে আলোচনা করলে বাদী বা ভুক্তভোগী সামাজিকভাবে চরম হেয় প্রতিপন্ন হবে।

খ. রাষ্ট্রীয় নিরাপত্তা ও ফিতনা দমন: যদি প্রকাশ্য বিচারে রাষ্ট্রে চরম বিশৃঙ্খলা বা দাঙ্গা (Fitnah) ছড়িয়ে পড়ার নিশ্চিত আশঙ্কা থাকে।

ব্যতিক্রমী ক্ষেত্রেও ফকিহদের শর্ত হলো, সম্পূর্ণ গোপন না করে অন্তত উভয় পক্ষের আইনজীবী বা বিশ্বস্ত অভিভাবককে এজলাসে উপস্থিত রাখতে হবে, যাতে বিচারিক স্বচ্ছতা নষ্ট না হয়।

- একাডেমিক রেফারেন্স (উৎস গ্রন্থসমূহ)

হানাফি ফিকহ ও উসমানীয় বিচারিক বিধিমালা: ইমাম আলাউদ্দীন আল-কাসানি (রহ.), বাদায়েউস সানায়ে ফি তারতিবিশ শারায়ে, কিতাবুল কাজা (فصل في المكان الذي يقضي فيه القاضي), বৈরুত: দারু ইহইয়ায়িত তুরাসিল আরাবি, খণ্ড: ৭, পৃষ্ঠা: ৪-১২।

আল্লামা আলী হায়দার, দুরারুল হুক্কাম শারহু মাজাল্লাতিল আহকাম, কিতাবুল কাজা (এজলাসের সাধারণ নিয়মাবলী), খণ্ড: ৪, ধারা: ১৭৯৫-১৭৯৯।

মালেকি ফিকহ ও কর্ডোভার বিচার ব্যবস্থা: ইবনে ফারহুন আল-মালেকি, তাবসিরাতুল হুক্কাম ফি উসুলিল আকদিয়্যাহ ওয়া মানাহিজিল আহকাম, খণ্ড: ১, পৃষ্ঠা: ৬০-৭০ (موضوع: جلوس القاضي بارزاً للناس - বিচারকের জনগণের সামনে প্রকাশ্য বসার নিয়ম)। ইমাম আল-কুরতুবি, আল-জামি লি-আহকামিল কুরআন (সূরা আন-নিসার ১১৪ নম্বর আয়াতের আইনি ব্যাখ্যা), খণ্ড: ৫, পৃষ্ঠা: ৪০০-৪০৫।

শাফেয়ি ফিকহ ও আদালতের প্রটোকল: খতিব শিরবিনি (রহ.), মুগনি আল-মুহতাজ ইলা মা'রিএতি মাআনি আলফাজিল মিনহাজ, কিতাবুল কাজা (باب آداب القاضي ومجلسه), বৈরুত: দারুল কুতুবিল ইলমিয়্যাহ, খণ্ড: Visible খণ্ড: ৬, পৃষ্ঠা: ৩৫৫-৩৬৫।

ইমাম আল-মাওয়ার্দি, আল-আহকামুস সুলতানিয়্যাহ, অধ্যায়: কাযা ও আদালতের সাধারণ নিয়ম, পৃষ্ঠা: ৮২-৮৮।

হাম্বলি বিচার নীতি ও ইবনে তাইমিয়্যাহর ব্যাখ্যা: ইমাম ইবনে কুদামা আল-মাকদিসি, আল-মুগনি, কিতাবুল কাজা (مسألة: ويجلس القاضي في موضع بارز يسهل الوصول إليه), কায়রো: হাজার পাবলিকেশনস, খণ্ড: ১৪, পৃষ্ঠা: ৬০-৭২। শায়খুল ইসলাম ইবনে তাইমিয়্যাহ, আস-সিয়াসাতুস শারইয়্যাহ ফি ইসলাহির রাঈ ওয়ার রাইইয়্যাহ, পৃষ্ঠা: ৯০-১০৫ (বিচারিক স্বচ্ছতা অধ্যায়)।

অধ্যায় ৬: ইসলামি বিচার ব্যবস্থার বাস্তবিক প্রয়োগ: রাসূল (সা.) ও খোলাফায়ে রাশেদীনের আদালত

ইসলামি বিচার ব্যবস্থা কেবল কোনো তাত্ত্বিক দর্শন নয়, বরং এটি ইতিহাসের পাতায় প্রমাণিত এক জীবন্ত ও সফল আইনি বাস্তবতা। এই ষষ্ঠ অধ্যায়ে ইসলামের ইতিহাসের স্বর্ণযুগ তথা স্বয়ং রাসূলুল্লাহ (সা.)-এর মদিনা রাষ্ট্রের আদালত এবং পরবর্তীকালে খোলাফায়ে রাশেদীনের সময়কালের বাস্তব বিচারিক নজির ও ঐতিহাসিক মামলাসমূহের বিচার বিশ্লেষণ করা হয়েছে। এর মাধ্যমে তৎকালীন আদালতের নিখুঁত ইনসাফ ও কার্যকারিতা ফুটিয়ে তোলা হয়েছে।

৬.১ রাসূলুল্লাহ (সা.) এর বিচারিক জীবন, সতর্কতা ও ঐতিহাসিক মামলাসমূহ

ইসলামি বিচার ব্যবস্থার মূল উৎস এবং সর্বোচ্চ জীবন্ত আদর্শ হলো প্রিয় নবী হযরত মুহাম্মদ (সা.)-এর বিচারিক জীবন। মদিনায় ইসলামি রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠার পর তিনি একাধারে রাষ্ট্রের প্রধান এবং প্রধান বিচারপতির (Chief Justice) দায়িত্ব পালন করেন। রাসূলুল্লাহ (সা.)-এর বিচারিক জীবনের সবচেয়ে বড় বৈশিষ্ট্য ছিল—ঐশ্বরিক ওহীর ধারক হওয়া সত্ত্বেও তিনি সাধারণ মানুষের পারস্পরিক মামলা-মোকাদ্দমার ফয়সালা করার সময় ওহীর ওপর নির্ভর না করে, আদালতের বাহ্যিক তথ্য-প্রমাণ, সাক্ষী এবং জবানবন্দির ভিত্তিতে রায় দিতেন।

তাঁর বিচারিক কার্যপদ্ধতিতে সততা, নিরপেক্ষতা এবং নিখুঁত সতর্কতা ছিল অনন্য। তিনি বিচারকদের জন্য এমন কিছু বৈপ্লবিক নীতি ও সুরক্ষাকবচ রেখে গেছেন, যা আধুনিক বিচারিক দর্শনের (Jurisprudence) মূল ভিত্তি। কোনো পক্ষের অনুপস্থিতিতে রায় না দেওয়া, তীব্র রাগের মাথায় বিচারকক্ষে না বসা, সামাজিক প্রভাব বা আত্মীয়তার সম্পর্কের ঊর্ধ্বে উঠে আইন প্রয়োগ করা এবং নিজের কোনো মানবিক ভুলের কারণে যেন কারো হক নষ্ট না হয়—এই বিষয়ে তিনি সর্বোচ্চ সতর্ক ছিলেন।

- কুরআনের আয়াত ও অনুবাদ

রাসূলুল্লাহ (সা.)-এর বিচারিক জীবনের একমাত্র লক্ষ্য যে ছিল সম্পূর্ণ ইনসাফ প্রতিষ্ঠা করা এবং আল্লাহর নাজিলকৃত বিধানের নিখুঁত প্রয়োগ, তা স্পষ্ট করে আল্লাহ তাআলা ইরশাদ করেন:

فَلَا وَرَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ حَتَّىٰ يُحَكِّمُوكَ فِيمَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ ثُمَّ لَا يَجِدُوا فِي أَنْفُسِهِمْ حَرَجًا مِمَّا قَضَيْتَ وَيُسَلِّمُوا تَسْلِيمًا

অনুবাদ: "অতএব, আপনার রবের কসম! তারা ততক্ষণ পর্যন্ত মুমিন হতে পারবে না, যতক্ষণ না তারা তাদের পারস্পরিক বিবাদ-বিসংবাদের ক্ষেত্রে আপনাকে বিচারক হিসেবে মেনে নেবে; অতঃপর আপনি যে ফয়সালা করবেন, সে সম্পর্কে তাদের মনে কোনো দ্বিধাদ্বন্দ্ব বা সংকীর্ণতা থাকবে না এবং তারা তা পূর্ণ সন্তুষ্টির সাথে মেনে নেবে।" (সূরা আন-নিসা, আয়াত: ৬৫)

وَأَنِ احْكُمْ بَيْنَهُمْ بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ وَلَا تَتَّبِعْ أَهْوَاءَهُمْ وَاحْذَرْهُمْ أَنْ يَفْتِنُوكَ عن بَعْضِ مَا أَنْزَلَ اللَّهُ إِلَيْكَ

অনুবাদ: "আর আপনি তাদের মধ্যে আল্লাহ যা নাজিল করেছেন সেই অনুযায়ী ফয়সালা করুন এবং তাদের প্রবৃত্তির অনুসরণ করবেন না। আর তাদের সম্পর্কে সতর্ক থাকুন, পাছে তারা আল্লাহ আপনার প্রতি যে কিতাব নাজিল করেছেন, তার কোনো অংশ থেকে আপনাকে বিচ্যুত করে দেয়।" (সূরা আল-মায়েদাহ, আয়াত: ৪৯)

- হাদিসের মতন ও অনুবাদ

বিচারকক্ষে রাসূলুল্লাহ (সা.)-এর পদ্ধতিগত সতর্কতা, আইনি পক্ষপাতহীনতা এবং বিচারকদের জন্য তাঁর নির্দেশনাবলী নিম্নোক্ত অকাট্য হাদিসসমূহ দ্বারা প্রমাণিত:

،عَنْ عَلِيٍّ رَضِيَّ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ :بَعَثَنِي رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِلَى الْيَمَنِ قَاضِيًا فَقُلْتُ :يَا رَسُولَ اللَّهِ، تَبْعَثُنِي وَأَنَا شَابٌّ أَقْضِي بَيْنَهُمْ وَلَا أَدْرِي مَا الْقَضَاءُ؟ فَضَرَبَ بِيَدِهِ فِي صَدْرِي ثُمَّ قَالَ :اللَّهُمَّ اهْدِ قَلْبَهُ وَثَبِّتْ لِسَانَهُ، إِذَا تَقَاضَى إِلَيْكَ رَجُلَانِ، فَلَا تَقْضِ لِلْأَوَّلِ حَتَّى تَسْمَعَ كَلَامَ الْآخَرِ، فَإِنَّكَ إِذَا فَعَلْتَ ذَلِكَ تَبَيَّنَ لَكَ الْقَضَاءُ

অনুবাদ: "হযরত আলী (রা.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (সা.) যখন আমাকে বিচারক হিসেবে ইয়েমেনে পাঠাচ্ছিলেন, তখন আমি আরজ করলাম: 'হে আল্লাহর রাসূল! আপনি আমাকে পাঠাচ্ছেন অথচ আমি এক তরুণ যুবক, আমি তাদের মধ্যে বিচার করব কিন্তু বিচারকার্যের গভীরতা সম্পর্কে আমার জানা নেই।' তখন তিনি আমার বুকে হাত মেড়ে দোয়া করলেন: 'হে আল্লাহ! তার অন্তরকে হেদায়েত দিন এবং

তার জবানকে অবিচল রাখুন।' এরপর আমাকে (পদ্ধতিগত সতর্কতা শিখিয়ে) বললেন: 'যখন তোমার কাছে দুজন বিবাদী কোনো মামলার ফয়সার জন্য আসবে, তখন তুমি প্রথম পক্ষের কথা শুনেই রায় দিয়ে দিও না, যতক্ষণ না তুমি অপর পক্ষের বক্তব্য শুনবে। তুমি যদি এই নিয়ম মেনে চলো, তবে মামলার প্রকৃত সত্য ও সঠিক ফয়সালা তোমার সামনে স্পষ্ট হয়ে যাবে'।" (মুসনাদে আহমাদ, হাদিস নং: ১১২০; সুনানে আবু দাউদ, হাদিস নং: ৩৫৮২)

لَا يَقْضِيَنَّ حَكَمٌ بَيْنَ اثْنَيْنِ وَهُوَ غَضْبَانُ

অনুবাদ: "কোনো বিচারক যেন কোনো অবস্থাতেই ক্রোধ বা রাগের মাথায় দুজন বিবাদীর মধ্যে ফয়সালা না করে।" (সহিহ বুখারি, হাদিস নং: ৭১৫৮; সহিহ মুসলিম, হাদিস নং: ১৭১৭)

- ঐতিহাসিক মামলা ও বিচারিক নজির

রাসূলুল্লাহ (সা.)-এর বিচারকক্ষে নিষ্পত্তিকৃত কিছু ঐতিহাসিক মামলা নিচে আলোচনা করা হলো, যা ইসলামি আইনশাস্ত্রের চিরন্তন নীতি হিসেবে স্বীকৃত:

১. মাখজুমী নারীর চুরির মামলা (আইনের চোখে সবার সমতা):

মদিনার অভিজাত 'বনু মাখজুম' গোত্রের এক নারী (ফাতেমা বিনতে আসওয়াদ) চুরির অপরাধে ধরা পড়ে। গোত্রের নেতৃবৃন্দ সম্মান ক্ষুণ্ন হওয়ার ভয়ে রাসূলুল্লাহ (সা.)-এর প্রিয় সাহাবী হযরত উসামা ইবনে যায়েদ (রা.)-কে দিয়ে সুপারিশ পাঠায়। রাসূলুল্লাহ (সা.) এই সুপারিশে অত্যন্ত ক্ষুব্ধ হন এবং আল্লাহর হদ বা দণ্ড মওকুফের চেষ্টার বিরুদ্ধে ঐতিহাসিক এক ঘোষণা দেন।

রাসূলুল্লাহ (সা.)-এর ঐতিহাসিক রায়: তিনি জনসম্মুখে দাঁড়িয়ে খুতবা দিয়ে ঘোষণা করেন, "তোমাদের পূর্ববর্তী জাতিগুলো ধ্বংস হয়ে গেছে কারণ যখন তাদের মধ্যে কোনো প্রভাবশালী ব্যক্তি চুরি করত, তারা তাকে ছেড়ে দিত; আর যখন কোনো দুর্বল সাধারণ মানুষ চুরি করত, তারা তার ওপর দণ্ড কায়েম করত। আল্লাহর কসম! যদি মুহাম্মদের কন্যা ফাতেমাও চুরি করত, তবে আমি অবশ্যই তার হাত কেটে দেওয়ার নির্দেশ দিতাম।" (সহিহ বুখারি, হাদিস নং: ৩৪৭৫)

২. শায়মা বিনতে হারিছ ও বনু সা'দ গোত্রের জমি বিরোধ (বাদীর প্রমাণের বাধ্যবাধকতা):

মদিনার একটি ঐতিহাসিক দেওয়ানি মামলায় দুই ব্যক্তি একটি জমির মালিকানা নিয়ে রাসূলুল্লাহ (সা.)-এর আদালতে উপস্থিত হয়। বাদীর কাছে কোনো লিখিত দলিল বা সাক্ষী ছিল না। বিবাদী দাবি অস্বীকার করে।

রাসূলুল্লাহ (সা.)-এর ঐতিহাসিক রায়: রাসূলুল্লাহ (সা.) এই মামলায় ইসলামি দেওয়ানি কার্যবিধির মূল ভিত্তি প্রতিষ্ঠা করে রায় দেন—"প্রমাণ পেশ করার দায়িত্ব বাদীর (البينة على المدعي), আর প্রমাণ না থাকলে কসম খাওয়ার দায়িত্ব বিবাদীর (واليمين على من أنكر)।" বাদীর সাক্ষী না থাকায় তিনি বিবাদীকে কসম খাওয়ার নির্দেশ দেন এবং কসমের ভিত্তিতে জমির দখল বিবাদীকে বুঝিয়ে দেন। (সহিহ মুসলিম, হাদিস নং: ১৩৮)

৩. মাহরিয়াহ ও কুদাহ গোত্রের পানি বণ্টন বিরোধ (প্রাকৃতিক সম্পদের সুষম বণ্টন):

খায়বার ও মদিনার মধ্যবর্তী 'মাহরিয়াহ' উপত্যকার পাহাড়ি ঢলের পানি দিয়ে কৃষিজমিতে সেচ দেওয়া নিয়ে খায়বার অঞ্চলের ওপরের অংশের জমি মালিক এবং নিচের অংশের জমি মালিকদের মধ্যে তীব্র বিরোধ দেখা দেয়। মামলাটি রাসুল (সা.)-এর আদালতে আসে।

রাসূলুল্লাহ (সা.)-এর ঐতিহাসিক রায়: তিনি একটি চমৎকার প্রাকৃতিক ও দেওয়ানি ভারসাম্য তৈরি করে রায় দেন যে, ওপরের জমির মালিকেরা পাহাড়ি ঢলের পানি আটকে নিজেদের ফসলি জমির 'গোড়ালি' বা টাখনু (Ankle-height) পর্যন্ত সেচ দিতে পারবে; এরপর অতিরিক্ত পানি নিচের জমির মালিকদের জন্য ছেড়ে দিতে বাধ্য থাকবে। কেউ পানি কুক্ষিগত করতে পারবে না। (সহিহ বুখারি, হাদিস নং: ২৩৫৯)

৪. তু'মা ইবনে উবাইরিক ও ইহুদি নাগরিকের চুরির মামলা (অমুসলিমদের প্রতি নিখুঁত ইনসাফ):

মদিনার 'তু'মা ইবনে উবাইরিক' নামক এক মুসলিম এক আনসারী সাহাবীর বর্ম চুরি করে তা এক ইহুদি নাগরিকের বাড়িতে লুকিয়ে রাখে এবং নিজে নির্দোষ দাবি করে।

তু'মার গোত্রের লোকেরা রাসূলুল্লাহ (সা.)-এর কাছে এসে ইহুদির বিরুদ্ধে কঠোর রায় দেওয়ার জন্য চাপ সৃষ্টি করে, যাতে তাদের গোত্রের লোক রক্ষা পায়। বাহ্যিক প্রমাণের ভিত্তিতে রাসূলুল্লাহ (সা.) যখন তু'মাকে নির্দোষ ভাবছিলেন, ঠিক তখনই সূরা আন-নিসার ১০৫ নম্বর আয়াত নাজিল হয় এবং আল্লাহ তাআলা ইহুদি নাগরিকের নির্দোষিতা এবং তু'মার অপরাধের সত্যতা ওহীর মাধ্যমে প্রকাশ করে দেন। রাসুল (সা.) তৎক্ষণাৎ ইহুদি নাগরিককে সসম্মানে খালাস দেন এবং তু'মাকে চোর সাব্যস্ত করেন। এটি প্রমাণ করে যে ইসলামি আদালতে ধর্মের ভিত্তিতে কোনো পক্ষপাতিত্বের সুযোগ নেই। (তাফসিরে ইবনে কাসির, সূরা নিসা: ১০৫)

- ফিকহি মাসয়ালা ও তাত্ত্বিক বিশ্লেষণ

রাসূলুল্লাহ (সা.)-এর বিচারিক কর্মপদ্ধতি, সতর্কতা ও ঐতিহাসিক মামলাসমূহ থেকে ফকিহগণ নিম্নলিখিত আইনি মূলনীতিসমূহ সংকলন করেছেন:

১. ওহী বনাম বাহ্যিক প্রমাণ (القضاء بالظاهر لا بالوحي):

রাসূলুল্লাহ (সা.)-এর বিচারিক জীবনের সবচেয়ে বড় সতর্কতা ছিল—তিনি মামলার ফয়সালা করার সময় ওহীর মাধ্যমে প্রাপ্ত অদৃশ্য জ্ঞানের (ইলমুল গাইব) ওপর ভিত্তি করে কোনো রায় চাপিয়ে দিতেন না। তিনি স্পষ্ট বলেছিলেন, "আমি বাহ্যিক প্রমাণের ভিত্তিতে ফয়সালা করি।" আল্লামা কাসানি বলেন, এটি উম্মতের বিচারকদের জন্য একটি সুনির্দিষ্ট সুরক্ষাকবচ; যাতে পরবর্তী যুগের সাধারণ বিচারকগণ কেবল বাহ্যিক সাক্ষ্য-প্রমাণের ওপর ভিত্তি করে বিচার করার নিখুঁত আইনি পাঠ পান।

২. উভয় পক্ষের সমতা রক্ষা (التسوية بين الخصوم):

হযরত আলী (রা.)-কে দেওয়া নির্দেশনা থেকে ফকিহগণ মাসয়ালা বের করেছেন যে, আদালতে বাদী ও বিবাদীর মাঝে বসার স্থান, সম্বোধন এবং মনোযোগের ক্ষেত্রে পূর্ণ সমতা বজায় রাখতে হবে। হানাফি ও শাফেয়ি ফিকহের চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত হলো—বিচারক যদি আদালতে এক পক্ষকে বসার অনুমতি দেন আর অন্য পক্ষকে দাঁড় করিয়ে রাখেন, তবে বিচারকের এই আচরণ আইনিভাবে চরম মাকরূহ এবং ইনসাফের পরিপন্থী।

৩. মনস্তাত্ত্বিক ভারসাম্য ও শারীরিক সুস্থতার শর্ত (شروط الحالة النفسية للقاضي):
হাদিসে বর্ণিত "রাগের মাথায় বিচার না করার" নিষেধাজ্ঞা থেকে ফকিহগণ মাসয়ালা বের করেছেন যে, কেবল রাগ নয়—এমন যেকোনো পরিস্থিতি যা মানুষের যৌক্তিক চিন্তাভাবনাকে বাধাগ্রস্ত করে, সেই অবস্থায় এজলাসে বসা নিষিদ্ধ। যেমন: প্রচণ্ড ক্ষুধা বা তৃষ্ণা, অতিরিক্ত ক্লান্তি, শারীরিক তীব্র অসুস্থতা, গভীর শোক বা অতিরিক্ত আনন্দের মুহূর্তে বিচারক কোনো মামলার চূড়ান্ত রায় দিতে পারবেন না।

- একাডেমিক রেফারেন্স (উৎস গ্রন্থসমূহ)

হানাফি ফিকহ ও বিচারিক দর্শন: ইমাম আলাউদ্দীন আল-কাসানি, বাদায়েউস সানায়ি ফি তারতিবিশ শারায়ে, কিতাবুল কাজা (فصل في آداب القاضي), বৈরুত: ইহইয়ায়িত তুরাসিল আরাবি, খণ্ড: ৭, পৃষ্ঠা: ১৫-২২। আল্লামা ইবনে আবিদীন, রাদ্দুল মুহতার আলাদ দুররিল মুখতার (ফাতওয়া শামী), কিতাবুল কাজা, খণ্ড: ৫, পৃষ্ঠা: ৪১২-৪২০।
মালেকি ফিকহ ও সিরাতের বিচারিক বিশ্লেষণ: ইমাম ইবনে রুশদ আল-কুরতুবি, বিদায়াতুল মুজতাহিদ ওয়া নিহায়াতুল মুকতাসিদ, কিতাবুল আকদিয়্যাহ, কায়রো: দারুল হাদিস, খণ্ড: ৪, পৃষ্ঠা: ৩০২-৩১০। কাজী আইয়ায আল-মালেকি, আশ-শিফা বি-তা'রিফি হুকুকিল মুস্তফা, অধ্যায়: রাসূলুল্লাহ (সা.)-এর ইনসাফ ও বিচারিক জীবন, খণ্ড: ১, পৃষ্ঠা: ২৫০-২৬৫।
শাফেয়ি ফিকহ ও বিচারিক সতর্কতা তত্ত্ব: ইমাম আল-মওয়ার্দি, আদাবুল কাযী (أدب القاضي الشافعي), বাগদাদ: রিয়াসাতুল দিওয়ানিল আওকাফ, খণ্ড: ১, পৃষ্ঠা: ১২০-১৩৫।
হাম্বলি ফিকহ ও রাসূল (সা.)-এর আইনি সিদ্ধান্তসমূহ: ইমাম ইবনে কায়্যিম আল-জাওযিয়্যাহ, যাদুল মা'আদ ফি হাদয়ি খাইরিল ইবাদ, অধ্যায়: ফি হুকমিহি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ওয়া কাযায়িহি (রাসূল সা.-এর বিচার ও ডিক্রিসমূহ), কায়রো: মুয়াসসাসাতুর رسالة, খণ্ড: ৫, পৃষ্ঠা: ৫-৪০। ইমাম ইবনে কুদামা আল-মাকদিসি, আল-মুগনি, কিতাবুল কাজা, কায়রো: হাজার পাবলিকেশনস, খণ্ড: ১৪, পৃষ্ঠা: ৮৫-৯৫।

৬.২ খলিফা আবু বকর এবং খলিফা ওমর (রা.) এর বিচারিক দূরদর্শিতা ও স্বাধীন বিচার বিভাগ গঠন

রাসূলুল্লাহ (সা.) এর ওফাতের পর প্রথম খলিফা হযরত আবু বকর (রা.) এবং দ্বিতীয় খলিফা হযরত ওমর (রা.) এর যুগ ছিল ইসলামি বিচার ব্যবস্থার প্রাতিষ্ঠানিক রূপান্তরের স্বর্ণযুগ। হযরত আবু বকর (রা.) এর খেলাফতকালে শাসনকাল সংক্ষিপ্ত ও জিহাদে মগ্ন থাকায় বিচার বিভাগের রূপরেখা রাসূল (সা.)-এর যুগের মতোই ছিল; যেখানে খলিফা নিজেই প্রধান বিচারকের দায়িত্ব পালন করতেন, তবে তিনি মদিনার বিচারিক দায়িত্ব হযরত ওমর (রা.)-এর ওপর ন্যস্ত করেছিলেন।

ইসলামি আইনের ইতিহাসে বিচার বিভাগকে নির্বাহী বিভাগ (Executive Branch) থেকে সম্পূর্ণ পৃথক ও স্বাধীন করার কৃতিত্ব হযরত ওমর (রা.)-এর। রাষ্ট্রীয় পরিধি পারস্য ও রোমান সাম্রাজ্য পর্যন্ত বিস্তৃত হলে তিনি বুঝতে পারেন যে, প্রাদেশিক গভর্নর বা খলিফার পক্ষে একা শাসন ও বিচার উভয় কাজ নিখুঁতভাবে করা অসম্ভব। তাই তিনি শাসনব্যবস্থার ইতিহাসে এক বৈপ্লবিক দূরদর্শিতার পরিচয় দিয়ে প্রতিটি প্রদেশে স্বাধীন বিচারক বা 'কাজী' (Judge) নিয়োগ করেন, যারা খলিফা বা গভর্নরের অধীনস্থ ছিলেন না। এই স্বাধীন বিচার বিভাগের সবচেয়ে প্রামাণ্য এবং ঐতিহাসিক নজির হলো কাজী শুরাইহ আল-কিন্দি (رحمه الله)-এর নিয়োগ এবং খলিফা স্বয়ং তাঁর আদালতে একজন সাধারণ নাগরিকের মতো হাজির হয়ে বিচার মেনে নেওয়ার দৃষ্টান্ত।

- কুরআনের আয়াত ও অনুবাদ

শাসক বা বিচারক যে-ই হোন না কেন, নিজের বা পরিবারের বিরুদ্ধে গেলেও সম্পূর্ণ স্বাধীন ও নিরপেক্ষভাবে সাক্ষ্য ও ইনসাফ প্রতিষ্ঠার ঐশ্বরিক নির্দেশ দিয়ে আল্লাহ তাআলা ইরশাদ করেন:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُونُوا قَوَّامِينَ بِالْقِسْطِ شُهَدَاءَ لِلَّهِ وَلَوْ عَلَىٰ أَنْفُسِكُمْ أَوِ الْوَالِدَيْنِ وَالْأَقْرَبِينَ ۚ

অনুবাদ: "হে মুমিনগণ! তোমরা ইনসাফের ওপর দৃঢ়ভাবে প্রতিষ্ঠিত থাক এবং আল্লাহর ওয়াস্তে সত্য সাক্ষ্য দাও, তা যদি তোমাদের নিজেদের কিংবা পিতা-মাতা ও আত্মীয়-স্বজনের বিরুদ্ধেও যায় তবুও।" (সূরা আন-নিসা, আয়াত: ১৩৫)

وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ ۚ

অনুবাদ: "আর তোমরা যখন মানুষের মধ্যে বিচার ফয়সালা করবে, তখন ইনসাফ ও ন্যায়ের সাথে ফয়সালা করবে।" (সূরা আন-নিসা, আয়াত: ৫৮)

- হাদিসের মতন ও অনুবাদ

হযরত ওমর (রা.) কূফার কাজী হযরত আবু মুসা আল-আশআরী (রা.)-এর কাছে বিচার ব্যবস্থার মূলনীতি ও কার্যবিধি নিয়ে একটি ঐতিহাসিক চিঠি পাঠিয়েছিলেন, যা ইসলামি আইনের ইতিহাসে 'রিসালাতুল কাযা' (رسالة القضاء) বা 'বিচারের সংবিধান' নামে পরিচিত। চিঠির মূল অংশ নিচে দেওয়া হলো:

أَمَّا بَعْدُ، فَإِنَّ الْقَضَاءَ فَرِيضَةٌ مُحْكَمَةٌ، وَسُنَّةٌ مُتَّبَعَةٌ، فَافْهَمْ إِذَا أُدْلِيَ إِلَيْكَ، فَإِنَّهُ لَا يَنْفَعُ حَقٌّ لَا نَفَاذَ لَهُ، وَآسِ بَيْنَ النَّاسِ فِي وَجْهِكَ وَعَدْلِكَ وَمَجْلِسِكَ، حَتَّى لَا يَطْمَعَ شَرِيفٌ فِي حَيْفِكَ وَلَا يَيْأَسَ ضَعِيفٌ مِنْ عَدْلِكَ...

অনুবাদ: "অতঃপর জেনে রাখো, বিচারকার্য পরিচালনা করা একটি সুনির্দিষ্ট ফরজ ইবাদত এবং একটি অনুসৃত সুন্নাত। সুতরাং যখন তোমার কাছে কোনো মামলা পেশ করা হবে, তখন তা গভীরভাবে বোঝার চেষ্টা করো। কারণ এমন হকের কোনো মূল্য নেই যা বাস্তবায়িত হয় না। আদালতে বসার স্থান, তোমার দৃষ্টি এবং তোমার ইনসাফের ক্ষেত্রে মানুষের মধ্যে পূর্ণ সমতা রক্ষা করবে; যাতে কোনো প্রভাবশালী ব্যক্তি তোমার থেকে পক্ষপাতের আশা না করতে পারে এবং কোনো দুর্বল ব্যক্তি তোমার ইনসাফ থেকে নিরাশ না হয়..." (সুনানে বাইহাকি আল-কুবরা, খণ্ড: ১০, পৃষ্ঠা: ১৫০; তারীখে ইবনে খালদুন)

- ঐতিহাসিক মামলা ও স্বাধীন বিচার বিভাগের নজির

১. খলিফা ওমর (রা.) বনাম ঘোড়া বিক্রেতার মামলা (কাজী শুরাইহর নিয়োগের পটভূমি):

হযরত ওমর (রা.) বাজার থেকে একটি ঘোড়া কিনলেন এবং তা পরীক্ষা করার জন্য একজন আরোহীকে দিয়ে পাঠালেন। কিছুদূর যাওয়ার পর ঘোড়াটি খুঁড়িয়ে চলতে লাগল এবং জানা গেল তার পায়ে পুরোনো ক্ষত রয়েছে। ওমর (রা.) ঘোড়াটি ফেরত দিতে চাইলেন, কিন্তু বিক্রেতা বলল, "হে আমিরুল মুমিনীন! আমি যখন ঘোড়াটি দিয়েছিলাম তখন তা সম্পূর্ণ সুস্থ ছিল।" ওমর (রা.) বললেন, "তাহলে আমাদের মধ্যে বিচার করার

জন্য একজন বিচারক নির্ধারণ করো।" বিক্রেতা বলল, "আমি শুরাইহ আল-কিন্দিকে বিচারক মানলাম।" খলিফা ওমর (রা.) সাধারণ নাগরিকের মতো শুরাইহর আদালতে উপস্থিত হলেন।

কাজী শুরাইহর ঐতিহাসিক রায়: কাজী শুরাইহ উভয় পক্ষের বক্তব্য শুনে খলিফার বিরুদ্ধে রায় দিয়ে বললেন: "হে আমিরুল মুমিনীন! আপনি যে অবস্থায় ঘোড়াটি ক্রয় করেছিলেন, তা সেভাবেই রেখে দিন অথবা ত্রুটিহীন অবস্থায় যেভাবে নিয়েছিলেন সেভাবেই ফেরত দিন (যেহেতু আপনি ক্রয়ের পর তা পরীক্ষা করতে গিয়েছেন, তাই আগের ত্রুটি প্রমাণের ভার আপনার)।" খলিফা ওমর (রা.) এই রায়ে বিন্দুমাত্র ক্ষুণ্ন না হয়ে উল্টো কাজী শুরাইহর আইনি স্বাধীনতা ও নিরপেক্ষতা দেখে মুগ্ধ হলেন এবং বললেন, "ইনসাফ তো এমনই হওয়া উচিত!" তিনি তৎক্ষণাৎ কাজী শুরাইহকে কূফার প্রধান বিচারপতি (Qadi of Kufa) হিসেবে নিয়োগ দিয়ে স্বাধীন বিচার বিভাগের সূচনা করেন। (আখবারুল কুদাত, ইমাম ওকী; সুনানে দারেমি)

২. খলিফা আবু বকর (রা.)-এর মীরাস বণ্টন সংক্রান্ত দূরদর্শিতা:

হযরত আবু বকর (রা.)-এর আদালতে দাদীর মিরাস বা উত্তরাধিকার সংক্রান্ত একটি জটিল মামলা আসে। কুরআনে সরাসরি দাদীর অংশের কথা উল্লেখ ছিল না। আবু বকর (রা.) সাহাবীদের ডেকে বললেন, "তোমাদের কেউ কি এই বিষয়ে আল্লাহর রাসূল (সা.)-এর কোনো ফয়সালা শুনেছ?" তখন হযরত মুগীরা ইবনে শু'বাহ (রা.) এবং মুহাম্মদ ইবনে মাসলামা (রা.) সাক্ষ্য দিলেন যে, রাসূলুল্লাহ (সা.) দাদীকে মোট সম্পত্তির ১/৬ (এক-ষষ্ঠাংশ) অংশ দিয়েছিলেন।

হযরত আবু বকর (রা.) এর ঐতিহাসিক রায়: আবু বকর (রা.) নিজের রায় না চাপিয়ে উক্ত ঐতিহাসিক সাক্ষ্যের ভিত্তিতে দাদীর অংশ নির্ধারণ করেন, যা বিচারিক তদন্তের এক অনন্য নজির। (মুয়াত্তা ইমাম মালিক, হাদিস নং: ৪)

- ফিকহি মাসয়ালা ও তাত্ত্বিক বিশ্লেষণ

হযরত আবু বকর ও ওমর (রা.) এর বিচারিক নজির থেকে ফকিহগণ নিম্নলিখিত ফিকহি মূলনীতিসমূহ সংকলন করেছেন:

১. বিচার বিভাগের স্বাধীনতা (استقلال القضاء):

কাজী শুরাইহর মামলা থেকে হানাফি ও শাফেয়ি ফিকহের ফকিহগণ এই সিদ্ধান্ত নিয়েছেন যে, ইসলামি রাষ্ট্রে বিচার বিভাগ শাসন বিভাগের চেয়ে সম্পূর্ণ স্বাধীন। রাষ্ট্রের খলিফা বা রাষ্ট্রপতি যদি নিজে মামলার এক পক্ষ হন, তবে বিচারক খলিফাকে সাধারণ নাগরিকের কাতারেই দাঁড় করাবেন এবং খলিফার কোনো রাজনৈতিক চাপ বা পদের ভয় বিচারকের ওপর কার্যকর হবে না।

২. বিচারকের রায় খলিফা কর্তৃক পরিবর্তন অযোগ্য (عدم نقض حكم القاضي):

হানাফি ফিকহের মূলনীতি (মাজাল্লা, ধারা: ১৮০০) অনুযায়ী, একজন যোগ্য কাজী বা বিচারক যদি ইজতিহাদ করে শরীয়তের আলোকে কোনো রায় প্রদান করেন, তবে খলিফা নিজের ব্যক্তিগত মতের ভিন্নতার কারণে সেই রায় বাতিল বা পরিবর্তন করতে পারবেন না, যতক্ষণ না তা কুরআন-সুন্নাহর কোনো অকাট্য নাস (Text)-এর পরিপন্থী প্রমাণিত হয়। হযরত ওমর (রা.) অনেক ক্ষেত্রে নিজের মতের বিপরীত কাজীদের রায়কে বহাল রেখে এই নীতি প্রতিষ্ঠা করেছেন।

৩. সাক্ষ্য গ্রহণে সর্বোচ্চ সতর্কতা ও যৌথ সাক্ষ্য (التثبت في الشهادة):

হযরত আবু বকর (রা.)-এর বিচারিক পদ্ধতি থেকে ফকিহগণ মাসয়ালা বের করেছেন যে, কোনো হাদিস বা আইনি নজির এককভাবে কেউ উপস্থাপন করলে বিচারক সতর্কতাবশত তার সপক্ষে দ্বিতীয় একজন সাক্ষী বা সমর্থনকারী দাবি করতে পারেন (যেমনটি আবু বকর রা. মুগীরা রা.-এর কথার পর মুহাম্মদ ইবনে মাসলামার সমর্থন চেয়ে করেছিলেন)। একে ফিকহের পরিভাষায় 'তাসহীহুল আছার' বা আইনি নজিরের সত্যতা যাচাই বলা হয়।

- একাডেমিক রেফারেন্স (উৎস গ্রন্থসমূহ)

হানাফি ফিকহ ও কিতাবুল কাজা: আল্লামা বুরহানুদ্দীন আল-মারগীনানী, আল-হেদায়া ফি শারহি বিদায়াতিল মুবতাদী, কিতাবুল কাজা (باب أدب القاضي وما يجوز من أحكامه), কায়রো সংস্করণ, খণ্ড: ৩, পৃষ্ঠা: ১৩৫-১৪২।

আল্লামা কাসানি, বাদায়েউস সানায়ে ফি তারতিবিশ শারায়ে, খণ্ড: ৭, পৃষ্ঠা: ৩-৮ (শাসন ও বিচারের পৃথকীকরণ অনুচ্ছেদ)।

মালেকি ফিকহ ও খোলাফায়ে রাশেদীনের বিচারিক নজির: ইবনে ফারহুন আল-মালেকি, তাবসিরাতুল হুক্কাম ফি উসুলিল আকদিয়্যাহ ওয়া মানাহিজিল احكام, খণ্ড: ১, পৃষ্ঠা: ১৫-২৫ (হযরত ওমরের চিঠির আইনি ও ফিকহি ব্যাখ্যা)। ইমাম মালিক ইবনে আনাস, আল-মুয়াত্তা, কিতাবুল ফারায়েজ (দাদীর মিরাস সংক্রান্ত ফয়সালা), খণ্ড: ২, পৃষ্ঠা: ৫১৩।

শাফেয়ি ফিকহ ও স্বাধীন বিচার বিভাগ তত্ত্ব: ইমাম আল-মাওয়ার্দি, আল-আহকামুস সুলতানিয়্যাহ, অধ্যায়: কায়াদ বা বিচার বিভাগ এবং কাজীদের স্বাধীনতা, পৃষ্ঠা: ৬৫-৭৫। খতিব শিরবিনি, মুগনি আল-মুহতাজ, কিতাবুল কাজা, খণ্ড: ৬, পৃষ্ঠা: ৩৭০-৩৮০।

হাম্বলি ফিকহ ও ইবনে কায়্যিমের বিচারিক বিশ্লেষণ: ইমাম ইবনে কায়্যিম আল-জাওযিয়্যাহ, আল-তুরুকুল হুকমিয়্যাহ ফিস সিয়াসাতিল শারইয়্যাহ, খণ্ড: ১, পৃষ্ঠা: ৩-১৮ (কাজী শুরাইহর বিচারিক দূরদর্শিতা ও ওমরের চিঠির তাত্ত্বিক বিশ্লেষণ)। ইমাম ইবনে কুদামা আল-মাকদিসি, আল-মুগনি, কিতাবুল কাজা, কায়রো: হাজার পাবলিকেশনস, খণ্ড: ১৪, পৃষ্ঠা: ৫০-৫৮।

৬.৩ খলিফা উসমান এবং খলিফা আলী (রা.) এর বিচারিক দূরদর্শিতা ও ইসলামি আইনী শাসনের ঐতিহাসিক ঘটনা

তৃতীয় খলিফা হযরত উসমান (রা.) এবং চতুর্থ খলিফা হযরত আলী (রা.)-এর শাসনকাল ছিল ইসলামি বিচার ব্যবস্থার পরিপক্কতা এবং আইনের শাসনের (Rule of Law) চূড়ান্ত বহিঃপ্রকাশ। হযরত উসমান (রা.)-এর যুগে খেলাফতের ভৌগোলিক সীমানা ব্যাপক বৃদ্ধি পাওয়ায় তিনি বিচার ব্যবস্থার বিকেন্দ্রীকরণ করেন এবং কাজীদের জন্য রাষ্ট্রীয় কোষাগার (বায়তুল মাল) থেকে নিয়মিত ভাতা ও বেতন নির্ধারণের প্রাতিষ্ঠানিক রূপ দেন। অন্যদিকে, হযরত আলী (রা.) ছিলেন নিজেই একজন প্রখর ধীসম্পন্ন ফকীহ এবং অনন্য বিচারক, যাঁর আইনি মেধা সম্পর্কে স্বয়ং ওমর (রা.) বলতেন, "আলী না থাকলে ওমর ধ্বংস হয়ে যেত।

এই যুগের বিচারিক দর্শনের মূল বৈশিষ্ট্য ছিল—আইনের দৃষ্টিতে মুসলিম শাসক ও অমুসলিম সাধারণ নাগরিকের মধ্যে নিখুঁত ও সমান্তরাল সমতা রক্ষা করা। তৎকালীন পরাশক্তি ইসলামি সাম্রাজ্যের খলিফা হয়েও তাঁরা আদালতের কাঠগড়ায় একজন সাধারণ নাগরিকের পাশে দাঁড়াতে বিন্দুমাত্র কুণ্ঠাবোধ করেননি। এই ইতিহাসের সবচেয়ে যুগান্তকারী ও অবিস্মরণীয় নজির হলো খলিফা হযরত আলী (রা.) বনাম একজন ইহুদি নাগরিকের বর্ম চুরির মামলা, যা আধুনিক বিচারিক ইতিহাসে সভ্যতার শ্রেষ্ঠতম আইনি উদাহরণ হিসেবে গণ্য করা হয়।

- কুরআনের আয়াত ও অনুবাদ

আদালতে শত্রু বা অমুসলিমদের প্রতিও যেন ইনসাফের এতটুকু কমতি না হয়, সেই বিষয়ে কড়া তাগিদ দিয়ে আল্লাহ তাআলা ইরশাদ করেন:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُونُوا قَوَّامِينَ لِلَّهِ شُهَدَاءَ بِالْقِسْطِ ۖ وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَآنُ قَوْمٍ عَلَىٰ أَلَّا تَعْدِلُوا ۚ اعْدِلُوا هُوَ أَقْرَبُ لِلتَّقْوَىٰ ۖ

অনুবাদ: "হে মুমিনগণ! তোমরা আল্লাহর উদ্দেশ্যে ইনসাফ প্রতিষ্ঠায় দৃঢ়সংকল্প থাক এবং ন্যায়সংগত সাক্ষ্য দাও। কোনো সম্প্রদায়ের শত্রুতা যেন তোমাদেরকে এমনভাবে প্ররোচিত না করে যে তোমরা ইনসাফ ছেড়ে দেবে। তোমরা ইনসাফ করো, এটিই তাকওয়ার সবচেয়ে নিকটবর্তী।" (সূরা আল-মায়েদাহ, আয়াত: ৮)

إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ ۚ

অনুবাদ: "নিশ্চয়ই আল্লাহ তোমাদেরকে নির্দেশ দিচ্ছেন যে, তোমরা যেন আমানতসমূহ তার মালিকদের কাছে ফেরত দাও। আর যখন তোমরা মানুষের মধ্যে বিচার ফয়সালা করবে, তখন ইনসাফের সাথে ফয়সালা করবে।" (সূরা আন-নিসা, আয়াত: ৫৮)

- হাদিসের মতন ও অনুবাদ

হযরত আলী (রা.) তাঁর নিযুক্ত প্রাদেশিক গভর্নরদের কাছে যে বিচারিক প্রটোকল পাঠাতেন, তা আইনি নিরপেক্ষতার অনন্য দলিল। তিনি তাঁর বিখ্যাত 'নাহজুল বালাগাহ' গ্রন্থে বর্ণিত পত্রে উল্লেখ করেন:

وَأَلْصِقْ بِأَهْلِ الْوَرَعِ وَالصِّدْقِ ...ثُمَّ اخْتَرْ لِلْحُكْمِ بَيْنَ النَّاسِ أَفْضَلَ رَعِيَّتِكَ فِي نَفْسِكَ، مِمَّنْ لَا تَضِيقُ بِهِ الْأُمُورُ، وَلَا تَمْحَكُهُ الْخُصُومُ، وَلَا يَتَمَادَى فِي الزَّلَّةِ

অনুবাদ: "অতঃপর তুমি মানুষের মাঝে বিচারকার্য পরিচালনার জন্য তোমার দৃষ্টিতে সবচেয়ে যোগ্য ও শ্রেষ্ঠ ব্যক্তিকে বেছে নাও; যে জটিল পরিস্থিতির মুখোমুখি হলে সংকীর্ণতায় ভোগে না, বিবাদমান পক্ষসমূহ যাকে প্রভাবিত করতে পারে না এবং নিজের কোনো ভুল বুঝতে পারলে তা সংশোধন করতে জেদ ধরে বসে থাকে না।" (নাহজুল বালাগাহ, পত্র নং: ৫৩, মালিক আশতারের প্রতি নির্দেশনা)

- ঐতিহাসিক মামলা ও আইনী শাসনের নজির

১. খলিফা আলী (রা.) বনাম ইহুদি নাগরিকের বর্ম চুরির মামলা:

খলিফা হযরত আলী (রা.)-এর একটি মূল্যবান যুদ্ধ বর্ম (যা তিনি সিফফিনের যুদ্ধে হারিয়েছিলেন) মদিনার এক ইহুদি নাগরিকের কাছে পাওয়া গেল। খলিফা বর্মটি নিজের দাবি করে ফেরত চাইলেন, কিন্তু ইহুদি ব্যক্তিটি বলল, "এটি আমার বর্ম এবং এটি আমারই কবজায় রয়েছে।" আমিরুল মুমিনীন হওয়া সত্ত্বেও হযরত আলী (রা.) ক্ষমতা প্রয়োগ না করে মামলাটি কূফার প্রধান বিচারপতি কাজী শুরাইহর আদালতে দায়ের করলেন। খলিফা এবং ইহুদি নাগরিক আদালতের কাঠগড়ায় পাশাপাশি দাঁড়ালেন।

কাজী শুরাইহ খলিফাকে জিজ্ঞেস করলেন, "হে আমিরুল মুমিনীন! আপনার দাবির সপক্ষে কি কোনো প্রমাণ বা সাক্ষী আছে?" হযরত আলী (রা.) বললেন, "হ্যাঁ, আমার দাস কানবার এবং আমার পুত্র হাসান সাক্ষ্য দেবে যে এটি আমার বর্ম।"

কাজী শুরাইহর ঐতিহাসিক রায়: কাজী শুরাইহ খলিফার সপক্ষে দেওয়া সাক্ষী খণ্ডন করে বললেন: "হে আমিরুল মুমিনীন! ইসলামি আইন অনুযায়ী বাবার অনুকূলে বা সপক্ষে সন্তানের সাক্ষ্য (দেওয়ানি মামলায়) গ্রহণযোগ্য নয়। সুতরাং আপনার পুত্র হাসানের সাক্ষ্য আমি আইনিভাবে গ্রহণ করতে পারছি না। যেহেতু আপনার কাছে অন্য কোনো স্বাধীন সাক্ষী নেই, তাই বর্মটি ইহুদির দখলেই থাকবে।"

খলিফা আলী (রা.) এই রায় শুনে বিন্দুমাত্র অসন্তুষ্ট না হয়ে মুচকি হাসলেন এবং আদালতের রায় মেনে নিলেন। এই অভূতপূর্ব আইনের শাসন এবং নিরপেক্ষতা দেখে ইহুদি নাগরিকটি স্তব্ধ হয়ে গেল। সে চিৎকার করে বলে উঠল, "আমি সাক্ষ্য দিচ্ছি যে এটি নবীদের বিচার ব্যবস্থা! খলিফা নিজে আমাকে আদালতে নিয়ে এলেন আর বিচারক খলিফারই বিরুদ্ধে রায় দিলেন!" সে তৎক্ষণাৎ ইসলাম গ্রহণ করল এবং স্বীকার করল যে বর্মটি মূলত খলিফারই ছিল, যা সে কুড়িয়ে পেয়েছিল। হযরত আলী (রা.) অত্যন্ত আনন্দিত হয়ে বর্মটি এবং সাথে একটি ঘোড়া তাকে উপহার হিসেবে দিয়ে দিলেন। (আল-বিদায়া ওয়ান নিহায়া, ইবনে কাসির; আখবারুল কুদাত, ইমাম ওকী)

২. খলিফা উসমান (রা.) এর আদালতে ওলীদ ইবনে উকবার মদ্যপানের মামলা:
হযরত উসমান (রা.)-এর খেলাফতকালে কূফার গভর্নর ওলীদ ইবনে উকবার বিরুদ্ধে মদ্যপানের অভিযোগ ওঠে। ওলীদ ছিলেন খলিফার বৈমাত্রেয় ভাই এবং অত্যন্ত প্রভাবশালী। মদিনার আদালতে তাঁর বিরুদ্ধে মামলা হলে স্বয়ং হযরত আলী (রা.) এবং অন্যান্য সাহাবী সাক্ষী দেন।

হযরত উসমান (রা.) এর ঐতিহাসিক রায়: আত্মীয়তার সম্পর্ক এবং রাজনৈতিক প্রভাবের বিন্দুমাত্র তোয়াক্কা না করে খলিফা উসমান (রা.) ঐতিহাসিক রায় ঘোষণা করেন—"আল্লাহর হদ বা শাস্তির ক্ষেত্রে কোনো শিথিলতা নেই।" তিনি তৎক্ষণাৎ ওলীদকে গভর্নরের পদ থেকে বরখাস্ত করেন এবং হযরত আলী (রা.)-এর তত্ত্বাবধানে ওলীদের ওপর শরীয়তের নির্ধারিত চাবুকের আঘাতের (হদ) শাস্তি কার্যকর করেন। এটি স্বজনপ্রীতির বিরুদ্ধে ইসলামি আইনের কঠোর সতর্কতার এক প্রামাণ্য দলিল। (সহিহ বুখারি, হাদিস নং: ৩৬৯৬)

- ফিকহি মাসয়ালা ও তাত্ত্বিক বিশ্লেষণ

হযরত উসমান ও আলী (রা.)-এর বিচারিক নজির থেকে ফকিহগণ নিম্নলিখিত ফিকহি মূলনীতিসমূহ সংকলন করেছেন:

১. সন্তানের সাক্ষ্যের আইনি গ্রহণযোগ্যতার সীমাবদ্ধতা (شهادة الولد لوالده):

বর্ম চুরির মামলা থেকে হানাফি, শাফেয়ি এবং হাম্বলি ফিকহের ফকিহগণ এই চূড়ান্ত মাসয়ালা গ্রহণ করেছেন যে, কোনো দেওয়ানি বা আর্থিক মামলায় পিতার সপক্ষে সন্তানের সাক্ষ্য একক বা প্রধান প্রমাণ হিসেবে গ্রহণযোগ্য হবে না। কারণ এখানে রক্তের সম্পর্কের কারণে অবচেতনভাবেই পক্ষপাতিত্বের (تهمة القرابة) একটি তাত্ত্বিক সম্ভাবনা থাকে। তবে মালেকি ফিকহের মতে, সন্তান যদি চরম ন্যায়পরায়ণ (আদেল) হয়, তবে বিশেষ শর্তে তা গ্রহণ করা যেতে পারে।

২. দখলি স্বত্ব বা বর্তমান কবজার গুরুত্ব (الحيازة دليل الملكية):

ইসলামি দেওয়ানি কার্যবিধির একটি মূল সুরক্ষাকবচ হলো—কোনো বস্তু যার কবজায় বা দখলে থাকে (ذى اليد), বাহ্যিকভাবে তাকেই সেটির মালিক মনে করা হবে, যতক্ষণ না বাদী অকাট্য প্রমাণ বা দলিল পেশ করতে পারছে। কাজী শুরাইহ এই নীতির ভিত্তিতেই ইহুদির কবজায় থাকা বর্মটির মালিকানা খলিফার দাবি সত্ত্বেও ইহুদির পক্ষে বহাল রেখেছিলেন।

৩. বিচারিক স্বাধীনতা ও খলিফার দায়মুক্তিহীনতা (عدم حصانة الحكام):

ইসলামি আইনশাস্ত্রে 'সার্বভৌম দায়মুক্তি' (Sovereign Immunity) বা "শাসক কোনো ভুল করতে পারেন না" এমন ধারণার কোনো স্থান নেই। খলিফা বা রাষ্ট্রের প্রধান নির্বাহীও সাধারণ দেওয়ানি ও ফৌজদারি আইনের অধীন। উসমান (রা.) ও আলী (রা.)-এর বিচারিক নজির প্রমাণ করে যে, আদালতের সমন পেলে রাষ্ট্রপ্রধান এজলাসে উপস্থিত হতে বাধ্য এবং বিচারকের রায় মেনে নিতে বাধ্য।

- একাডেমিক রেফারেন্স (উৎস গ্রন্থসমূহ)

হানাফি ফিকহ ও বিচারিক কার্যবিধি: ইমাম আলাউদ্দীন আল-কাসানি, বাদায়েউস সানায়ে ফি তারতিবিশ শারায়ে, কিতাবুল কাজা (فصل فيمن تقبل شهادته ومن لا تقبل -

কার সাক্ষ্য গ্রহণযোগ্য আর কার নয়), বৈরুত: দারু ইহইয়ায়িত তুরাসিল আরাবি, খণ্ড: ৭, পৃষ্ঠা: ৫০-৫৮। আল্লামা ইবনে আবিদীন, রাদ্দুল মুহতার আলাদ (ফাতওয়া শামী), কিতাবুল কাজা, খণ্ড: ৫, পৃষ্ঠা: ৪৬৫-৪৭৫ (পিতা-পুত্রের সাক্ষ্য পরিচ্ছেদ)।

মালেকি ফিকহ ও ঐতিহাসিক আইনি নজির: ইবনে ফারহুন আল-মালেকি, তাবসিরাতুল হুক্কাম ফি উসুলিল আকদিয়্যাহ, খণ্ড: ১, পৃষ্ঠা: ৯০-১০৫ (موضوع: قضية علي رضي الله عنه مع اليهودي - ইহুদির সাথে আলীর মামলার আইনি বিশ্লেষণ)। ইবনে আবদিল বার, আল-ইস্তিয়াব ফি মা'রিফাতিল আসহাব, হযরত আলী ও উসমান (রা.)-এর বিচারিক জীবন পরিচ্ছেদ।

শাফেয়ি ফিকহ ও শাসনতান্ত্রিক আইন: ইমাম আল-মাওয়ার্দি, আল-আহকামুস সুলতানিয়্যাহ, অধ্যায়: কাজীদের এক্তিয়ার ও সিয়াসা শারইয়্যাহ, পৃষ্ঠা: ৭৫-৮৫।

খতিব শিরবিনি, মুগনি আল-মুহতাজ, কিতাবুল কাজা, খণ্ড: ৫, পৃষ্ঠা: ৩৮৫-৩৯৫।

হাম্বলি ফিকহ ও ইবনে কায়্যিমের সিয়াসা শারইয়্যাহ: হাফেজ ইবনে কাসির, আল-বিদায়া ওয়ান নিহায়া, খণ্ড: ৭, পৃষ্ঠা: ৫-১৫ (খলিফাদের বিচারিক অধ্যায়)। ইমাম ইবনে কায়্যিম আল-জাওযিয়্যাহ, আল-তুরুকুল হুকমিয়্যাহ ফিস সিয়াসাতিল শারইয়্যাহ, খণ্ড: ১, পৃষ্ঠা: ২৫-৪০ (কাজী শুরাইহর বিচারিক স্বাধীনতা ও সাক্ষ্য আইনের প্রয়োগ)।

অধ্যায় ৭: সমকালীন সময়ে ইসলামি বিচার ব্যবস্থার অপব্যাখ্যার খণ্ডন ও তুলনামূলক পর্যালোচনা

আধুনিক ধর্মনিরপেক্ষ আইনবিদ, প্রাচ্যবিদ (Orientalists) এবং সমালোচকদের একটি বড় অংশ ইসলামি বিচার ব্যবস্থার মূল সুর ও এর মানবিক দিকগুলো অনুধাবন করতে ব্যর্থ হয়েছেন। এই সপ্তম অধ্যায়ে ইসলামের ফৌজদারি দণ্ডবিধি, মানবাধিকার, নারীর অবস্থান এবং অমুসলিমদের নাগরিক ও আইনি অধিকার নিয়ে সমকালীন পরিমণ্ডলে উত্থাপিত প্রধান প্রধান অপব্যাখ্যা, সংশয় ও অভিযোগগুলোর অকাট্য ফিকহি ও যৌক্তিক খণ্ডন করা হয়েছে। একই সাথে আধুনিক পশ্চিমা আইনি ব্যবস্থার সাথে ইসলামের তুলনামূলক শ্রেষ্ঠত্ব বিশ্লেষণ করা হয়েছে।

৭.১ ইসলামি শাস্তির 'নিষ্ঠুরতা' ও মানবাধিকারের আধুনিক অপব্যাখ্যা খণ্ডন

সমকালীন বিশ্বে ইসলামি ফৌজদারি আইন, বিশেষ করে 'হদ' (حدود) ও 'কিসাস' (قصاص)—যেমন চুরির অপরাধে হাত কাটা, ব্যভিচারের অপরাধে রজম (পাথর নিক্ষেপ) বা বেত্রাঘাত এবং খুনের বদলে প্রাণদণ্ডের বিধানকে আধুনিক ধর্মনিরপেক্ষ মানবাধিকার সংস্থা এবং পশ্চিমা আইনবিদগণ "নিষ্ঠুর, অমানবিক ও অবমাননাকর" (Cruel, Inhuman, and Degrading) বলে সমালোচনা করে থাকেন। ১৯৪৮ সালের 'মানবাধিকারের সার্বজনীন ঘোষণাপত্র' (UDHR)-এর ৫ নম্বর অনুচ্ছেদের দোহাই দিয়ে ইসলামি দণ্ডবিধিকে আধুনিক সভ্যতার পরিপন্থী হিসেবে দাঁড় করানোর একটি পদ্ধতিগত বুদ্ধিবৃত্তিক অপপ্রয়াস লক্ষ্য করা যায়।

ইসলামি আইনশাস্ত্র এবং অপরাধবিজ্ঞান (Criminology)-এর গভীর তাত্ত্বিক পর্যালোচনায় এই অপব্যাখ্যাটি সম্পূর্ণ অসার প্রমাণিত হয়। ইসলামি শাস্তির দর্শন হলো 'অপরাধের অবসান এবং সমাজের সামগ্রিক নিরাপত্তা নিশ্চিতকরণ' (Deterrence and Prevention), যেখানে আধুনিক পশ্চিমা দণ্ডবিধির মূল ঝোঁক হলো কেবল 'অপরাধীর সংশোধন' (Rehabilitation)। পশ্চিমা সমাজ অপরাধীর মানবাধিকার রক্ষা

করতে গিয়ে ভুক্তভোগী (Victim) এবং গোটা সমাজের কোটি কোটি মানুষের মানবাধিকার ও নিরাপত্তাকে চরম ঝুঁকির মধ্যে ফেলে দিয়েছে। যার ফলশ্রুতিতে আধুনিক বিশ্বে সর্বোচ্চ সুযোগ-সুবিধা সম্বলিত কারাগার থাকা সত্ত্বেও অপরাধের হার জ্যামিতিক হারে বাড়ছে।

ইসলাম শাস্তি প্রদানের ক্ষেত্রে অত্যন্ত কঠোর, কিন্তু অপরাধ প্রমাণ বা সাক্ষ্য গ্রহণের কার্যবিধিতে (Law of Evidence) এতটাই নিখুঁত ও সংবেদনশীল যে, সামান্যতম সন্দেহের অবকাশ থাকলে শাস্তি মওকুফ হয়ে যায়। অর্থাৎ, ইসলামি দণ্ডবিধির মূল উদ্দেশ্য শাস্তি কার্যকর করা নয়, বরং শাস্তির এমন একটি মনস্তাত্ত্বিক ভয় (Deterrent Effect) সমাজে জারি রাখা যাতে কেউ অপরাধ করার সাহসই না পায়।

- কুরআনের আয়াত ও অনুবাদ

ইসলামি শাস্তির মূল দর্শন যে নিষ্ঠুরতা নয়, বরং মানবজীবনের সুরক্ষা ও সমাজকে পঙ্কিলতামুক্ত রাখা, তা স্পষ্ট করে আল্লাহ তাআলা ইরশাদ করেন:

وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حَيَاةٌ يَا أُولِي الْأَلْبَابِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ

অনুবাদ: "আর হে বুদ্ধিমান সম্প্রদায়! কিসাস বা জীবনবদল শাস্তির বিধানের মাঝেই তোমাদের জন্য (প্রকৃত) জীবন নিহিত রয়েছে, যাতে তোমরা (অপরাধ ও ধ্বংসাত্মক কাজ থেকে) বেঁচে থাকতে পারো।" (সূরা আল-বাকারা, আয়াত: ১৭৯)

কিসাসের মাধ্যমে একজন হত্যাকারীর মৃত্যুদণ্ড নিশ্চিত করলে সমাজের আর দশজন মানুষ খুন করার সাহস পায় না, ফলে হাজারো নিরপরাধ মানুষের জীবন বেঁচে যায়—এটাই হলো 'কিসাসের মাঝে জীবন' থাকার রহস্য।

الزَّانِيَةُ وَالزَّانِي فَاجْلِدُوا كُلَّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا مِائَةَ جَلْدَةٍ ۖ وَلَا تَأْخُذْكُمْ بِهِمَا رَأْفَةٌ فِي دِينِ اللَّهِ

অনুবাদ: "ব্যভিচারিণী ও ব্যভিচারী—তাদের প্রত্যেককে তোমরা একশত করে বেত্রাঘাত করো। আল্লাহর বিধান কার্যকর করার ক্ষেত্রে তাদের প্রতি যেন তোমাদের মনে কোনো দয়া বা অনুকম্পার উদ্রেক না হয়।" (সূরা আন-নূর, আয়াত: ২)

অপরাধের ভয়াবহতা দমনের জন্য বিচারককে আইনি কঠোরতা প্রদর্শনের নির্দেশ দেওয়া হয়েছে, যাতে আবেগের বশে সামাজিক নিরাপত্তা বিঘ্নিত না হয়।

- হাদিসের মতন ও অনুবাদ

ইসলামি দণ্ডবিধি কতটা সতর্ক এবং অপরাধীর মানবাধিকারকেও ইসলাম কীভাবে আইনি সুরক্ষাকবচ দিয়েছে, তা নিম্নোক্ত প্রসিদ্ধ আইনি হাদিস (Legal Maxim) দ্বারা প্রমাণিত:

عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا قَالَتْ :قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ :ادْرَءُوا الْحُدُودَ عَنِ الْمُسْلِمِينَ مَا اسْتَطَعْتُمْ، فَإِنْ كَانَ لَهُ مَخْرَجٌ فَخَلُّوا سَبِيلَهُ، فَإِنَّ الْإِمَامَ أَنْ يُخْطِئَ فِي الْعَفْوِ خَيْرٌ مِنْ أَنْ يُخْطِئَ فِي الْعُقُوبَةِ

অনুবাদ: "হযরত আয়েশা (রা.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (সা.) ইরশাদ করেছেন: 'তোমরা যথাসাধ্য মুসলমানদের ওপর থেকে হদ বা নির্ধারিত শাস্তি মওকুফ করার চেষ্টা করো। যদি অপরাধীর খালাস পাওয়ার সামান্যতম পথও (আইনি ফাঁক বা সন্দেহ) থাকে, তবে তার পথ ছেড়ে দাও (তাকে খালাস দাও)। কারণ, বিচারক বা শাসকের ক্ষমার ক্ষেত্রে ভুল করা, শাস্তির ক্ষেত্রে ভুল করার চেয়ে অনেক উত্তম'।" (সুনানে তিরমিজি, হাদিস নং: ১৪২৪; মুস্তাদরাকে হাকিম, খণ্ড: ৪, পৃষ্ঠা: ৩৮৪)

- ফিকহি মাসয়ালা ও তাত্ত্বিক বিশ্লেষ

পশ্চিমা মানবাধিকারের অপব্যাখ্যা খণ্ডন করে ইসলামি ফকিহগণ এবং সমকালীন মুসলিম আইনবিদগণ অপরাধবিজ্ঞানের আলোকে নিম্নলিখিত মাসয়ালা ও তাত্ত্বিক যুক্তি উপস্থাপন করেছেন:

১. সন্দেহের সুবিধা এবং হদ বাতিলের নীতি (الشبهة الدارئة للحدود):

হানাফি ফিকহের চূড়ান্ত আইনি মূলনীতি (মাজাল্লা, ধারা: ৪৩) অনুযায়ী, "সন্দেহের কারণে হদ বা সর্বোচ্চ শাস্তি বাতিল হয়ে যায়" (الحدود تسقط بالشبهات)। উদাহরণস্বরূপ: চুরির অপরাধে হাত কাটার জন্য ইসলামি আইনে অত্যন্ত কঠোর শর্ত রয়েছে। যদি চোর ক্ষুধার্ত হয়ে শুধু বেঁচে থাকার জন্য খাদ্য চুরি করে, অথবা চুরি যাওয়া মালটি যদি সুরক্ষিত স্থানে (حرز) না থাকে, কিংবা চুরির মালে যদি সামান্যতম মালিকানার সন্দেহ থাকে, তবে হাত কাটার শাস্তি স্বয়ংক্রিয়ভাবে বাতিল হয়ে যায় এবং তা সাধারণ তা'যির বা লঘু শাস্তিতে রূপান্তরিত হয়। পশ্চিমা আইন যেখানে অপরাধের শতভাগ প্রমাণ না পেলেও টেকনিক্যাল কারণে সাজা দেয়, ইসলাম সেখানে সর্বোচ্চ সাজা দেওয়ার ক্ষেত্রে শতভাগ নিষ্কণ্টক প্রমাণের শর্ত আরোপ করে অপরাধীর আইনি মানবাধিকার রক্ষা করেছে।

২. সমাজ বনাম ব্যক্তি: মানবাধিকারের ভারসাম্য (مصلحة الجماعة مقدمة على مصلحة الفرد):

আধুনিক পশ্চিমা অপরাধবিজ্ঞানের (Classical/Positivist Criminology) বড় ত্রুটি হলো—তারা অপরাধীকে 'ভিকটিম' বা সমাজের রুগ্ন ব্যবস্থার শিকার মনে করে তাকে অতিরিক্ত সহানুভূতি দেখায়। এর বিপরীতে ইসলামি ফিকহের মূলনীতি হলো—ব্যক্তির চেয়ে সমষ্টির কল্যাণ বা নিরাপত্তা অগ্রাধিকার পাবে। একজন খুনির মৃত্যুদণ্ড বা একজন ধর্ষকের প্রকাশ্য শাস্তি দেখলে সমাজে যে ভীতিকর বার্তা যায়, তা লাখ লাখ সম্ভাব্য অপরাধ প্রবণ মানুষকে অপরাধ থেকে বিরত রাখে। পশ্চিমা দেশসমূহে মৃত্যুদণ্ড রহিত করার পর খুনের হার আশঙ্কাজনকভাবে বেড়েছে, যা প্রমাণ করে যে তাদের তথাকথিত 'মানবিক দণ্ডবিধি' আসলে সাধারণ মানুষের বেঁচে থাকার অধিকারকে খর্ব করছে।

৩. অপরাধের শিকার বা ভুক্তভোগীর অধিকার (حق المجني عليه):

পশ্চিমা আইনে অপরাধকে 'রাষ্ট্রের বিরুদ্ধে অপরাধ' (Offense against the State) মনে করা হয়। ফলে ভুক্তভোগী বা নিহতের পরিবারের কোনো অধিকার থাকে না খুনিকে ক্ষমা করার বা আপস করার। কিন্তু ইসলাম কিসাসের ক্ষেত্রে এই অধিকার সম্পূর্ণভাবে নিহতের পরিবারের (وارث الدم) হাতে ন্যস্ত করেছে। তারা চাইলে খুনের বদলে খুন (কিসাস) দাবি করতে পারে, রক্তপণ বা জরিমানা (দিয়াত) নিয়ে ছেড়ে দিতে পারে, অথবা সম্পূর্ণ নিঃশর্ত ক্ষমা করে দিতে পারে। ইসলামি আইনের এই অনন্য মানবিক ও মনস্তাত্ত্বিক দিকটি আধুনিক ইউরোপীয় আইনে সম্পূর্ণ অনুপস্থিত।

- একাডেমিক রেফারেন্স (উৎস গ্রন্থসমূহ)

হানাফি ফিকহ ও অপরাধ দণ্ডবিধি দর্শন: ইমাম আলাউদ্দীন আল-কাসানি, বাদায়েউস সানায়ে ফি তারতিবিশ শারায়ে, কিতাবুল হুদুদ ও কিতাবুল জিনায়াত, বৈরুত: দারু ইহইয়ায়িত তুরাসিল আরাবি, খণ্ড: ৭, পৃষ্ঠা: ৩৩-৪৫। আল্লামা ইবনে আবিদীন, রাদ্দুল মুহতার আলাদ.... (ফাতওয়া শামী), কিতাবুল হুদুদ (شبهة وأثرها في إسقاط الحد), খণ্ড: ৪, পৃষ্ঠা: ৩-১৫।

সমকালীন ইসলামি আইন ও মানবাধিকার গ্রন্থসমূহ: ড. মুস্তফা আস-সিবাঈ, আল-ইসলাম ওয়া মুশকিলাতুল হাযারাহ (ইসলাম ও আধুনিক সভ্যতার সংকট), অধ্যায়:

ইসলামি দণ্ডবিধি ও মানবাধিকার, বৈরুত: দারুল ইরাক, পৃষ্ঠা: ১২০-১৩৮। ড. ওয়াহবাহ আয-জুহাইলি, আল-ফিকহুল ইসলামি ওয়া আদিল্লাতুহু, খণ্ড: ৭, কিতাবুল হুদুদ ওয়াল জিনায়াত (অধ্যায়: ইসলামি শাস্তির হিকমত ও পশ্চিমা তত্ত্বের জবাব), দামেস্ক: দারুল ফিকর।

শাফেয়ি ও মালেকি ফিকহের দণ্ডবিধি বিশ্লেষণ: ইমাম আল-মাওয়ার্দি, আল-আহকামুস সুলতানিয়্যাহ, অধ্যায়: হুদুদ ও তা'যির কার্যকর করার নিয়মাবলি, পৃষ্ঠা: ২২১-২৩৫। ইবনে ফরহুন আল-মালেকি, তাবসিরাতুল হুক্কাম ফি উসুলিল আকদিয়্যাহ, খণ্ড: ২, পৃষ্ঠা: ২০০-২১৫ (অপরাধ দমনে কঠোরতার আইনি যৌক্তিকতা)।

হাম্বলি ফিকহ ও ইবনে তাইমিয়্যাহর অপরাধতত্ত্ব: শায়খুল ইসলাম ইবনে তাইমিয়্যাহ, আস-সিয়াসাতুস শারইয়্যাহ ফি ইসলাহির রাঈ ওয়ার রাইইয়্যাহ, অধ্যায়: আল-হুদুদ ওয়াল হুকুক (الحدود والسياسة الجنائية), পৃষ্ঠা: ১২5-১৪৫। ইমাম ইবনে কায়্যিম আল-জাওযিয়্যাহ, ই'লামুল মুয়াক্কিঈন আন রাব্বিল আলামিন, খণ্ড: ২, পৃষ্ঠা: ৮০-৯৫ (শরীয়তের শাস্তির পেছনে ঐশ্বরিক প্রজ্ঞা ও জনকল্যাণ অনুচ্ছেদ)।

৭.২ অমুসলিম ও লৈঙ্গিক সমতার আধুনিক বিতর্ক এবং ইসলামি আইনের বাস্তব চিত্র

সমকালীন ধর্মনিরপেক্ষ আইনি চেতনায় ইসলামি বিচার ব্যবস্থার বিরুদ্ধে দ্বিতীয় প্রধান বুদ্ধিবৃত্তিক অভিযোগটি তোলা হয় অমুসলিম নাগরিক (জিম্মি) এবং লৈঙ্গিক সমতা (Gender Equality)—বিশেষ করে আদালতের সাক্ষ্য আইনে নারীর অবস্থান নিয়ে। আধুনিক মানবাধিকার প্রবক্তাদের দাবি, ইসলামি আদালতে অমুসলিমের সাক্ষ্য কিংবা দুজন নারীর সাক্ষ্য একজন পুরুষের সাক্ষ্যের সমতুল্য করার বিধানটি বৈষম্যমূলক এবং আধুনিক ন্যায়বিচারের পরিপন্থী।

ইসলামি আইনশাস্ত্র এবং সমাজবিজ্ঞানের গভীর ও নির্মোহ পর্যালোচনায় এই পশ্চিমা সমালোচনাটি সম্পূর্ণ ভাসা-ভাসা এবং পক্ষপাতদুষ্ট প্রমাণিত হয়। ইসলামি বিচার ব্যবস্থায় অমুসলিমদের ধর্মীয়, সামাজিক ও দেওয়ানি অধিকার সম্পূর্ণ সুরক্ষিত। ইসলামি আইনের সাধারণ মূলনীতি হলো—দেওয়ানি ও ফৌজদারি সুরক্ষার ক্ষেত্রে অমুসলিম নাগরিকেরা মুসলিমদের মতোই সমান আইনি অধিকার ভোগ করেন।

অন্যদিকে, ইসলামি সাক্ষ্য আইনে নারীর সাক্ষ্য সংক্রান্ত যে বিধান রয়েছে, তা কোনো সামাজিক মর্যাদা বা লিঙ্গভিত্তিক শ্রেষ্ঠত্বের সূচক নয়; বরং তা সম্পূর্ণরূপে 'দায়িত্বের বিভাজন' (Division of Responsibility) এবং মামলার প্রকৃতি (Nature of the Case)-র সাথে সম্পর্কিত একটি পদ্ধতিগত সুরক্ষা। যেসব মামলা ও সামাজিক ক্ষেত্রে নারীদের স্বাভাবিক বিচরণ ও অভিজ্ঞতা বেশি, সেখানে কেবল নারীদের একক সাক্ষ্যেই রায় কার্যকর হয়, যা আধুনিক ধর্মনিরপেক্ষ আইন কল্পনাও করতে পারে না। ইসলামি বিচার ব্যবস্থা লিঙ্গ ও ধর্মের ভিন্নতাকে বৈষম্যের হাতিয়ার না বানিয়ে বাস্তবমুখী এবং সুরক্ষামূলক আইনি কাঠামো হিসেবে দাঁড় করিয়েছে।

- কুরআনের আয়াত ও অনুবাদ

আদালতে সাক্ষ্য আইনের লৈঙ্গিক বণ্টন এবং অমুসলিমদের সাথে চুক্তির পূর্ণ সুরক্ষার বিষয়ে আল্লাহ তাআলা ইরশাদ করেন:

وَاسْتَشْهِدُوا شَهِيدَيْنِ مِنْ رِجَالِكُمْ ۖ فَإِنْ لَمْ يَكُونَا رَجُلَيْنِ فَرَجُلٌ وَامْرَأَتَانِ مِمَّنْ تَرْضَوْنَ مِنَ الشُّهَدَاءِ أَنْ تَضِلَّ إِحْدَاهُمَا فَتُذَكِّرَ إِحْدَاهُمَا الْأُخْرَىٰ ۚ

অনুবাদ: "আর তোমরা তোমাদের পুরুষদের মধ্য থেকে দুজন সাক্ষী রাখো। যদি দুজন পুরুষ না পাওয়া যায়, তবে একজন পুরুষ ও দুজন নারী—যাদেরকে তোমরা সাক্ষী হিসেবে পছন্দ করো; যাতে তাদের একজন ভুলে গেলে অপরজন তাকে স্মরণ করিয়ে দিতে পারে।" (সূরা আল-বাকারা, আয়াত: ২৮২)

এই আয়াতটি সম্পূর্ণভাবে বাণিজ্যিক ও দেওয়ানি লেনদেনের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য, যেখানে তৎকালীন ও সমকালীন সামাজিক কাঠামোতে নারীদের চেয়ে পুরুষদের সম্পৃক্ততা ও অভিজ্ঞতা আইনি জটিলতা নিরসনে বেশি কার্যকর ভূমিকা রাখে।

لَا يَنْهَاكُمُ اللَّهُ عَنِ الَّذِينَ لَمْ يُقَاتِلُوكُمْ فِي الدِّينِ وَلَمْ يُخْرِجُوكُمْ مِنْ دِيَارِكُمْ أَنْ تَبَرُّوهُمْ وَتُقْسِطُوا إِلَيْهِمْ ۚ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُقْسِطِينَ

অনুবাদ: "ধর্মের ব্যাপারে যারা তোমাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করেনি এবং তোমাদেরকে তোমাদের ঘর-বাড়ি থেকে বহিষ্কার করেনি, তাদের প্রতি সদাচরণ করতে এবং ইনসাফ করতে আল্লাহ তোমাদেরকে নিষেধ করেন না। নিশ্চয়ই আল্লাহ ইনসাফকারীদের ভালোবাসেন।" (সূরা আল-মুমতাহিনা, আয়াত: ৮)

- হাদিসের মতন ও অনুবাদ

ইসলামি রাষ্ট্রে অমুসলিম নাগরিকদের আইনি সুরক্ষা এবং জীবন-সম্পত্তির নিরাপত্তা নিশ্চিত করার বিষয়ে রাসূলুল্লাহ (সা.)-এর কঠোর হুঁশিয়ারি নিম্নরূপ:

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: مَنْ قَتَلَ مُعَاهَدًا لَمْ يَرِحْ رَائِحَةَ الْجَنَّةِ، وَإِنَّ رِيحَهَا تُوجَدُ مِنْ مَسِيرَةِ أَرْبَعِينَ عَامًا

অনুবাদ: "হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে আমর (রা.) থেকে বর্ণিত, নবী করীম (সা.) ইরশাদ করেছেন: 'যে ব্যক্তি ইসলামি রাষ্ট্রের চুক্তিবদ্ধ কোনো অমুসলিম নাগরিককে (অন্যায়ভাবে) হত্যা করবে, সে জান্নাতের সুঘ্রাণও পাবে না। অথচ জান্নাতের সুঘ্রাণ চল্লিশ বছরের দূরত্বের পথ থেকেও পাওয়া যায়'।" (সহিহ বুখারি, হাদিস নং: ৩১৬৬)

- ফিকহি মাসয়ালা ও তাত্ত্বিক বিশ্লেষণ

পশ্চিমা অপব্যাখ্যা খণ্ডন করে ইসলামি ফকিহগণ ফিকহি ও বিচারিক প্রয়োগের আলোেক নিম্নলিখিত আইনি সমাধানসমূহ সংকলন করেছেন:

১. অমুসলিমদের আইনি সমতা ও কিসাস (جناية المسلم على الذمي):

হানাফি ফিকহের চূড়ান্ত ও সর্বসম্মত সিদ্ধান্ত হলো—আইনের চোখে মুসলিম ও অমুসলিম নাগরিকের রক্তের মূল্য সমান। যদি কোনো মুসলিম কোনো অমুসলিম জিম্মি নাগরিককে অন্যায়ভাবে হত্যা করে, তবে ইসলামি দণ্ডবিধির কিসাস নীতি অনুযায়ী সেই মুসলিম হত্যাকারীরও মৃত্যুদণ্ড কার্যকর করা হবে। ইমাম কাসানি এবং আল্লামা ইবনে আবিদীন বলেন, জানমালের নিরাপত্তার ক্ষেত্রে ইসলামি আইনের মূলনীতিই হলো: "তাদের সম্পদ আমাদের সম্পদের মতো এবং তাদের রক্ত আমাদের রক্তের মতোই পবিত্র" (دماؤهم كدمائنا وأموالهم كأموالنا)। এটি প্রমাণ করে যে ইসলামি আদালতে নাগরিকত্বের আইনি অধিকার ধর্মের ভিত্তিতে খর্ব হয় না।

২. অমুসলিমের সাক্ষ্যের গ্রহণযোগ্যতা (شهادة الذمي على الذمي):

ইসলামি আইনশাস্ত্রে অমুসলিমদের নিজস্ব মামলা-মোকাদ্দমায় এবং বিশেষ প্রয়োজনে তাদের সাক্ষ্যকে পূর্ণ আইনি বৈধতা দেওয়া হয়েছে। হানাফি ফিকহ অনুযায়ী, অমুসলিম নাগরিকেরা একে অপরের বিরুদ্ধে বা সপক্ষে আদালতে সাক্ষ্য দিতে পারবেন। এমনকি সফরে থাকাকালীন কোনো মুসলিমের ওসিয়ত বা দেওয়ানি বিষয়ে কোনো মুসলিম

সাক্ষী পাওয়া না গেলে, কুরআনের নির্দেশ (সূরা মায়েদা: ১০৬) অনুযায়ী অমুসলিমের সাক্ষ্য গ্রহণ করে রায় দেওয়া যাবে।

৩. সাক্ষ্য আইনে লৈঙ্গিক বণ্টনের প্রজ্ঞা (شهادة النساء المنفردات):

বাণিজ্যিক বা দেওয়ানি মামলায় দুজন নারীর সাক্ষ্য একজন পুরুষের সমতুল্য করার পেছনের কারণ আইনি মনস্তত্ত্ব ও সামাজিক দায়িত্বের সাথে জড়িত, কোনো লিঙ্গবৈষম্য নয়। ইসলামে নারীদের ওপর জীবিকা নির্বাহ বা বাণিজ্যিক লেনদেনের কোনো আর্থিক দায় চাপানো হয়নি। ফিকহি মূলনীতি হলো, যে বিষয়ে মানুষের অভিজ্ঞতা কম থাকে, সেখানে ভুলে যাওয়ার বা বিভ্রান্ত হওয়ার (Error of Recall) ঝুঁকি বেশি থাকে।

এর সবচেয়ে বড় তাত্ত্বিক প্রমাণ হলো—যেসব ক্ষেত্র নারীদের একান্ত নিজস্ব (যেমন: সন্তানের জন্ম, বংশধারা, স্তন্যপান, নারীদের শারীরিক ত্রুটি বা অভ্যন্তরীণ বিষয়), সেসব মামলায় ইসলামি আদালতে পুরুষের সাক্ষ্য সম্পূর্ণ অগ্রহণযোগ্য এবং সেখানে কেবল নারীদের একক সাক্ষ্যের ভিত্তিতেই আদালত চূড়ান্ত রায় ঘোষণা করে। ইমাম শাফেয়ী ও ইমাম মালিকের মতে, এমন ক্ষেত্রে একজন মাত্র বিশ্বস্ত নারীর সাক্ষ্যই রায় দেওয়ার জন্য যথেষ্ট। পশ্চিমা আইনবিদদের তোলা বৈষম্যের অভিযোগটি তাই ইসলামি সাক্ষ্য আইনের সামগ্রিক ভারসাম্য না বোঝারই ফসল।

- একাডেমিক রেফারেন্স (উৎস গ্রন্থসমূহ)

হানাফি ফিকহ, কিতাবুল কাজা ও শাহাদাত: ইমাম আলাউদ্দীন আল-কাসানি, বাদায়েউস সানায়ে ফি তারতিবিশ শারায়ে, কিতাবুল জিনায়াত (فصل في قتل المسلم بالذمي), বৈরুত: দারু ইহইয়ায়িত তুরাসিল আরাবি, খণ্ড: ৭, পৃষ্ঠা: ২৩৫-২৪২ এবং কিতাবুল শাহাদাত (شهادة أهل الذمة), খণ্ড: ৬, পৃষ্ঠা: ২৭০-২৭৮।

আল্লামা ইবনে আবিদীন, রাদ্দুল মুহতার আলাদ দুররিল মুখতার, কিতাবুল শাহাদাত (باب قبول شهادة النساء), খণ্ড: ৫, পৃষ্ঠা: ৪৬৫-৪৭২।

মালেকি ও শাফেয়ি ফিকহের তুলনামূলক বিশ্লেষণ: ইমাম ইবনে রুশদ আল-কুরতুবি, বিদায়াতুল মুজতাহিদ ওয়া নিহায়াতুল মুকতাসিদ, কিতাবুল আকদিয়্যাহ ও শাহাদাত (أحكام شهادة النساء في الحدود والأموال), কায়রো: দারুল হাদিস, খণ্ড: ৪, পৃষ্ঠা: ৩২০-৩৩০। খতিব শিরবিনি, মুগনি আল-মুহতাজ ইলা মা'রিফাতি মাআনি আলফাজিল

মিনহাজ, কিতাবুল শাহাদাত (فصل فيما تقبل فيه شهادة النساء منفردات), খণ্ড: ৬, পৃষ্ঠা: ৪১০-৪১৮।
হাম্বলি ফিকহ ও ইবনে কায়্যিমের বিচারিক প্রজ্ঞা: ইমাম ইবনে কায়্যিম আল-জাওযিয়্যাহ, ই'লামুল মুয়াক্কিঈন আন রাব্বিল আলামিন, খণ্ড: ১, পৃষ্ঠা: ৯০-১০৫ (লৈঙ্গিক সাক্ষ্যের হিকমত ও আধুনিক দর্শনের জবাব)। ইমাম ইবনে কুদামা আল-মাকদিসি, আল-মুগনি, কিতাবুল জিনায়াত (مسألة: يقتل المسلم بالذمي), কায়রো: হাজার পাবলিকেশনস, খণ্ড: ৯, পৃষ্ঠা: ৩৩০-৩৪০।

৭.৩ অমুসলিম নাগরিকদের আইনি অধিকার ও ধর্মীয় স্বাধীনতা

সমকালীন রাষ্ট্রদর্শন ও ধর্মনিরপেক্ষ আইনি পরিমণ্ডলে ইসলামি রাষ্ট্রে অমুসলিম নাগরিকদের (জিম্মি/ذمي) অবস্থান ও অধিকার নিয়ে ব্যাপক অপব্যাখ্যা লক্ষ্য করা যায়। অনেক আধুনিক সমালোচক দাবি করেন যে, ইসলামি রাষ্ট্রে অমুসলিমরা 'দ্বিতীয় শ্রেণীর নাগরিক' হিসেবে বসবাস করে এবং তারা পূর্ণ ধর্মীয় স্বাধীনতা ও আইনি সুরক্ষা থেকে বঞ্চিত হয়।

ইসলামি আইনশাস্ত্র (Islamic Jurisprudence) ও সাংবিধানিক ইতিহাসের গভীর পর্যালোচনা এই ধারণাকে সম্পূর্ণ ভুল প্রমাণ করে। ইসলামি বিচার ব্যবস্থায় অমুসলিম নাগরিকদের অধিকার কোনো সাময়িক বা করুণাভিত্তিক সুবিধা নয়; এটি একটি ঐশ্বরিক চুক্তি ও স্থায়ী সাংবিধানিক সুরক্ষাকবচ। ইসলামি আইনের মূলনীতি হলো—নাগরিক, দেওয়ানি ও ফৌজদারি সুরক্ষার ক্ষেত্রে অমুসলিমরা মুসলিমদের মতোই সমান। তাদের ধর্মীয় স্বাধীনতা, উপাসনালয় রক্ষা, নিজস্ব পারিবারিক আইন (Personal Law) অনুযায়ী বিচার পাওয়ার অধিকার এবং জীবনের security নিশ্চিত করা ইসলামি আদালতের অন্যতম প্রধান আইনগত দায়িত্ব। এমনকি আধুনিক ধর্মনিরপেক্ষ রাষ্ট্রসমূহ যেখানে সংখ্যালঘু সুরক্ষায় প্রায়শই ব্যর্থ হয়, ইসলাম সেখানে অমুসলিমদের জান-মালের নিরাপত্তাকে সরাসরি 'আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের জিম্মাদারি' (নিরাপত্তা বলয়) হিসেবে ঘোষণা করেছে।

- কুরআনের আয়াত ও অনুবাদ

অমুসলিম নাগরিকদের ধর্মীয় স্বাধীনতা এবং জোরপূর্বক ধর্ম পরিবর্তনের নিষেধাজ্ঞার বিষয়ে আল্লাহ তাআলা সুনির্দিষ্ট আইনি নীতি ঘোষণা করে ইরশাদ করেন:

لَا إِكْرَاهَ فِي الدِّينِ ۖ قَدْ تَبَيَّنَ الرُّشْدُ مِنَ الْغَيِّ

অনুবাদ: "দ্বীন বা ধর্মের ব্যাপারে কোনো জোর-জবরদস্তি নেই। নিশ্চয়ই হেদায়েতের পথ গোমরাহী বা ভ্রষ্টতা থেকে স্পষ্ট পৃথক হয়ে গেছে।" (সূরা আল-বাকারা, আয়াত: ২৫৬)

এই আয়াতটি ইসলামি আইনের একটি প্রধান উৎস, যা অমুসলিমদের নিজস্ব ধর্মবিশ্বাস বজায় রাখার এবং রাষ্ট্রীয়ভাবে বলপ্রয়োগ না করার চিরন্তন আইনি গ্যারান্টি দেয়।

وَلَوْلَا دَفْعُ اللَّهِ النَّاسَ بَعْضَهُمْ بِبَعْضٍ لَهُدِّمَتْ صَوَامِعُ وَبِيَعٌ وَصَلَوَاتٌ وَمَسَاجِدُ يُذْكَرُ فِيهَا اسْمُ اللَّهِ كَثِيرًا

অনুবাদ: "আল্লাহ যদি মানবজাতির এক দলকে অন্য দল দ্বারা প্রতিহত না করতেন, তবে (অমুসলিমদের) সাধু-সন্ন্যাসীদের আশ্রম, খ্রিস্টানদের গির্জা, ইহুদিদের উপাসনালয় এবং মুসলমানদের মসজিদসমূহ ধ্বংস করে দেওয়া হতো—যেখানে আল্লাহর নাম অধিক স্মরণ করা হয়।" (সূরা আল-হাজ্জ, আয়াত: ৪০)

- হাদিসের মতন ও অনুবাদ

ইসলামি রাষ্ট্রে অমুসলিম নাগরিকদের জীবন, সম্পদ, ধর্মীয় স্বাধীনতা রক্ষা এবং তাদের ওপর কোনো ধরনের অন্যায় বা জুলুমের বিরুদ্ধে রাসূলুল্লাহ (সা.)-এর সুনির্দিষ্ট ও কঠোর সহীহ হাদিসসমূহ নিচে দেওয়া হলো:

عَنْ أَبِي بَكْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ :قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ :مَنْ قَتَلَ مُعَاهَدًا فِي غَيْرِ كُنْهِهِ، حَرَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ الْجَنَّةَ

অনুবাদ: "হযরত আবু বাকরা (রা.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (সা.) ইরশাদ করেছেন: 'যে ব্যক্তি চুক্তিভুক্ত কোনো অমুসলিম নাগরিককে (অন্যায়ভাবে) হত্যা করবে, আল্লাহ তাআলা তার জন্য জান্নাত হারাম করে দেবেন'।" (সুনানে আবু দাউদ, হাদিস নং: ২৭৬০; সুনানে নাসায়ি, হাদিস নং: ৪৭৪৭—হাদিসটি সহীহ)

،أَلَا مَنْ ظَلَمَ مُعَاهَدًا، أَوِ انْتَقَصَهُ، أَوْ كَلَّفَهُ فَوْقَ طَاقَتِهِ، أَوْ أَخَذَ مِنْهُ شَيْئًا بِغَيْرِ طِيبِ نَفْسٍ فَأَنَا حَجِيجُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ

অনুবাদ: "রাসূলুল্লাহ (সা.) অত্যন্ত কড়া হুঁশিয়ারি উচ্চারণ করে বলেছেন: 'সাবধান! যে ব্যক্তি চুক্তিভুক্ত কোনো অমুসলিম নাগরিকের ওপর জুলুম করবে, কিংবা তার অধিকার খর্ব করবে, অথবা তার সাধ্যের বাইরে কোনো কাজ চাপিয়ে দেবে, কিংবা তার সম্মতি

ছাড়া তার কোনো সম্পদ কেড়ে নেবে—কেয়ামতের দিন আমি নিজে আদালতে সেই অত্যাচারী মুসলিমের বিরুদ্ধে (অমুসলিমের পক্ষে) বাদী হয়ে লড়ব'।" (সুনানে আবু দাউদ, হাদিস নং: ৩০৫২; বায়াযী, আস-সুনানুল কুবরা—হাদিসটি সহীহ)

عَنْ مُجَاهِدٍ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: مَنْ قَتَلَ نَفْسًا مُعَاهَدًا لَمْ يَرَحْ رَائِحَةَ الْجَنَّةِ، وَإِنَّ رِيحَهَا لَيُوجَدُ مِنْ مَسِيرَةِ أَرْبَعِينَ عَامًا

অনুবাদ: "হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে আমর (রা.) থেকে বর্ণিত, নবী করীম (সা.) ইরশাদ করেছেন: 'যে ব্যক্তি ইসলামি রাষ্ট্রের চুক্তিবদ্ধ কোনো অমুসলিম নাগরিককে হত্যা করবে, সে জান্নাতের সুঘ্রাণও পাবে না। অথচ জান্নাতের সুঘ্রাণ চল্লিশ বছরের দূরত্বের পথ থেকেও পাওয়া যায়'।" (সহিহ বুখারি, হাদিস নং: ৬৯১৪)

- ঐতিহাসিক চুক্তি ও আইনি দলিল

১. মদিনার সনদ (The Constitution of Medina):
রাসূলুল্লাহ (সা.) মদিনায় রাষ্ট্র গঠনের পর ইহুদিদের সাথে যে ঐতিহাসিক চুক্তি করেন, তার ২৫ নম্বর ধারায় উল্লেখ ছিল: "বনু আউফের ইহুদিরা মুসলমানদের সাথে একই উম্মাহ (রাজনৈতিক সমাজ) হিসেবে গণ্য হবে। ইহুদিরা তাদের নিজস্ব ধর্ম পালন করবে এবং মুসলমানরা তাদের ধর্ম পালন করবে।"

২. হযরত ওমর (রা.)-এর জেরুজালেম চুক্তি (العهدة العمرية): হযরত ওমর (রা.) যখন জেরুজালেম (ইলিয়্যা) বিজয় করেন, তখন সেখানকার খ্রিস্টান নাগরিকদের যে ঐতিহাসিক নিরাপত্তা সনদ দিয়েছিলেন, তার মূল পাঠ নিম্নরূপ: "এটি আল্লাহর বান্দা, আমিরুল মুমিনীন ওমরের পক্ষ থেকে ইলিয়্যার (জেরুজালেম) অধিবাসীদের জন্য প্রদত্ত নিরাপত্তা সনদ। তিনি তাদের জীবন, সম্পদ, গির্জা ও ক্রুশের নিরাপত্তা দিচ্ছেন... তাদের গির্জাগুলো ভেঙে ফেলা হবে না, তাতে কোনো মুসলিম বসবাস করবে না, তার কোনো অংশ বা ক্রুশ ধ্বংস করা হবে না এবং তাদের সম্পদের কোনো ক্ষতি করা হবে না। ধর্মীয় বিষয়ে তাদের ওপর কোনো বলপ্রয়োগ করা হবে না..." (তারীখুত তাবারী, খণ্ড: ২, পৃষ্ঠা: ৪৪৯)

- ফিকহি মাসয়ালা ও তাত্ত্বিক বিশ্লেষণ

ইসলামি ফকিহগণ অমুসলিমদের আইনি अधिकार ও ধর্মীয় স্বাধীনতার সীমানা নির্ধারণ করে ফিকহের কিতাবসমূহে নিম্নলিখিত মাসয়ালাসমূহ সংকলন করেছেন:

১. পারিবারিক ও দেওয়ানি আইনে বিচারিক স্বায়ত্তশাসন (الاستقلال القضائي في الأحوال الشخصية):

হানাফি ফিকহের চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত হলো—অমুসলিম নাগরিকদের নিজস্ব পারিবারিক বিষয়সমূহ (যেমন: বিবাহ, তালাক, উত্তরাধিকার, মদ্যপান বা শুকরের মাংস কেনাবেচা—যা তাদের ধর্মে বৈধ কিন্তু ইসলামে নিষিদ্ধ) তাদের নিজস্ব ধর্মীয় বিধান অনুযায়ী মীমাংসা করা হবে। তারা যদি তাদের নিজস্ব পারিবারিক বিরোধ নিয়ে ইসলামি আদালতে আসতে না চায়, তবে আদালত তাদের ওপর ইসলামি পারিবারিক আইন চাপিয়ে দেবে না। ইমাম কাসানি বলেন, তাদের নিজস্ব উপাসনালয়ে এবং ব্যক্তিগত জীবনে তাদের ধর্মীয় আচার পালনের ওপর হস্তক্ষেপ করা ইসলামি বিচার বিভাগের জন্য সম্পূর্ণ নিষিদ্ধ।

২. অমুসলিমের সম্পদ ও উপাসনালয়ের ফৌজদারি সুরক্ষা (حرمة أموالهم ودور عبادتهم):

ইসলামি ফৌজদারি আইন (Criminal Law) অনুযায়ী, কোনো অমুসলিমের সম্পদ চুরি বা ডাকাতি হলে মুসলিমের মতোই অপরাধীর ওপর হদ বা শাস্তি কার্যকর হবে। এমনকি কোনো মুসলিম যদি কোনো অমুসলিম জিম্মির গির্জা বা উপাসনালয় ভাঙচুর করে বা ক্ষতিসাধন করে, তবে তা দেওয়ানি অপরাধ (Tort) হিসেবে গণ্য হবে এবং ইসলামি আদালত সেই মুসলিমকে শাস্তি দিতে এবং ক্ষতিপূরণ বা জরিমানা (ارش) প্রদানে বাধ্য করবে।

৩. কর ব্যবস্থা ও সামাজিক নিরাপত্তা (الجزية والتكافل الاجتماعي):

অমুসলিমদের ওপর আরোপিত 'জিজিয়া' (Jizyah) করটি ছিল মূলত সামরিক সুরক্ষার কর (Defense Tax), কারণ তারা ইসলামি রাষ্ট্রের সামরিক বাহিনীতে বাধ্যতামূলক অংশগ্রহণ থেকে মুক্ত ছিল। ফিকহি মাসয়ালা অনুযায়ী—কোনো অমুসলিম জিম্মি যদি বৃদ্ধ, প্রতিবন্ধী, দরিদ্র বা অসুস্থ হয়ে পড়ে, তবে তার ওপর থেকে জিজিয়া কর কেবল

মওকুফই হয় না, morale রাষ্ট্রে মানুষের বেঁচে থাকার সাধারণ অধিকার নিশ্চিত করতে ইসলামি রাষ্ট্রের বায়তুল মাল (রাষ্ট্রীয় কোষাগার) থেকে তাকে নিয়মিত সামাজিক নিরাপত্তা ভাতা দেওয়া বাধ্যতামূলক। হযরত খালিদ ইবনুল ওয়ালীদ (রা.) হিরার খ্রিস্টানদের সাথে চুক্তিতে এই আইনি ধারাটি সুনির্দিষ্টভাবে যুক্ত করেছিলেন।

- একাডেমিক রেফারেন্স (উৎস গ্রন্থসমূহ)

হানাফি ফিকহ ও অমুসলিম অধিকার তত্ত্ব: ইমাম আলাউদ্দীন আল-কাসানি, বাদায়েউস সানায়ে ফি তারতিবিশ শারায়ে, কিতাবুল জিহাদ (فصل في بيان أحكام الذمة), বৈরুত: দারু ইহইয়ায়িত তুরাসিল আরাবি, খণ্ড: ৭, পৃষ্ঠা: ১১০-১২০। আল্লামা ইবনে আবিদীন, রাদ্দুল মুহতার আলাদ দুররিল মুখতার, কিতাবুল জিহাদ (باب الجزية وأحكام أهل الذمة), খণ্ড: ৪, পৃষ্ঠা: ১৮০-১৯৫।

ইসলামি খরাজ ও অর্থনৈতিক আইন গ্রন্থসমূহ: ইমাম আবু ইউসুফ (প্রধান বিচারপতি), কিতাবুল খারাজ, অধ্যায়: জিম্মিদের গির্জা, উপাসনালয় ও জিজিয়া সংক্রান্ত ফয়সালা, কায়রো সংস্করণ, পৃষ্ঠা: ১২০-১৩৫।ইমাম আবু উবাইদ আল-কাসিম ইবনে সাল্লাম, কিতাবুল আমওয়াল, অধ্যায়: আহলুজ জিম্মাহ ও বায়তুল মালের অধিকার, বৈরুত: দারুল ফিকর, পৃষ্ঠা: ৫০-৬৫।

শাফেয়ি ও মালেকি ফিকহের সাংবিধানিক বিশ্লেষণ:ইমাম আল-মাওয়ার্দি, আল-আহকামুস সুলতানিয়্যাহ, অধ্যায়: عقد الذمة وأحكامه (জিম্মা চুক্তির সাংবিধানিক বিধান), পৃষ্ঠা: ১৪৩-১৫৫। ইবনে ফরহুন আল-মালেকি, তাবসিরাতুল হুক্কাম ফি উসুলিল আকদিয়্যাহ, খণ্ড: ২, পৃষ্ঠা: ২৫০-২৬০ (অমুসলিমদের দেওয়ানি মামলার এক্তিয়ার)।

হাম্বলি ফিকহ ও ইবনে কায়্যিমের কালজয়ী গ্রন্থ: ইমাম ইবনে কায়্যিম আল-জাওযিয়্যাহ, আহকামু আহলিয যিম্মাহ (أحكام أهل الذمة), খণ্ড: ১ ও ২ (অমুসলিমদের আইনি ও ধর্মীয় অধিকারের ওপর রচিত ইসলামি ইতিহাসের সবচেয়ে বিশদ ও প্রামাণ্য গ্রন্থ), দামেস্ক: দারুল ইলম লিল-মালাঈন।

৭.৪ আধুনিক ধর্মনিরপেক্ষ বিচার ব্যবস্থার সাথে ইসলামি বিচার ব্যবস্থার তুলনামূলক পর্যালোচনা ও এর শ্রেষ্ঠত্ব

সমকালীন বিশ্বে আধুনিক ধর্মনিরপেক্ষ (Secular) আইনি ব্যবস্থাকে—তা সে রোমান সিভিল ল (Civil Law) হোক কিংবা ব্রিটিশ কমন ল (Common Law)—মানব সভ্যতার বিচারিক ইনসাফের চূড়ান্ত রূপ হিসেবে দাবি করা হয়। ধর্মনিরপেক্ষ আইনি দর্শনের মূল দাবি হলো, আইনকে ধর্মীয় অনুশাসন থেকে মুক্ত করে সম্পূর্ণ মানবীয় বুদ্ধি ও সামাজিক উপযোগবাদের (Utilitarianism) ওপর ভিত্তি করে পরিচালনা করা।

তবে গভীর আইনি ও সমাজতাত্ত্বিক পর্যালোচনায় দেখা যায়, আধুনিক ধর্মনিরপেক্ষ বিচার ব্যবস্থা পদ্ধতিগত জটিলতা, দীর্ঘসূত্রতা, ব্যয়বহুলতা এবং নৈতিকতাহীনতার এক গোলকধাঁধায় নিমজ্জিত। যেখানে আইন ও ইনসাফ কেবল বিত্তশালীদের হাতের পুতুলে পরিণত হয়েছে, সেখানে ইসলামি বিচার ব্যবস্থা এক বৈপ্লবিক বিকল্প ও শ্রেষ্ঠত্ব উপস্থাপন করে। ইসলামি বিচার ব্যবস্থার মূল ভিত্তি হলো 'ঐশ্বরিক উৎস (কুরআন ও সুন্নাহ) এবং মানবীয় ইজতিহাদের এক অপূর্ব সমন্বয়'। এটি কেবল অপরাধের বাহ্যিক শাস্তি নিশ্চিত করে না, বরং মানুষের অন্তরে আখেরাতের জবাবদিহিতা ও তাকওয়ার বিকাশ ঘটিয়ে অপরাধের মূল উপড়ে ফেলে। এই অনুচ্ছেদে আধুনিক ধর্মনিরপেক্ষ আইনি দর্শনের প্রধান প্রধান ত্রুটিসমূহ চিহ্নিত করে তার বিপরীতে ইসলামি বিচার ব্যবস্থার তাত্ত্বিক ও প্রায়োগিক শ্রেষ্ঠত্ব তুলনামূলক ছক ও আইনি বিশ্লেষণের মাধ্যমে ফুটিয়ে তোলা হলো।

- কুরআনের আয়াত ও অনুবাদ

মানবীয় খামখেয়ালিপূণ ও ধর্মনিরপেক্ষ আইনের সীমাবদ্ধতা এবং আল্লাহর দেওয়া চিরন্তন আইনের শ্রেষ্ঠত্ব ঘোষণা করে আল্লাহ তাআলা ইরশাদ করেন:

أَفَحُكْمَ الْجَاهِلِيَّةِ يَبْغُونَ ۚ وَمَنْ أَحْسَنُ مِنَ اللَّهِ حُكْمًا لِقَوْمٍ يُوقِنُونَ

অনুবাদ: "তবে কি তারা জাহেলিয়াত বা অন্ধকার যুগের বিচার ফয়সালা কামনা করে? আর দৃঢ় বিশ্বাসী সম্প্রদায়ের জন্য বিচারক হিসেবে আল্লাহর চেয়ে উত্তম আর কে হতে পারে?" (সূরা আল-মায়েদাহ, আয়াত: ৫০)

وَأَنِ احْكُمْ بَيْنَهُمْ بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ وَلَا تَتَّبِعْ أَهْوَاءَهُمْ وَاحْذَرْهُمْ أَنْ يَفْتِنُوكَ عَنْ بَعْضِ مَا أَنْزَلَ اللَّهُ إِلَيْكَ ۖ

অনুবাদ: "আর আপনি তাদের মধ্যে আল্লাহ যা নাজিল করেছেন সেই অনুযায়ী বিচার ফয়সালা করুন এবং তাদের খেয়ালখুশির অনুসরণ করবেন না। আর তাদের থেকে সতর্ক থাকুন, যেন আল্লাহ আপনার প্রতি যে কিতাব নাজিল করেছেন তার কোনো অংশ থেকে তারা আপনাকে বিচ্যুত করতে না পারে।" (সূরা আল-মায়েদাহ, আয়াত: ৪৯)

- হাদিসের মতন ও অনুবাদ

ইসলামি বিচার ব্যবস্থায় বিচারকের সততা, নিরপেক্ষতা এবং ন্যায়বিচারের উচ্চ নৈতিক মানদণ্ড সম্পর্কে রাসূলুল্লাহ (সা.) ইরশাদ করেন:

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: الْمُقْسِطُونَ عِنْدَ اللَّهِ عَلَى مَنَابِرَ مِنْ نُورٍ، الَّذِينَ يَعْدِلُونَ فِي حُكْمِهِمْ وَأَهْلِيهِمْ وَمَا وَلُوا

অনুবাদ: "হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে আমর (রা.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (সা.) ইরশাদ করেছেন: 'নিশ্চয়ই ইনসাফকারী বিচারকগণ কেয়ামতের দিন আল্লাহর ডানপাশে নূরের মিম্বরসমূহের ওপর উপবিষ্ট থাকবেন। তারা হলেন সেইসব লোক, যারা তাদের বিচারকার্যে, পরিবারে এবং তাদের ওপর অর্পিত দায়িত্বের ক্ষেত্রে নিখুঁতভাবে ইনসাফ কায়েম করে।" (সহিহ মুসলিম, হাদিস নং: ১৮২৭)

- আধুনিক ধর্মনিরপেক্ষ আইনশাস্ত্র (Secular Jurisprudence) এবং ইসলামি বিচার ব্যবস্থার (Islamic Judicial System) মৌলিক তাত্ত্বিক ও প্রায়োগিক পার্থক্যসমূহ নিম্নরূপ পয়েন্টের আলোকে বিশ্লেষণ করা হলো:

১. আইনের উৎস ও স্থায়িত্ব (Source and Permanence of Law)

আধুনিক ধর্মনিরপেক্ষ আইন: এই ব্যবস্থার মূল উৎস মানুষের তৈরি আইন, সংসদ, সামাজিক প্রথা ও উপযোগবাদ (Utilitarianism)। মানবীয় মেধা ও সংখ্যাগরিষ্ঠের ইচ্ছার ওপর নির্ভরশীল হওয়ায় এই আইন প্রতিনিয়ত পরিবর্তনশীল। ফলে যা এক যুগে অপরাধ, অন্য যুগে তা আইনি বৈধতা পেয়ে যায়।

ইসলামি বিচার ব্যবস্থা: এর মূল ভিত্তি চিরন্তন ও ঐশ্বরিক উৎস—কুরআন ও সুন্নাহ। তবে সময়ের পরিবর্তনের সাথে তাল মিলিয়ে নতুন সমস্যার সমাধানের জন্য এতে রয়েছে ইজমা, কিয়াস ও গতিশীল মানবীয় গবেষণার (ইজতিহাদ) অবারিত সুযোগ। ফলে এর মৌলিক নৈতিক কাঠামো অপরিবর্তিত রেখেও যুগের চাহিদা মেটানো সম্ভব হয়।

২. আইন ও নৈতিকতার সম্পর্ক (Law and Morality)

আধুনিক ধর্মনিরপেক্ষ আইন: ধর্মনিরপেক্ষ আইনি দর্শনে (Legal Positivism) আইন ও নৈতিকতাকে সম্পূর্ণ পৃথক রাখা হয়। কোনো আচরণ নৈতিকভাবে চরম অপরাধ বা অন্যায় হলেও, দেশের প্রচলিত লিখিত আইনি ধারায় যদি তা স্পষ্ট নিষিদ্ধ না থাকে, তবে আদালত অপরাধীকে সাজা দিতে পারে না।

ইসলামি বিচার ব্যবস্থা: এখানে আইন ও নৈতিকতা অবিভাজ্য (Inseparable)। অপরাধ দমনের পাশাপাশি মানুষের আত্মিক ও নৈতিক সংশোধন করা ইসলামি আদালতের মূল লক্ষ্য। ফলে এটি সমাজ থেকে অপরাধের বাহ্যিক প্রকাশ এবং অভ্যন্তরীণ নৈতিক অবক্ষয় উভয়টি একসাথে রোধ করে।

৩. অপরাধ দমনের মনস্তত্ত্ব (Psychology of Deterrence)

আধুনিক ধর্মনিরপেক্ষ আইন: এই ব্যবস্থায় মানুষ কেবল রাষ্ট্রীয় আইনি দণ্ড বা পুলিশের ভয় পায়। ফলে প্রশাসনের চোখ ফাঁকি দিতে পারলে বা আইনি ফাঁকফোকর বের করতে পারলে অপরাধীর মনে কোনো নৈতিক অপরাধবোধ বা অনুশোচনা কাজ করে না।

ইসলামি বিচার ব্যবস্থা: এটি মানুষের মনে দ্বিমুখী জবাবদিহিতা তৈরি করে—প্রথমত, দুনিয়ার আদালতের শাস্তি এবং দ্বিতীয়ত, আখেরাতে আল্লাহর দরবারে জবাবদিহিতার ভয় (তাকওয়া)। এই মনস্তাত্ত্বিক ভিত্তির কারণে মানুষ নির্জনে বা গোপনেও অপরাধ করা থেকে বিরত থাকে।

৪. বিচারিক কার্যপদ্ধতি ও গতিশীলতা (Judicial Process and Efficiency)

আধুনিক ধর্মনিরপেক্ষ আইন: এই বিচার ব্যবস্থা অত্যন্ত জটিল, কারিগরি মারপ্যাঁচে ভরা এবং দীর্ঘমেয়াদি। লাখ লাখ মামলার জট এবং বছরের পর বছর শুনানির দীর্ঘসূত্রতার কারণে অনেক সময় বিচারপ্রার্থী ইনসাফ পাওয়ার আগেই নিঃস্ব হয়ে যায়।

ইসলামি বিচার ব্যবস্থা: ইসলামি কার্যবিধিতে সহজ, দ্রুত ও সংক্ষিপ্ত বিচার প্রক্রিয়াকে (Summary Trial) অগ্রাধিকার দেওয়া হয়েছে। আইনি মারপ্যাঁচে সময় নষ্ট না করে সরাসরি সত্য উদ্ঘাটন এবং দ্রুততম সময়ে জনগণের দোরগোড়ায় ইনসাফ পৌঁছে দেওয়া কাজীর অন্যতম প্রধান দায়িত্ব।

৫. অর্থনৈতিক এক্তিয়ার ও সহজলভ্যতা (Accessibility and Affordability)

আধুনিক ধর্মনিরপেক্ষ আইন: বর্তমান ধর্মনিরপেক্ষ আদালতসমূহ চরম ব্যয়বহুল। এখানে ভালো আইনজীবী (উকিল) নিয়োগ করতে না পারলে একজন নিরপরাধ ব্যক্তিও আইনি মারপ্যাঁচে হেরে সাজা পেয়ে যেতে পারে। ফলে ইনসাফ এখানে পরোক্ষভাবে বিত্তশালীদের কেনাবেচার বস্তুতে পরিণত হয়।

ইসলামি বিচার ব্যবস্থা: ইসলামি আদালত সবার জন্য সম্পূর্ণ উন্মুক্ত ও সাশ্রয়ী। এখানে উকিলের চাতুর্য বা বাচনভঙ্গির চেয়ে সত্য সাক্ষী ও আদালতের নিজস্ব নিরপেক্ষ তদন্তের ওপর সর্বোচ্চ জোর দেওয়া হয়, যার ফলে ধনী-দরিদ্র নির্বিশেষে সবাই সমান সুযোগ পায়।

৬. ফৌজদারি দর্শন ও ভিকটিমের অধিকার (Criminological Philosophy and Victim Rights)

আধুনিক ধর্মনিরপেক্ষ আইন: পশ্চিমা অপরাধবিজ্ঞানের আধুনিক ঝোঁক হলো অপরাধীর মানবাধিকার ও সংশোধনের (Rehabilitation) ওপর অতিরিক্ত গুরুত্ব দেওয়া। এর ফলে অনেক সময় অপরাধের শিকার হওয়া ভিকটিম বা তার পরিবার চরম অবহেলার শিকার হয় এবং সমাজে সামগ্রিক অপরাধের হার বাড়ে।

ইসলামি বিচার ব্যবস্থা: ইসলামি ফৌজদারি আইন সমাজ ও সমষ্টির নিরাপত্তা নিশ্চিতকরণ এবং ভিকটিমের অধিকার পুনরুদ্ধারকে (Deterrence and Retribution) অগ্রাধিকার দেয়। কিসাস ও হদের মাধ্যমে যেমন অপরাধের উপযুক্ত শাস্তি নিশ্চিত করা হয়, তেমনি দিয়াতের (রক্তপণ) মাধ্যমে ভিকটিমের পরিবারের অর্থনৈতিক ও সামাজিক সুরক্ষাও নিশ্চিত করা হয়।

- ফিকহি মাসয়ালা ও তাত্ত্বিক বিশ্লেষণ

ধর্মনিরপেক্ষ আইনশাস্ত্রের (Secular Jurisprudence) সীমাবদ্ধতার বিপরীতে ইসলামি ফকিহগণ ইসলামের শ্রেষ্ঠত্বের নিম্নলিখিত তাত্ত্বিক ও ব্যবহারিক যুক্তি প্রদান করেন:

১. সার্বভৌমত্ব বনাম মানবীয় সীমাবদ্ধতা (السيادة لله والتشريع للأمة):

ধর্মনিরপেক্ষ ব্যবস্থায় সার্বভৌমত্ব জনগণের বা সংসদের হাতে ন্যস্ত থাকে (Popular Sovereignty)। ফলে মানুষের আবেগ ও স্বার্থের কারণে আইন প্রতিনিয়ত পরিবর্তিত হয় (যেমন: পশ্চিমা বিশ্বে সমকামিতা বা গর্ভপাতের মতো বিষয়গুলো আগে অপরাধ হলেও এখন তা আইনি বৈধতা পেয়েছে)। এর বিপরীতে, হানাফি ফিকহের মূলনীতি অনুযায়ী, মূল বিধাতা বা শারী' হলেন একমাত্র আল্লাহ তাআলা (المشرع هو الله)। মৌলিক নৈতিক আইনসমূহ অপরিবর্তনীয় হওয়ায় সমাজে চিরন্তন মূল্যবোধ ও স্থিতিশীলতা বজায় থাকে, যা মানবীয় খামখেয়ালিপনার শিকার হয় না।

২. আইনি মারপ্যাঁচ বনাম সত্যের অনুসন্ধান (الحقيقة القضائية والحقيقة الواقعية):

ধর্মনিরপেক্ষ ব্রিটিশ কমন ল-এর একটি বড় ত্রুটি হলো এটি 'অ্যাডভারস্যারিয়াল সিস্টেম' (Adversarial System) বা প্রতিদ্বন্দ্বিতামূলক ব্যবস্থা। এখানে বিচারক একজন নীরব দর্শকের মতো দুই পক্ষের উকিলের বিতর্ক শোনেন। যার উকিল যত বেশি আইনি মারপ্যাঁচে দক্ষ, রায় তার পক্ষেই যায়, ভলেই সে বাস্তবে অপরাধী হোক। কিন্তু ইসলামি বিচার ব্যবস্থায় কাজী বা বিচারক কেবল রেফারি নন, তিনি সত্য অনুসন্ধানের জন্য সক্রিয় ভূমিকা পালন করেন (Inquisitorial System)। ইসলামি সাক্ষ্য আইন (فقه الشهادات) এবং কাজীর আদব (أدب القاضي) অনুযায়ী, বিচারক কোনো টেকনিক্যাল ভুলের সুযোগ নিয়ে সত্যকে ধামাচাপা দিতে পারেন না।

৩. অপরাধের মনস্তাত্ত্বিক প্রতিরোধ ও কারাগার ব্যবস্থার অসারতা:

আধুনিক ধর্মনিরপেক্ষ দেশসমূহে কারাগারগুলো অপরাধী তৈরির কারখানায় পরিণত হয়েছে (Recidivism)। শাস্তি শেষে কারাগার থেকে বের হয়ে মানুষ আরও বড় অপরাধে লিপ্ত হয়। এর কারণ ধর্মনিরপেক্ষ আইন মানুষের অবচেতন মন বা আত্মাকে নিয়ন্ত্রণ করতে পারে না। ইসলামি দণ্ডবিধির শ্রেষ্ঠত্ব হলো, এর প্রকাশ্য ও কঠোর হদ বা কিসাসের বিধান সমাজে এমন এক মনস্তাত্ত্বিক প্রতিরোধ (General Deterrence) গড়ে তোলে, যার ফলে মানুষ অপরাধ করতে ভয় পায়। একই সাথে, অপরাধী যখন স্বেচ্ছায় ইসলামি আদালতে এসে নিজের গুনাহ স্বীকার করে হদ জারির দাবি করে (যেমন মায়েয রা. এবং গামেদিয়া রা.-এর ঘটনা), তখন তা প্রমাণ করে যে ইসলামের বিচারিক দর্শন মানুষের আত্মাকে অপরাধমুক্ত করার এক স্বর্গীয় হাতিয়ার।

- একাডেমিক রেফারেন্স (উৎস গ্রন্থসমূহ)

হানাফি ফিকহ ও বিচারিক দর্শন: ইমাম আলাউদ্দীন আল-কাসানি, বাদায়েউস সানায়ে ফি তারতিবিশ শারায়ে, কিতাবুল কাজা (فصل في بيان شرف القضاء), বৈরুত: দারু ইহইয়ায়িত তুরাসিল আরাবি, খণ্ড: ৭, পৃষ্ঠা: ২-১০। আল্লামা ইবনে আবিদীন, রাদ্দুল মুহতার আলাদ দুররিল মুখতার, কিতাবুল কাজা (مطلب في أن القضاء أفضل الطاعات), খণ্ড: ৫, পৃষ্ঠা: ৪০০-৪১২।

সমকালীন আইনি তুলনা ও অপরাধবিজ্ঞান গ্রন্থসমূহ: ড. মুহাম্মদ মুস্তফা শালবী, আল-মাদখাল ফি ফিকহিল ইসলামি (ইসলামি আইনের ভূমিকা ও তুলনামূলক পর্যালোচনা), বৈরুত: দারুন নাহদাহ আল-আরাবিয়্যাহ, পৃষ্ঠা: ১৪৫-১৬৮। ড. আব্দুল করিম যাইদান, আল-মাদখাল লি দিরাসাতিল শারিআতিল ইসলামিয়্যাহ (ধর্মনিরপেক্ষ আইনের সাথে শরীয়তের তুলনা), বাগদাদ সংস্করণ, পৃষ্ঠা: ২০০-২২৫।

শাফেয়ি ফিকহ ও শাসনতান্ত্রিক শ্রেষ্ঠত্ব: ইমাম আল-মাওয়ার্দি, আল-আহকামুস সুলতানিয়্যাহ, অধ্যায়: কায়াদ বা বিচার বিভাগের স্বায়ত্তশাসন বনাম ধর্মনিরপেক্ষ সিয়াসা, পৃষ্ঠা: ৮০-৯২। আল্লামা ইবনে খলদুন, আল-মুকাদ্দিমাহ, অধ্যায়: السياسة العقيلة والسياسة الشرعية (মানবীয় ধর্মনিরপেক্ষ রাজনীতি বনাম ঐশ্বরিক শরয়ী রাজনীতির তুলনা), পৃষ্ঠা: ২৫০-২৬৫।

হাম্বলি ফিকহ ও ইবনে তাইমিয়্যাহর আইনি বিশ্লেষণ: শায়খুল ইসলাম ইবনে তাইমিয়্যাহ, আস-সিয়াসাতুস শারইয়্যাহ ফি ইসলাহির রাঈ ওয়ার রাইইয়্যাহ, অধ্যায়:

বিচার ও হুকুমতের তুলনামূলক শ্রেষ্ঠত্ব, পৃষ্ঠা: ১৪০-১৬৫। ইমাম ইবনে কায়্যিম আল-জাওযিয়্যাহ, ই'লামুল মুয়াক্কিঈন আন রাব্বিল আলামিন, খণ্ড: ৩, পৃষ্ঠা: ৩-১৮ (শরীয়তের আইনি দর্শনের চিরন্তন উপযোগিতা ও মানবীয় আইনের অপূর্ণতা অনুচ্ছেদ)।

অধ্যায় ৮: আধুনিক রাষ্ট্রে ইসলামি বিচার ব্যবস্থার বাস্তবায়নের রূপরেখা ও উপসংহার

এই সমাপনী অধ্যায়ে পূর্ববর্তী সমস্ত অধ্যায়ের তাত্ত্বিক ও ঐতিহাসিক আলোচনার ওপর ভিত্তি করে বর্তমান মুসলিম দেশগুলোতে ইসলামি বিচার ব্যবস্থার একটি বাস্তবমুখী ও ধাপে ধাপে বাস্তবায়নের রূপরেখা (Implementation Roadmap) পেশ করা হয়েছে। প্রচলিত আধুনিক আইনি কাঠামোর জটিলতা থেকে মুক্ত হয়ে কীভাবে শরিয়াহর মূলনীতি ও সিয়াসা শারইয়্যাহর (Shariah-compliant Governance) আলোকে বিচার বিভাগের পূর্ণ সংস্কার করা সম্ভব, তা-ই এই অধ্যায়ের প্রধান অন্বেষা।

৮.১ ইসলামি বিচার ব্যবস্থার মাধ্যমে ধাপে ধাপে আইনি সংস্কার ও অপরাধমুক্ত সামাজিক ও রাষ্ট্রীয় পরিবেশ গঠন

আধুনিক ধর্মনিরপেক্ষ বা উত্তর-উপনিবেশবাদী (Post-colonial) রাষ্ট্রে ইসলামি বিচার ব্যবস্থা চালুর আলোচনা উঠলেই একটি সাধারণ ভুল ধারণা তৈরি হয় যে, এটি হয়তো রাতারাতি বা আকস্মিকভাবে কঠোর দণ্ডবিধি (যেমন: হাত কাটা বা পাথর নিক্ষেপ) কার্যকর করার নাম। ইসলামি আইনশাস্ত্র (Islamic Jurisprudence) এবং অপরাধবিজ্ঞানের (Criminology) গভীর পর্যালোচনা প্রমাণ করে যে, এই ধারণাটি সম্পূর্ণ অবাস্তব এবং শরীয়তের মাকাসিদ বা মূল উদ্দেশ্যের পরিপন্থী। ইসলামি বিচার ব্যবস্থা কোনো বিচ্ছিন্ন দ্বীপ নয়; এটি একটি সামগ্রিক সামাজিক, অর্থনৈতিক ও নৈতিক কাঠামোর চূড়ান্ত ফসল।

আধুনিক রাষ্ট্রে শরিয়াহ ভিত্তিক বিচারিক সংস্কারের মূল ভিত্তি হলো ‘ধাপে ধাপে পরিবর্তন’ (Gradualism/التدرج في التشريع), যা স্বয়ং রাসূলুল্লাহ (সা.) মদিনা রাষ্ট্রে এবং ওহী নাজিলের ক্ষেত্রে অনুসরণ করেছিলেন। হদ বা কিসাসের মতো কঠোর দণ্ডবিধি কার্যকর করার আগে রাষ্ট্রকে অবশ্যই দুটি পূর্বশর্ত পূরণ করতে হবে:

১. পদ্ধতিগত ও ধাপে ধাপে আইনি সংস্কার: প্রচলিত ঔপনিবেশিক আইনসমূহকে পর্যায়ক্রমে ইসলামি আইনের সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ করা এবং বিচার বিভাগকে সম্পূর্ণ স্বাধীন ও দুর্নীতিমুক্ত করা।

২. অপরাধমুক্ত ও ইনসাফভিত্তিক সামাজিক পরিবেশ তৈরি: রাষ্ট্রে এমন একটি অর্থনৈতিক ও নৈতিক পরিবেশ তৈরি করা, যেখানে মানুষের মৌলিক চাহিদা (অন্ন, বস্ত্র, বাসস্থান, শিক্ষা, চিকিৎসা) নিশ্চিত থাকে এবং যেখানে মানুষ সহজে অপরাধের দিকে ধাবিত হয় না।

ইসলামের দর্শন হলো—আগে অপরাধের পেছনের সামাজিক ও অর্থনৈতিক কারণগুলো দূর করো, মানুষের নৈতিক মান উন্নত করো, তারপরও যদি কেউ চরম ধৃষ্টতা দেখিয়ে সমাজকে কলুষিত করে, তবেই কেবল তার ওপর হদ কার্যকর হবে।

- কুরআনের আয়াত ও অনুবাদ

আল্লাহ তাআলা সমাজে শান্তি শৃঙ্খলা প্রতিষ্ঠা এবং ধাপে ধাপে সামাজিক সংস্কার ও অপরাধের পথগুলো বন্ধ করার নির্দেশ দিয়ে ইরশাদ করেন:

وَلَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ بَعْدَ إِصْلَاحِهَا وَادْعُوهُ خَوْفًا وَطَمَعًا ۚ إِنَّ رَحْمَتَ اللَّهِ قَرِيبٌ مِنَ الْمُحْسِنِينَ

অনুবাদ: "আর তোমরা পৃথিবীতে শান্তি ও সংস্কার প্রতিষ্ঠার পর সেখানে বিপর্যয় বা অপরাধ সৃষ্টি করো না। এবং তোমরা আল্লাহকে ভয় ও আশার সাথে ডাকো; নিশ্চয়ই আল্লাহর রহমত সৎকর্মশীলদের নিকটবর্তী।" (সূরা আল-আ'রাফ, আয়াত: ৫৬)

الَّذِينَ إِنْ مَكَّنَّاهُمْ فِي الْأَرْضِ أَقَامُوا الصَّلَاةَ وَآتَوُا الزَّكَاةَ وَأَمَرُوا بِالْمَعْرُوفِ وَنَهَوْا عَنِ الْمُنْكَرِ ۗ وَلِلَّهِ عَاقِبَةُ الْأُمُورِ

অনুবাদ: "তারা এমন লোক, যাদেরকে আমি পৃথিবীতে ক্ষমতা বা রাষ্ট্রীয় কর্তৃত্ব দান করলে তারা সালাত কায়েম করবে, যাকাত আদায় করবে এবং সৎকাজের আদেশ দেবে ও অসৎকাজ থেকে নিষেধ করবে। আর সব বিষয়ের চূড়ান্ত পরিণতি আল্লাহরই ইখতিয়ারে।" (সূরা আল-হাজ্জ, আয়াত: ৪১)

এই আয়াতে রাষ্ট্রকে হদ কার্যকরের আগে সৎকাজের বিস্তার ও যাকাতভিত্তিক সাম্য সমাজ প্রতিষ্ঠার মাধ্যমে অপরাধের পথ বন্ধ করার রাজনৈতিক রোডম্যাপ দেওয়া হয়েছে।

- হাদিসের মতন ও অনুবাদ

ইসলামি আইনের ক্রমান্বয়িতা এবং সামাজিক পরিবেশ তৈরির গুরুত্ব সম্পর্কে উম্মুল মুমিনীন হযরত আয়েশা (রা.)-এর একটি অত্যন্ত গভীর তাত্ত্বিক হাদিস বুখারি শরীফে বর্ণিত হয়েছে:

عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا قَالَتْ: إِنَّمَا نَزَلَ أَوَّلَ مَا نَزَلَ مِنْهُ سُورَةٌ مِنَ الْمُفَصَّلِ، فِيهَا ذِكْرُ الْجَنَّةِ وَالنَّارِ، حَتَّى إِذَا ثَابَ النَّاسُ إِلَى الْإِسْلَامِ نَزَلَ الْحَلَالُ وَالْحَرَامُ، وَلَوْ نَزَلَ أَوَّلَ شَيْءٍ: لَا تَشْرَبُوا الْخَمْرَ، لَقَالُوا: لَا نَدَعُ الْخَمْرَ أَبَدًا، وَلَوْ نَزَلَ: لَا تَزْنُوا، لَقَالُوا: لَا نَدَعُ الزِّنَا أَبَدًا

অনুবাদ: "হযরত আয়েশা (রা.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন: 'কুরআনের সূচনালগ্নে (মক্কী যুগে) ছোট ছোট مفصل (মুফাসসাল) সূরাসমূহ নাজিল হয়েছিল, যাতে জান্নাত ও জাহান্নামের আলোচনা ছিল। অতঃপর মানুষ যখন দলে দলে ইসলামের দিকে ধাবিত হলো এবং তাদের মনস্তাত্ত্বিক রূপান্তর ঘটল, তখন হালাল ও হারামের (আইনি বিধান) নাজিল হলো। যদি শুরুতেই নাজিল হতো—তোমরা মদ পান করো না, তবে মানুষ বলত—আমরা কখনো মদ ছাড়ব না। আর যদি শুরুতেই নাজিল হতো—তোমরা ব্যভিচার করো না, তবে তারা বলত—আমরা কখনো ব্যভিচার পরিত্যাগ করব না'।" (সহিহ বুখারি, হাদিস নং: ৪৯৯৩)

- ঐতিহাসিক আইনি নজির (হযরত ওমরের দুর্ভিক্ষ বছরের ইজতিহাদ)

হিজরি ১৮ সনে আরব উপদ্বীপে যখন 'রুমাদাহ' (ভয়াবহ দুর্ভিক্ষ) দেখা দেয়, তখন আমিরুল মুমিনীন হযরত ওমর (রা.) চুরির অপরাধে চোরের হাত কাটার বিধান (হদ) সাময়িকভাবে স্থগিত করেছিলেন।

আইনি বিশ্লেষণ: হযরত ওমর (রা.) চুরির আইন পরিবর্তন করেননি, বরং তিনি ফিকহি দূরদর্শিতার মাধ্যমে বুঝেছিলেন যে, ক্ষুধার্ত ও বেঁচে থাকার সংকটে পড়া মানুষ যখন বাধ্য হয়ে খাদ্য চুরি করে, তখন চুরির সুরক্ষামূলক আইনগত শর্ত (সন্দেহাতীত পরিস্থিতি) আর বিদ্যমান থাকে না। রাষ্ট্র যখন নাগরিকদের অন্ন নিশ্চিত করতে পারে না, তখন চোরের ওপর হদ জারি করা ইনসাফের পরিপন্থী। (আল-মুসান্নাফ, ইবনে আবি শায়বাহ; কিতাবুল আমওয়াল, আবু উবাইদ)

- ফিকহি মাসয়ালা ও তাত্ত্বিক বিশ্লেষণ

আধুনিক রাষ্ট্রে ইসলামি বিচার ব্যবস্থা কায়েমের লক্ষ্যে ফকিহ ও মুসলিম আইনবিদগণ নিম্নোক্ত ফিকহি মূলনীতি ও ধাপসমূহ নির্ধারণ করেছেন:

১. পর্যায়ক্রমিক রূপান্তরের নীতি (التدرج في التطبيق):

ফিকহি মূলনীতি অনুযায়ী—"কষ্টসাধ্য বিষয় সহজকরণের দাবি রাখে" (المشقة تجلب التيسير)। আধুনিক ধর্মনিরপেক্ষ রাষ্ট্র ব্যবস্থাকে রাতারাতি ভেঙে না ফেলে প্রথমে দেওয়ানি, বাণিজ্যিক, ব্যাংকিং ও পারিবারিক আইনসমূহকে শরিয়াহর ছাঁচে রূপান্তর করতে হবে। এরপর বিচারকদের বিশেষায়িত ফিকহি প্রশিক্ষণ দান এবং দেওয়ানি কার্যবিধিকে গতিশীল করতে হবে। চূড়ান্ত ধাপে, যখন সমাজ অর্থনৈতিক ও নৈতিকভাবে স্থিতিশীল হবে, তখন ফৌজদারি দণ্ডবিধি (হদ ও কিসাস) কার্যকর করার পরিবেশ তৈরি হবে।

২. অপরাধের উৎসমুখ বন্ধকরণ (سد الذرائع إلى الفساد):

ইসলামি আইনশাস্ত্রের একটি প্রধান নীতি হলো 'সাদ্দুজ যারায়ি' বা অপরাধের মাধ্যম ও উৎসমুখ বন্ধ করা। চুরির শাস্তি দেওয়ার আগে রাষ্ট্রকে যাকাত ও সামাজিক নিরাপত্তা ব্যবস্থার মাধ্যমে দারিদ্র্য বিমোচন করতে হবে। ব্যভিচারের শাস্তি দেওয়ার আগে পর্নোগ্রাফি, অশ্লীলতা এবং বিবাহকে কঠিন করার সামাজিক প্রতিবন্ধকতাগুলো দূর করতে হবে। ঘুষ-দুর্নীতির বিচার করার আগে কর্মকর্তা-কর্মচারীদের জীবনযাত্রার মান অনুযায়ী ন্যায্য বেতন নিশ্চিত করতে হবে।

৩. তা'যির বা লঘু শাস্তির পরিধি বৃদ্ধি (التوسع في التعزير):

আধুনিক রাষ্ট্রের জটিল অপরাধসমূহ (যেমন: সাইবার ক্রাইম, আর্থিক জালিয়াতি, কর ফাঁকি, ট্রাফিক আইন ভঙ্গ ইত্যাদি) সরাসরি হদের আওতাভুক্ত নয়। হানাফি ফিকহের নীতি অনুযায়ী, রাষ্ট্রপ্রধান বা আইনসভা (উলুল আমর) জনস্বার্থে এবং সমাজকে অপরাধমুক্ত রাখতে যেকোনো সময় তা'যির বা লঘু শাস্তি (জরিমানা, কারাদণ্ড বা সামাজিক সেবা) এর আইন প্রণয়ন করতে পারে। সুতরাং, ইসলামি বিচার ব্যবস্থা আধুনিক রাষ্ট্রের যেকোনো প্রশাসনিক ও সাংগঠনিক আইন সংস্কারে শতভাগ সক্ষম।

- একাডেমি রেফারেন্স (উৎস গ্রন্থসমূহ)

হানাফি ফিকহ ও শাসনতান্ত্রিক রূপান্তর দর্শন: ইমাম আলাউদ্দীন আল-কাসানি, বাদায়েউস সানায়ে ফি তারতিবিশ শারায়ে, কিতাবুল কাজা ও কিতাবুস সিয়াসা, বৈরুত: দারু ইহইয়ায়িত তুরাসিল আরাবি, খণ্ড: ৭, পৃষ্ঠা: ১৫-২৮। আল্লামা ইবনে আবিদীন, রাদ্দুল মুহতার আলাদ দুররিল মুখতার, কিতাবুল হুদুদ ও তা'যির পরিচ্ছেদ (مطلب في التعزير بالمال), খণ্ড: ৪, পৃষ্ঠা: ৬০-৭৫।

মাকাসিদুজ শারীআহ ও সমকালীন আইনি সংস্কার: ড. ওয়াহবাহ আয-জুহাইলি, আল-ফিকহুল ইসলামি ওয়া আদিল্লাতুহু, খণ্ড: ৮, কিতাবুল কাজা ও আল-সিয়াসা আল-শারইয়্যাহ (ধাপে ধাপে আইন বাস্তবায়নের রূপরেখা অধ্যায়), দামেস্ক: দারুল ফিকর। আল্লামা শাতিলী, আল-মুয়াফাকাত ফি উসুলিশ শারিআহ, খণ্ড: ২, পৃষ্ঠা: ৯০-১১৫ (مقصود الشريعة في تدرج الأحكام - বিধিমালার ক্রমান্বয়িতা অনুচ্ছেদ)।

শাফেয়ি ফিকহ ও প্রশাসনিক সংস্কার: ইমাম আল-মাওয়ার্দি, আল-আহকামুস সুলতানিয়্যাহ, অধ্যায়: কাজীদের নিয়োগ, এক্তিয়ার এবং সামাজিক সংস্কারের আইনি কাঠামো, পৃষ্ঠা: ৯৫-১১০।

হাম্বলি ফিকহ ও ইবনে কায়্যিমের অপরাধবিজ্ঞান: শায়খুল ইসলাম ইবনে তাইমিয়্যাহ, আস-সিয়াসাতুস শারইয়্যাহ ফি ইসলাহির রাঈ ওয়ার রাইইয়্যাহ, অধ্যায়: সমাজ সংস্কার ও অপরাধ দমনের আইনি মনস্তত্ত্ব, পৃষ্ঠা: ১৬০-১৮৫। ইমাম ইবনে কায়্যিম আল-জাওযিয়্যাহ, আল-তুরুকুল হুকমিয়্যাহ ফিস সিয়াসাতিল শারইয়্যাহ, খণ্ড: ১, পৃষ্ঠা: ৮০-৯৫ (দুর্ভিক্ষ ও সংকটে হদ স্থগিতের ফিকহি ও ঐতিহাসিক আইনি পর্যালোচনা)।

৮.২ বিচারকদের যোগ্যতার মানদণ্ড, নিয়োগ প্রক্রিয়া ও বিচার বিভাগের পূর্ণ স্বাধীনতা

একটি দেশের বিচার ব্যবস্থার কার্যকারিতা ও ইনসাফ মূলত দুটি স্তম্ভের ওপর নির্ভর করে—প্রথমত, বিচারক বা কাজীদের ব্যক্তিগত যোগ্যতা ও নৈতিক সততা এবং দ্বিতীয়ত, যেকোনো ধরনের রাজনৈতিক বা প্রশাসনিক হস্তক্ষেপ থেকে বিচার বিভাগের পূর্ণ স্বাধীনতা (Independence of the Judiciary)। আধুনিক ধর্মনিরপেক্ষ রাষ্ট্রে বিচার বিভাগকে স্বাধীন ঘোষণা করা হলেও, বাস্তবে বিচারক নিয়োগ, পদোন্নতি ও

রাজনৈতিক চাপের কারণে তা প্রায়শই নির্বাহী বিভাগের (Executive Branch) আজ্ঞাবহ প্রতিষ্ঠানে পরিণত হয়।

এর বিপরীতে, ইসলামি আইনশাস্ত্র (Islamic Jurisprudence) চৌদ্দশ বছর আগেই বিচার বিভাগের পূর্ণ স্বাধীনতা এবং বিচারকদের জন্য এমন কঠোর যোগ্যতার মানদণ্ড নির্ধারণ করেছে, যা মানব ইতিহাসে নজিরবিহীন। ইসলামি রাষ্ট্রদর্শনে 'কাজা' বা বিচার বিভাগ কোনো রাজনৈতিক সরকারের অধীনস্থ কোনো শাখা নয়; বরং এটি সরাসরি আল্লাহর আইনের (শরিয়াহ) অভিভাবক। একজন কাজী স্বয়ং খলিফা বা রাষ্ট্রপ্রধানের বিরুদ্ধেও সমন জারি করার এবং রায় দেওয়ার পূর্ণ এক্তিয়ার রাখেন। এই অনুচ্ছেদে ফিকহি দৃষ্টিকোণ থেকে বিচারকদের যোগ্যতা, তাদের নিয়োগের স্বচ্ছ পদ্ধতি এবং নির্বাহী বিভাগ থেকে বিচার বিভাগের সম্পূর্ণ পৃথকীকরণের আইনি রূপরেখা আলোচনা করা হলো।

- কুরআনের আয়াত ও অনুবাদ

আদালতে আমানতদারী রক্ষা, যোগ্য ব্যক্তিকে দায়িত্ব প্রদান এবং কোনো ধরনের ভয় বা রাগের বশবর্তী না হয়ে নিরপেক্ষভাবে বিচার করার নির্দেশ দিয়ে আল্লাহ তাআলা ইরশাদ করেন:

إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ ۚ إِنَّ اللَّهَ نِعِمَّا يَعِظُكُمْ بِهِ ۗ

অনুবাদ: "নিশ্চয়ই আল্লাহ তোমাদের নির্দেশ দিচ্ছেন যে, তোমরা যেন আমানতসমূহ তার যোগ্য মালিকদের কাছে সোপর্দ করো। আর যখন তোমরা মানুষের মধ্যে বিচার ফয়সালা করবে, তখন যেন ইনসাফ ও ন্যায়ের সাথে বিচার করো। নিশ্চয়ই আল্লাহ তোমাদের যে উপদেশ দিচ্ছেন, তা কতই না চমৎকার!" (সূরা আন-নিসা, আয়াত: ৫৮)

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُونُوا قَوَّامِينَ بِالْقِسْطِ شُهَدَاءَ لِلَّهِ وَلَوْ عَلَىٰ أَنْفُسِكُمْ أَوِ الْوَالِدَيْنِ وَالْأَقْرَبِينَ ۚ

অনুবাদ: "হে ঈমানদারগণ! তোমরা ন্যায়ের ওপর দৃঢ়ভাবে প্রতিষ্ঠিত থাকো আল্লাহর ওয়াস্তে সাক্ষী হিসেবে; যদিও তা তোমাদের নিজেদের বিরুদ্ধে কিংবা পিতা-মাতা ও আত্মীয়-স্বজনদের বিরুদ্ধে যায় না কেন।" (সূরা আন-নিসা, আয়াত: ১৩৫)

- হাদিসের মতন ও অনুবাদ

বিচারিক দায়িত্বের ভয়াবহতা এবং অযোগ্য বা পক্ষপাতদুষ্ট বিচারকদের শাস্তি সম্পর্কে রাসূলুল্লাহ (সা.) ইরশাদ করেন:

عَنْ بُرَيْدَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: الْقُضَاةُ ثَلَاثَةٌ: وَاحِدٌ فِي الْجَنَّةِ، وَاثْنَانِ فِي النَّارِ، فَأَمَّا الَّذِي فِي الْجَنَّةِ فَرَجُلٌ عَرَفَ الْحَقَّ فَقَضَى بِهِ، وَرَجُلٌ عَرَفَ الْحَقَّ فَجَارَ فِي الْحُكْمِ فَهُوَ فِي النَّارِ، وَرَجُلٌ قَضَى لِلنَّاسِ عَلَى جَهْلٍ فَهُوَ فِي النَّارِ

অনুবাদ: "হযরত বুরায়দা (রা.) থেকে বর্ণিত, নবী করীম (সা.) ইরশাদ করেছেন: 'বিচারকগণ তিন শ্রেণীতে বিভক্ত; তাদের এক শ্রেণী জান্নাতি এবং বাকি দুই শ্রেণী জাহান্নামী। যারা জান্নাতি—তারা হলেন সেইসব বিচারক যারা সত্যকে অনুধাবন করেছেন এবং সেই অনুযায়ী রায় দিয়েছেন। আর যে ব্যক্তি সত্য জানার পরও বিচারে অন্যায় বা পক্ষপাতিত্ব করেছে, সে জাহান্নামী। আর যে ব্যক্তি অজ্ঞতা বা মূর্খতা সত্ত্বেও মানুষের মধ্যে বিচার ফয়সালা করেছে, সেও জাহান্নামী'।" (সুনানে আবু দাউদ, হাদিস নং: ৩৫৭৩; সুনানে ইবনে মাজাহ, হাদিস নং: ২৩১৫—হাদিসটি সহীহ)

- ঐতিহাসিক আইনি নজির (বিচার বিভাগের স্বাধীনতার উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত)

আমিরুল মুমিনীন হযরত আলী (রা.)-এর একটি যুদ্ধের বর্ম হারিয়ে যায়, যা পরে এক ইহুদি নাগরিকের কাছে পাওয়া যায়। খলিফা নিজে রাষ্ট্রপ্রধান হওয়া সত্ত্বেও বলপ্রয়োগ না করে সেই ইহুদির বিরুদ্ধে প্রধান বিচারপতি কাযী শুরাইহ-এর আদালতে সাধারণ নাগরিকের মতো মামলা দায়ের করেন। কাযী শুরাইহ খলিফার কাছে সাক্ষী চাইলেন। খলিফা তাঁর ছেলে হযরত হাসান (রা.)-কে সাক্ষী হিসেবে পেশ করলে কাযী শুরাইহ হানাফি/ইসলামি সাক্ষ্য আইনের নীতি (বাবার সপক্ষে ছেলের সাক্ষী গ্রহণযোগ্য নয়) অনুযায়ী তা প্রত্যাখ্যান করেন এবং পর্যাপ্ত প্রমাণের অভাবে রাষ্ট্রপ্রধান আলীর বিরুদ্ধে এবং অমুসলিম ইহুদির সপক্ষে রায় ঘোষণা করেন।

আইনি বিশ্লেষণ: এই ঘটনাটি প্রমাণ করে যে ইসলামি বিচার ব্যবস্থা নির্বাহী বিভাগের প্রধান বা খলিফার প্রভাব থেকে কতটা স্বাধীন ও নিস্পৃহ ছিল। এই অলৌকিক ইনসাফ দেখে সেই ইহুদি তৎক্ষণাৎ ইসলাম গ্রহণ করেছিলেন। (তারীখুল খুলাফা, সুয়ূতী)

- ফিকহি মাসয়ালা ও তাত্ত্বিক বিশ্লেষণ

ইসলামি ফকিহগণ বিচারকদের যোগ্যতা, নিয়োগ ও বিচার বিভাগের স্বাধীনতার সীমানা নির্ধারণ করে ফিকহের কিতাবসমূহে নিম্নলিখিত মাসয়ালা ও আইনি মূলনীতিসমূহ সংকলন করেছেন:

১. বিচারকের যোগ্যতার মানদণ্ড (شروط القاضي):

হানাফি ফিকহের প্রামাণ্য গ্রন্থ (মাজাল্লা, ধারা: ১৭৯২) অনুযায়ী, একজন বিচারককে অবশ্যই বুদ্ধিমান, প্রাপ্তবয়স্ক, স্বাধীন এবং ন্যায়পরায়ণ বা আদেল (عادل) হতে হবে। ফিকহি পরিভাষায় 'আদালত' বা ন্যায়পরায়ণতার অর্থ হলো—ব্যক্তিগত জীবনে কবিরা গুনাহ থেকে মুক্ত থাকা এবং সৎ হিসেবে সমাজে স্বীকৃত হওয়া। একই সাথে কাজীকে অবশ্যই শরীয়তের আইন ও বিচারিক প্রজ্ঞায় পারদর্শী (مجتهد অথবা গভীর ফিকহি জ্ঞানের অধিকারী) হতে হবে, যাতে তিনি জটিল আইনি মারপ্যাঁচে বিভ্রান্ত না হন।

২. নিয়োগ প্রক্রিয়া ও পদের তদবির নিষিদ্ধকরণ (طلب القضاء):

ইসলামি আইনি মূলনীতি অনুযায়ী—যে ব্যক্তি নিজে বিচারক পদের জন্য তদবির বা লোভ প্রকাশ করে, তাকে বিচারক নিয়োগ করা শরীয়তের দৃষ্টিতে মাকরূহে তাহরীমি বা নিষিদ্ধ। নিয়োগ প্রক্রিয়া সম্পূর্ণ মেধা, সততা এবং যোগ্যতার ভিত্তিতে রাষ্ট্রীয় প্যানেল বা জুডিশিয়াল সার্ভিস কাউন্সিলের মাধ্যমে হতে হবে। হানাফি ফিকহ অনুযায়ী, রাষ্ট্রপ্রধান বা খলিফা কাজীদের নিয়োগ দিলেও, নিয়োগ পাওয়ার পর কাজী সম্পূর্ণ স্বাধীন। খলিফা নিজের মনমতো বা রাজনৈতিক স্বার্থে কোনো সৎ কাজীকে কোনো সুনির্দিষ্ট মামলার রায় পরিবর্তন করার নির্দেশ দিতে পারেন না; দিলে তা অবৈধ হস্তক্ষেপ (Ultra Vires) হিসেবে গণ্য হবে।

৩. বিচার বিভাগের অর্থনৈতিক স্বাধীনতা ও মর্যাদাকরণ (رزق القضاة):

বিচারকদের যাতে কোনো ধরনের অর্থনৈতিক লোভ বা ঘুষের মুখোমুখি হতে না হয়, সেজন্য ইসলামি ফিকহের নীতি হলো—বায়তুল মাল (রাষ্ট্রীয় কোষাগার) থেকে বিচারকদের সর্বোচ্চ মানের এবং তাদের জীবনযাত্রার সব চাহিদা পূরণ করার মতো পর্যাপ্ত বেতন-ভাতা ও বাসস্থান নিশ্চিত করা বাধ্যতামূলক। ইমাম আবু ইউসুফ (র.) তাঁর কিতাবুল খারাজ-এ উল্লেখ করেছেন যে, বিচারকদের অর্থনৈতিকভাবে স্বাবলম্বী রাখা বিচার বিভাগের স্বাধীনতা অক্ষুণ্ন রাখার অন্যতম প্রধান শর্ত। এছাড়াও কাজীর

আদব (أدب القاضي) অধ্যায়ের মাসয়ালা অনুযায়ী—বিচারক আদালতের বাইরে কোনো পক্ষের কাছ থেকে কোনো উপহার বা দাওয়াত গ্রহণ করতে পারবেন না।

- একাডেমিক রেফারেন্স (উৎস গ্রন্থসমূহ)

হানাফি ফিকহ, কিতাবুল কাজা ও আদাবুল কাযী: ইমাম আলাউদ্দীন আল-কাসানি, বাদায়েউস সানায়ে ফি তারতিবিশ শারায়ে, কিতাবুল কাজা (فصل في شروط الولاية وأدب القاضي), বৈরুত: দারু ইহইয়ায়িত তুরাসিল আরাবি, খণ্ড: ৭, পৃষ্ঠা: ৩-১৫।
আল্লামা ইবনে আবিদীন, রাদ্দুল মুহতার আলাদ... (ফাতওয়া শামী), কিতাবুল কাজা (مطلب في رزق القاضي وهداياه), খণ্ড: ৫, পৃষ্ঠা: ৪০৫-৪২০।
সমকালীন ইসলামি শাসনতান্ত্রিক আইন গ্রন্থসমূহ: ড. আব্দুল করিম যাইদান, নিযামুল কাযা ফিল ইসলাম (ইসলামি বিচার ব্যবস্থা ও কার্যবিধি), বৈরুত: মুয়াসসাসাতুর রিসালাহ, পৃষ্ঠা: ৫০-৮৫ (বিচারকের যোগ্যতা ও নিয়োগ পদ্ধতি অধ্যায়)। ড. ওয়াহবাহ আয-জুহাইলি, আল-ফিকহুল ইসলামি ওয়া আদিল্লাতুহু, খণ্ড: ৮, কিতাবুল কাজা (استقلال القضاء في الإسلام - বিচার বিভাগের স্বাধীনতা অনুচ্ছেদ), দামেস্ক: দারুল ফিকর।
মালেকি ও শাফেয়ি ফিকহের বিচারিক দর্শন: ইমাম আল-মাওয়ার্দি, আল-আহকামুস সুলতানিয়্যাহ, অধ্যায়: تقليد القضاء (বিচার বিভাগীয় ক্ষমতা অর্পণ ও নির্বাহী বিভাগ থেকে পৃথকীকরণ), পৃষ্ঠা: ৭৫-৯২। ইবনে ফরহুন আল-মালেকি, তাবসিরাতুল হুক্কাম ফি উসুলিল আকদিয়্যাহ, খণ্ড: ১, পৃষ্ঠা: ১৫-৪০ (বিচারকের আদব ও স্বাধীন বিচারিক তদন্ত)।

৮.৩ আধুনিক বিশ্ব প্রেক্ষাপটে মুসলিম দেশগুলোর বিচার বিভাগীয় চ্যালেঞ্জ ও উত্তরণের উপায়

সমকালীন বিশ্বে মুসলিম সংখ্যাগরিষ্ঠ দেশগুলোর বিচার ব্যবস্থা এক গভীর সংকটের মধ্য দিয়ে যাচ্ছে। অধিকাংশ মুসলিম রাষ্ট্রে ঔপনিবেশিক আমলের (Colonial Era) আইনি কাঠামো, ধর্মনিরপেক্ষ সিভিল বা কমন ল এবং শরিয়াহ আইনের একধরণের সাংঘর্ষিক ও মিশ্র রূপ (Hybrid Legal System) বিদ্যমান। একদিকে পারিবারিক

আইনে শরিয়াহর আংশিক প্রয়োগ রয়েছে, অন্যদিকে দেওয়ানি, ফৌজদারি ও বাণিজ্যিক ক্ষেত্রে পশ্চিমা আইনের আধিপত্য স্পষ্ট।
এর ফলে মুসলিম দেশগুলোর বিচার বিভাগ প্রধানত তিনটি বড় চ্যালেঞ্জের মুখোমুখি:

১. পদ্ধতিগত ও কাঠামোগত দ্বন্দ্ব: ধর্মনিরপেক্ষ আইনি দর্শনের সাথে শরিয়াহর মূলনীতির প্রাতিষ্ঠানিক সমন্বয়হীনতা।
২. রাজনৈতিক হস্তক্ষেপ ও বিচারিক দুর্নীতি: নির্বাহী বিভাগের অতিরিক্ত আধিপত্যের কারণে বিচার বিভাগের স্বাধীনতা খর্ব হওয়া।
৩. আধুনিকায়নের অভাব: সমকালীন জটিল অপরাধ (যেমন: সাইবার ক্রাইম, আন্তর্জাতিক মানি লন্ডারিং, কর্পোরেট জালিয়াতি) মোকাবিলায় ফিকহি এজলাসের আধুনিক কার্যবিধির অভাব।
ইসলামি আইনশাস্ত্রের গতিশীলতা (Dynamic Nature of Shariah) এবং 'সিয়াসা শারইয়্যাহ' (Shariah-compliant Governance)-এর আলোকে এই চ্যালেঞ্জসমূহ মোকাবেলা করে একটি নিখুঁত বিচারিক রূপান্তর সম্ভব।

- কুরআনের আয়াত ও অনুবাদ

সমাজে ইনসাফ কায়েমের পথে কোনো ধরণের আপস না করা এবং বিচার ব্যবস্থা ত্রুটিসমূহ দূর করে সত্যের ওপর অবিচল থাকার নির্দেশ দিয়ে আল্লাহ তাআলা ইরশাদ করেন:
يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُونُوا قَوَّامِينَ لِلَّهِ شُهَدَاءَ بِالْقِسْطِ ۖ وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَآنُ قَوْمٍ عَلَىٰ أَلَّا تَعْدِلُوا ۚ اعْدِلُوا هُوَ أَقْرَبُ لِلتَّقْوَىٰ ۖ
অনুবাদ: "হে মুমিনগণ! তোমরা আল্লাহর উদ্দেশ্যে ন্যায়ের সাক্ষ্যদাতা হিসেবে দৃঢ়ভাবে প্রতিষ্ঠিত থাকো। কোনো সম্প্রদায়ের শত্রুতা যেন তোমাদের এমনভাবে প্ররোচিত না করে যে তোমরা ইনসাফ বর্জন করবে। তোমরা ইনসাফ করো, এটাই তাকওয়ার সবচেয়ে নিকটবর্তী।" (সূরা আল-মায়েদাহ, আয়াত: ৮)

- হাদিসের মতন ও অনুবাদ

বিচার ব্যবস্থার সংস্কার এবং যুগের প্রয়োজনে সঠিক ও ন্যায়সংগত ইজতিহাদের গুরুত্ব সম্পর্কে রাসূলুল্লাহ (সা.) ইরশাদ করেন:
إِذَا حَكَمَ الْحَاكِمُ فَاجْتَهَدَ ثُمَّ أَصَابَ فَلَهُ أَجْرَانِ، وَإِذَا حَكَمَ فَاجْتَهَدَ ثُمَّ أَخْطَأَ فَلَهُ أَجْرٌ

অনুবাদ: "হযরত আমর ইবনুল আস (রা.) থেকে বর্ণিত, তিনি রাসূলুল্লাহ (সা.)-কে বলতে শুনেছেন: 'যখন কোনো বিচারক বিচার করার সময় ইজতিহাদ (গবেষণা ও বুদ্ধিবৃত্তিক প্রচেষ্টা) করেন এবং সঠিক সিদ্ধান্তে উপনীত হন, তখন তার জন্য দুটি পুরস্কার (নেকী) রয়েছে। আর যদি তিনি বিচার করার সময় ইজতিহাদ করেন এবং সিদ্ধান্ত নিতে ভুল করেন, তবে তার জন্য একটি পুরস্কার রয়েছে'।" (সহিহ বুখারি, হাদিস নং: ৭৩৫২; সহিহ মুসলিম, হাদিস নং: ১৭১৯)

- ফিকহি মাসয়ালা ও তাত্ত্বিক বিশ্লেষণ

বর্তমান মুসলিম দেশগুলোর বিচারিক চ্যালেঞ্জ দূরীকরণে সমকালীন ফকিহ ও আইনবিদগণ ফিকহি মূলনীতির আলোকে নিম্নলিখিত আইনি সমাধানসমূহ পেশ করেছেন:

১. আইনি সংহতিকরণ ও কোডিফিকেশন (تقنين الفقه الإسلامي):

মুসলিম দেশগুলোর প্রধান সমস্যা হলো শরিয়াহ আইনের কোনো সুনির্দিষ্ট আধুনিক বিধিবদ্ধ রূপ (Codified Law) না থাকা, যার ফলে বিচারকদের ব্যক্তিগত ব্যাখ্যার কারণে রায়ে ভিন্নতা তৈরি হয়। এর সমাধান হিসেবে অটোমান সাম্রাজ্যের 'মাজাল্লাতুল আহকামিল আদলিয়্যাহ' (The Ottoman Courts Manual)-এর আদলে আধুনিক যুগের উপযোগী দেওয়ানি, ফৌজদারি ও বাণিজ্যিক শরিয়াহ কোড বা আইনগ্রন্থ প্রণয়ন করা আবশ্যক। হানাফি ফিকহের 'তাকলীদ ফিল ফাতওয়া' এবং 'মাসলাহাতুল মুরসালাহ' (জনকল্যাণ) নীতি অনুযায়ী রাষ্ট্র একক আইনি স্থিতিশীলতা আনার জন্য শরিয়াহর বিধিমালাকে ধারা আকারে সংকলন করতে পারে।

২. দ্বৈত আইনি শিক্ষার দূরীকরণ ও সমন্বিত শিক্ষা (تطوير التعليم القضائي):

বর্তমানে মুসলিম বিশ্বে 'আলিয়া মাদ্রাসা/শরিয়াহ ফ্যাক্টরি' এবং 'ধর্মনিরপেক্ষ ল কলেজ'—এই দুই ধরণের বিপরীতমুখী শিক্ষা ব্যবস্থার কারণে বিচার বিভাগে সমন্বয়হীনতা তৈরি হয়েছে। উত্তরণের উপায় হিসেবে বিচার বিভাগীয় একাডেমিগুলোতে এমন পাঠ্যসূচি প্রণয়ন করতে হবে যেখানে একই সাথে ক্লাসিক্যাল ফিকহ এবং আধুনিক অপরাধবিজ্ঞান (Criminology), ফরেনসিক সায়েন্স ও আন্তর্জাতিক আইনের সমন্বিত শিক্ষা (Integrated Judicial Training) দেওয়া হবে।

৩. বিশেষায়িত ট্রাইব্যুনাল ও সিয়াসা শারইয়্যাহর প্রয়োগ (المحاكم المتخصصة):
আধুনিক বাণিজ্যিক বিবাদ ও আন্তর্জাতিক লেনদেনের জটিলতা নিরসনে ইসলামি রাষ্ট্রে 'দেওয়ানুল মাজালিম' (Administrative and Ombudsman Courts)-এর ঐতিহাসিক ধারণাকে পুনরুজ্জীবিত করতে হবে। হানাফি ফিকহের 'তা'যির' ও 'তাকসীসুল কাজা' (Jurisdictional Limitation) মূলনীতি অনুযায়ী, আধুনিক কর ফাঁকি বা সাইবার অপরাধের জন্য বিশেষায়িত ট্রাইব্যুনাল গঠন করা সম্পূর্ণ শরীয়তসম্মত, যা সাধারণ বিচার ব্যবস্থার ওপর থেকে মামলার জট কমাবে।

- একাডেমিক রেফারেন্স (উৎস গ্রন্থসমূহ)

ক্লাসিক্যাল ফিকহ ও বিচারিক কোডিফিকেশন: মাজাল্লাতুল আহকামিল আদলিয়্যাহ (The Ottoman Civil Code), ভূমিকা পরিচ্ছেদ: ফিকহি মাসয়ালা বিধিবদ্ধকরণের আইনি মূলনীতি। আল্লামা ইবনে আবিদীন, রাদ্দুল মুহতার আলাদ দুররিল মুখতার, কিতাবুল কাজা (مطلب في تقييد أحكام القضاء), খণ্ড: ৫, পৃষ্ঠা: ৪১৫-৪৩০।

সমকালীন বিচারিক সংস্কার ও চ্যালেঞ্জ বিষয়ক গ্রন্থসমূহ: ড. ওয়াহবাহ আয-জুহাইলি, আল-ফিকহুল ইসলামি ওয়া আদিল্লাতুহু, খণ্ড: ৮, কিতাবুল কাজা (مشكلات القضاء المعاصر - সমকালীন বিচারিক সমস্যা ও সমাধান অধ্যায়)। ড. আব্দুল করিম যাইদান, নিযামুল কাযা ফিল ইসলাম, বৈরুত: মুয়াসসাসাতুর রিসালাহ, পৃষ্ঠা: ৩১০-৩৪০ (মুসলিম দেশগুলোর আইনি উত্তরণের উপায়)।
সিয়াসা শারইয়্যাহ ও প্রশাসনিক সংস্কার: শায়খুল ইসলাম ইবনে তাইমিয়্যাহ, আস-সিয়াসাতুস শারইয়্যাহ ফি ইসলাহির রাঈ ওয়ার রাইইয়্যাহ, পৃষ্ঠা: ১৯০-২২০ (প্রশাসনিক জবাবদিহিতা ও দেওয়ানুল মাজালিম অনুচ্ছেদ)।

৮.৪ উপসংহার

এই গবেষণামূলক থিসিসের সামগ্রিক আলোচনা, ফিকহি মাসয়ালা এবং সমকালীন আইনি তুলনার মাধ্যমে এটি সুস্পষ্টভাবে প্রমাণিত হয়েছে যে, ইসলামি বিচার ব্যবস্থা কেবল একটি ধর্মীয় আচার বা মধ্যযুগীয় কোনো আইনি কাঠামো নয়; বরং এটি মানব সভ্যতার ইতিহাস ও আধুনিক বিশ্বের প্রেক্ষাপটে ইনসাফ কায়েমের সবচেয়ে নিখুঁত ও ভারসাম্যপূর্ণ মডেল। রোমান ল, ব্রিটিশ ল কিংবা আধুনিক ধর্মনিরপেক্ষ আইন যেখানে পদ্ধতিগত জটিলতা, নৈতিকতাহীনতা এবং বিত্তশালীদের স্বার্থ সুরক্ষার ফাঁদে বন্দি, সেখানে ইসলামের বিচার দর্শন মানুষের বাহ্যিক আচরণের পাশাপাশি তার অন্তরে আখেরাতের জবাবদিহিতা বা তাকওয়ার বিকাশ ঘটিয়ে অপরাধের মূল উপড়ে ফেলে।

ইসলামি আইনশাস্ত্রের অনন্য বৈশিষ্ট্য হলো এর 'স্থায়িত্ব ও গতিশীলতার এক অপূর্ব ভারসাম্য' (Flexibility and Stability)। এর মৌলিক ইবাদত, আকীদা এবং হদ-কিসাসের মতো নৈতিক সীমারেখাসমূহ চিরন্তন ও অপরিবর্তনীয়; যা মানবীয় খামখেয়ালিপনা থেকে সমাজকে রক্ষা করে। আবার একই সাথে ইজতিহাদ, কিয়াস, মাসলাহাতুল মুরসালাহ এবং তা'যিরের বিশাল এক্তিয়ারের মাধ্যমে এটি আধুনিক যুগের সাইবার ক্রাইম, কর্পোরেট জটিলতা এবং আন্তর্জাতিক বাণিজ্যিক আইনের যেকোনো আইনি চ্যালেঞ্জের নিখুঁত ও গতিশীল সমাধান দিতে সক্ষম।

আধুনিক বিশ্বে মুসলিম দেশগুলোর বিচারিক মুক্তি এবং বিশ্বমানবতার জন্য সত্যিকারের মানবাধিকার ও ইনসাফ প্রতিষ্ঠা করতে হলে ধর্মনিরপেক্ষ আইনের অন্ধ অনুকরণ পরিহার করতে হবে। স্বয়ং রাসূলুল্লাহ (সা.), খোলাফায়ে রাশেদীন এবং মুসলিম ইতিহাসের সোনালী যুগের বিচারিক প্রজ্ঞার আলোকে ধাপে ধাপে আইনি সংস্কার, বিচার বিভাগের পূর্ণ স্বাধীনতা নিশ্চিতকরণ এবং একটি তাকওয়াভিত্তিক অপরাধমুক্ত সামাজিক পরিবেশ তৈরি করাই হোক সমকালীন বিশ্বের মূল লক্ষ্য। আল্লাহর দেওয়া চিরন্তন আইনের মাধ্যমেই কেবল পৃথিবীতে শান্তি এবং আখেরাতে মুক্তি নিশ্চিত করা সম্ভব।

- কুরআনের আয়াত ও অনুবাদ

এই গবেষণার সমাপ্তি টানা হলো মহান আল্লাহর সেই চিরন্তন বাণী দিয়ে, যা মানবজাতিকে আল্লাহর দেওয়া বিচারিক রজ্জু দৃঢ়ভাবে আঁকড়ে ধরার চূড়ান্ত আহ্বান জানায়:

وَأَنِ احْكُمْ بَيْنَهُمْ بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ وَلَا تَتَّبِعْ أَهْوَاءَهُمْ وَاحْذَرْهُمْ أَنْ يَفْتِنُوكَ عَنْ بَعْضِ مَا أَنْزَلَ اللَّهُ إِلَيْكَ ۚ

অনুবাদ: "আর আপনি তাদের মধ্যে আল্লাহ যা নাজিল করেছেন সেই অনুযায়ী বিচার ফয়সালা করুন এবং তাদের খেয়ালখুশির অনুসরণ করবেন না। আর তাদের থেকে সতর্ক থাকুন, যেন আল্লাহ আপনার প্রতি যে কিতাব নাজিল করেছেন তার কোনো অংশ থেকে তারা আপনাকে বিচ্যুত করতে না পারে।" (সূরা আল-মায়েদাহ, আয়াত: ৪৯)

পরিসমাপ্তি (Epilogue)

وَقُلْ جَاءَ الْحَقُّ وَزَهَقَ الْبَاطِلُ ۚ إِنَّ الْبَاطِلَ كَانَ زَهُوقًا

"সত্য এসেছে এবং মিথ্যা বিলুপ্ত হয়েছে; নিশ্চয়ই মিথ্যা বিলুপ্ত হওয়ারই বিষয়।" (সূরা আল-ইসরা, আয়াত: ৮১)

ন্যায়বিচার কোনো তত্ত্বের বিলাসিতা নয়, কোনো কাগজের আইনগ্রন্থের নিস্প্রাণ হরফও নয়; বরং ন্যায়বিচার হলো মানব আত্মার বেঁচে থাকার অক্সিজেন এবং পৃথিবীর বুকে আল্লাহর খিলাফতের সবচেয়ে দৃশ্যমান বহিঃপ্রকাশ। এই দীর্ঘ গবেষণায় আমরা আধুনিক ধর্মনিরপেক্ষ আইনি দর্শনের চাতুর্য, ঔপনিবেশিক আইনের জটিল গোলকধাঁধা এবং তার বিপরীতে ইসলামি বিচার ব্যবস্থার স্বর্গীয় সৌন্দর্যের প্রতিটি পরত উন্মোচন করার চেষ্টা করেছি।

রোমান আইনের প্রাচীন ধারা থেকে শুরু করে আজকের পশ্চিমা জুরিসপ্রুডেন্স—সবখানেই মানুষ ইনসাফ খুঁজেছে নিজের তৈরি বুদ্ধির আলোয়। কিন্তু মানবীয় বুদ্ধি যেখানে স্বার্থ, আবেগ আর সীমাবদ্ধতার দেয়ালে ধাক্কা খেয়ে বারবার হোঁচট খেয়েছে, সেখানেই ইসলামি আইনের ঐশ্বরিক আলোকবর্তিকা মানবতার মুক্তির পথ দেখিয়েছে।

ইসলামি বিচার ব্যবস্থা কেবল অপরাধীকে শাস্তি দেয় না, সে মজলুমের অশ্রু মুছে দেয়; সে কেবল অপরাধীর হাত কেটে দেয় না, সে সমাজ থেকে অভাবের হাহাকার দূর করে চুরির মানসিকতাকেই উপড়ে ফেলে।

আজকের ক্ষয়িষ্ণু বিশ্ব, যেখানে আইনের ফাঁকফোকর দিয়ে অপরাধী পার পেয়ে যায় আর নিরপরাধ মানুষ কাঠগড়ায় দাঁড়িয়ে ডুকরে কাঁদে, সেখানে ইসলামের কাযী শুরাইহ, কাযী আবু ইউসুফ আর খলিফা আলীদের বিচারিক নজির কেবল কোনো রূপকথা নয়; বরং তা ছিল এই মাটির বুকেই প্রতিষ্ঠিত এক জীবন্ত সত্য।

এই গ্রন্থের সমাপ্তি রেখায় এসে আমরা এই প্রতীতি ব্যক্ত করি যে, মানবতার তৈরি করা সমস্ত আইনের ক্লান্তি আর ব্যর্থতা যেখানে শেষ হয়, আল্লাহর দেওয়া চিরন্তন শরীয়তের ইনসাফের আঙিনা ঠিক সেখান থেকেই শুরু হয়। আজ হোক বা কাল, পৃথিবীকে যদি আবার শান্ত ও অপরাধমুক্ত করতে হয়, তবে মানবজাতিকে আবার সেই আল্লাহর দেওয়া ঐশ্বরিক বিধানের দিকেই ফিরে আসতে হবে—যা ছাড়া সত্যিকারের সাম্য ও বিচার প্রতিষ্ঠা অসম্ভব।

মহান প্রতিপালক আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলা আমাদের এই ক্ষুদ্র বুদ্ধিবৃত্তিক প্রচেষ্টাকে কবুল করুন, এটিকে ইনসাফকামী মানুষের জন্য পথনির্দেশক বানিয়ে দিন এবং আমাদের সমাজ ও রাষ্ট্রে আল্লাহর জমিনে আল্লাহর দ্বীন ও নিখুঁত বিচার ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠার তৌফিক দান করুন। আমীন।

وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين